# তফসীরে নূরুল কোরআন

## ষষ্ঠ পারা

৬

মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম

ষষ্ঠ খণ্ড

# তফসীরে নূরুল কোরআন

## ৬ষ্ঠ পারা

## ৬

## ৬ষ্ঠ খণ্ড

**টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক**

https://t.me/islaMic_fdf

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক মাসিক আল-বালাগ,
তফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ, প্রাক্তন সদস্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বোর্ড অফ গভর্নরস, মরহুম ইমাম ও খতীব লালবাগ শাহী মসজিদ
এবং বহু দ্বীনি গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রঃ)

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স
ঢাকা

প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ রজব ১৪৩৪ হিঃ,
জ্যৈষ্ঠ ১৪২০ বাং
জুন ২০১৩ ইং

গ্রন্থ সত্ত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

হাদীয়া ঃ ৩৫০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ নিউ এস, আর প্রিন্টিং প্রেস
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা

অক্ষর বিন্যাস ঃ মোঃ হারুন-অর-রশীদ

## প্রাপ্তিস্থান ঃ

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭

গাওসিয়া পাবলিকেশন্স
১১, বাংলাবাজার (ইসলামী টাওয়ার)
ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৯৫৫৮৯১৩

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

আন্-নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার
ঢাকা-১০০০
মোবাইল ০১৭১৩-০১৪৮৮৯

---

Tafsir-e-Nurul Quran (VI) 6, Published by Al-Balag Publications.
12/17, Sir Sayed ahmed Road, Mohammadpur, Block-A,
Dhaka-1207 Price : 350.00.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীনের, যিনি বিশ্বস্রষ্টা ও পালনকর্তা। যাঁর অপার রহমতে তফসীরে নূরুল কোরআন রচিত ও প্রকাশিত হচ্ছে এবং যাঁর বিশেষ দানে ধন্য হয়ে আজ তফসীরে নূরুল কোরআনের ষষ্ঠ খন্ড পাঠক সমাজে পেশ করার তৌফিক পাচ্ছি। দরবারে এলাহীতে সারা জীবন সেজদায়ে শোকরানা আদায়ে রত থাকলেও এই নেয়ামতের শোকর গুজারীর হক্ব কোনদিনও আদায় হবে না।

বোখারী শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِىْ

"আমি তো শুধু বিতরণকারী, দাতা হলেন মহান আল্লাহ পাক"।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, তিনি কি বিতরণ করেন? এ প্রশ্নের জবাব আলোচ্য হাদীসের দ্বিতীয় বাক্যেই রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ পাক যা কিছু দান করেন, তার বিতরণকারীই হলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। অতএব, তফসীরে নূরুল কোরআনের রচনা ও প্রকাশনার যে নেয়ামত লাভ করেছি তা নিঃসন্দেহে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নেক নজরের বরকতে, তাঁর উসিলায় লাভ হয়েছে। তফসীরে নূরুল কোরআনের ষষ্ঠ খন্ড প্রকাশনার এ শুভ মুহূর্তে পেশ করি অগণিত দরুদ ও সালাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি আগমন করেছেন রহমতুল্লিল আলামীনরূপে, সাইয়্যেদুল মুরসালীন হয়ে। যিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম মানুষ, যিনি সমগ্র বিশ্বমানবের শ্রেষ্ঠতম পথিকৃৎ। যাঁর অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শকে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে সমগ্র মানব জাতির জন্যে একমাত্র গ্রহণযোগ্য আদর্শ বলে ঘোষণা করেছেন। যিনি বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনের নির্ভুল নীল–নকশা নিয়ে আগমন করেছেন। যিনি কাল কেয়ামতের কঠিন দিনে সমগ্র মানব জাতির জন্যে সুপারিশকারী হবেন, তাঁর প্রতি এমন দরুদ পেশ করি যা হবে চিরস্থায়ী, যতদিন এ পৃথিবী থাকবে ততদিন এ দরুদ অব্যাহত থাকবে।

খৃষ্টীয় ছয়শ' শতাব্দী বিশ্ব মানবের ইতিহাসে সর্বাধিক কলঙ্কময় কাল। যখন মানুষই ছিল মানবতার দুশমন। যখন আল্লাহ পাক ব্যতীত আর সব কিছুর সম্মুখেই মানুষ মাথা নত করত। হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, কলহ-দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ বিগ্রহ সর্বদা লেগেই থাকত। যখন অন্যায়-অনাচার, জুলুম-অত্যাচার ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। যখন ঈমানদারী, আমানতদারী, সততা, সত্যবাদিতা, নম্রতা, ভদ্রতা, উদারতা, মহানুভবতা ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত বিষয়। সেকালের মানুষের নিষ্ঠুরতা এত বেড়ে

গিয়েছিল যে পিতা মাতা নিজেই তাদের কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত সমাধিস্থ করত। নির্লজ্জতা এত বেড়ে গিয়েছিলো যে, তারা সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় কা'বা শরীফের তওয়াফ করত। অশ্লীলতা এবং চরিত্রহীনতায় তারা এমন চরমে পৌঁছে গিয়েছিলো যে, পিতার মৃত্যুর পর তার ছেলেরা সৎমাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে নিতো। এমনি অন্ধকার যুগেই আরবের মক্কা নগরীতে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল, এ ঘটনার কারণেই পারস্য রাজার রাজমহলের কয়েকটি ইট ভেঙ্গে পড়ল। রোমক সম্রাটের সিংহাসন প্রকম্পিত হলো, চন্দ্র তারকারাজি নুতন আলোয় ঝলমল করতে লাগল। আকাশ-বাতাস হয়ে উঠল সুগন্ধময়।

এ সময় মক্কার তদানীন্তন সর্দার আবদুল মোত্তালেব আল্লাহর ঘরের তওয়াফ করছিলেন, ঠিক এমন সময় একজন স্ত্রীলোক তাঁর নিকট দ্রুতবেগে হাযির হলো এবং বললো, "আবদুল মোত্তালেব, মোবারক"। আবদুল মোত্তালেব জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে"? স্ত্রীলোকটি বললো, আল্লাহ আপনাকে পৌত্র দান করেছেন। আবদুল্লাহর পুত্র হয়েছে।

আবদুল মোত্তালেব বললেন, হে আল্লাহ! তোমার শোকর।

স্ত্রীলোকটি আরো বললো, নবজাত শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এমন বিস্ময়কর আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে যে তাঁর মাতা আমেনা বিনতে ওয়াহাব ঐ আলোতে সিরিয়ার মহল পর্যন্ত দেখেছেন।

আবদুল মোত্তালেব সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী ফিরে আসলেন। এ বিস্ময়কর নবজাত শিশুকে কোলে নিলেন এবং আল্লাহর ঘরের প্রাঙ্গণে নিয়ে আসলেন, আল্লাহর শোকর আদায় করলেন।

এরপর আদেশ দিলেন উট এবং বকরী জবেহ করার জন্যে। তিনদিন যাবত মক্কাবাসীর মেহমানদারী করা হলো। ষষ্ঠ দিনে নবজাত শিশুটির নাম রাখা হলো "মোহাম্মদ"।

জন্মের পূর্বেই যাঁর পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। চার বচর বয়সে মাতা আমেনাও চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। অষ্টম বছরে দাদা আবদুল মোত্তালেবের উপরও মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধান কার্যকর হয়েছে।

অবশেষে পিতৃব্য আবু তালেব পেয়েছেন তাঁর দেখা-শোনার দায়িত্ব। এরপর জীবনের চল্লিশটি বছর তিনি মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অতিবাহিত করেছেন। তিনি আল-আমিনরূপে, ভদ্রতা, নম্রতা ও বিনয়ের প্রতীক হিসেবে, প্রতিশ্রুতি রক্ষায়, দানবীর রূপে, সুবিচার প্রতিষ্ঠায়, দুঃখী মানুষের দুঃখ নিবারনে এবং বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনে এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, যখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হলো, আল্লাহ পাক তাঁকে নবুওয়্যত দান করলেন। নাযিল হলো তাঁর প্রতি বিশ্বমানবের চিরমুক্তির মহাসনদ, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন, যার প্রথম কথা হলো ঃ اِقْرَأْ।

মূর্খতা, পথভ্রষ্টতা এবং বর্বরতার ঘন অন্ধকার দূরীভূত কর, মানব মনকে আলোকিত কর। স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের মা'রেফাত হাসিল কর। তাঁর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে তাঁর রহমতের বারিধারা লাভের পরিবেশ তৈরী কর।

বস্তুতঃ পবিত্র কোরআন হলো বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের পবিত্র কালাম, যা অবতীর্ণ হয়েছে বিশ্বনবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, বিশ্ব-মানববের সার্বিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে। তাতে রয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্য এক পরিপূর্ণ জীবন বিধান। একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এ জীবন বিধানের সঠিক বাস্তবায়নেই মানুষের জীবন-সাধনা হয় সার্থক, সুন্দর এবং সফলকাম।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক প্রাক-ইসলামী যুগকে জুলমত বা অন্ধকার যুগ বলে আখ্যা দিয়েছেন আর পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার পর তথা পবিত্র কোরআনের আলো বিকীরণ এবং প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের বাস্তবায়নকে নূর বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ-

অর্থাৎ– (হে রসূল!) এই কিতাব আপনার নিকট নাযিল করেছি যেন আপনি এর দ্বারা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন মানব জাতিকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসেন।

এতে কয়েকটি কথা প্রমাণিত হল–

১. পবিত্র কোরআন ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেদায়েত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দান করা হয়েছে পবিত্র কোরআনের আলোকে মানুষকে হেদায়েত করার জন্যে অতএব, হেদায়েত লাভের জন্যে যেমন পবিত্র কোরআনের অনুশীলনের প্রয়োজন, তেমনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণও জরুরী।

২. পবিত্র কোরআন ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদর্শ বর্জিত সমাজ ও জাতি যে যুগে বা যে দেশেই বাস করুক না কেন, জুলমত বা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকবে, দিশেহারা হয়ে জীবন কাটবে।

পবিত্র কোরআনের এ বক্তব্য শুধু আইয়ামে জাহেলিয়াতের ব্যাপারেই নয়; বরং সকল যুগের জন্যেই প্রযোজ্য।

আমরা আজকের পৃথিবীর প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করি, তবে এ সত্য অনুধাবন করা আদৌ কঠিন নয়।

এতে কোন সন্দেই নেই যে, বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার এ যুগে আমরা বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রার কারণে শুধু যে বিস্ময়কর অনেক কিছু দেখছি তাই নয়; বরং অনেক সুখ-সামগ্রীও লাভ করছি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও একথা অপ্রিয় হলেও সত্য যে, বিজ্ঞান আমাদেরকে যথেষ্ট সুখ দিলেও শান্তি দিতে পারেনি। আমাদের বাড়ীর অন্ধকার দূর করলেও মনের অন্ধকার দূর করতে পারেনি। নৈতিক অবক্ষয়ের দরুণ এবং মারণাস্ত্র তৈরীর প্রতিযোগিতা কারণে মানব সভ্যতা আজ টলটলায়মান, পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্র তৈরীর প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, আর মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত। সর্বত্র বিতরণ হচ্ছে যুদ্ধাস্ত্র। পৃথিবীর কোন কোন দরিদ্র দেশও পারমাণবিক অস্ত্র তৈরীতে লিপ্ত। আজকের পৃথিবী অশান্ত। অতএব, শান্তি লাভের একমাত্র পথ পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শের বাস্তবায়ন। এতদ্ব্যতীত অশান্তি-অকল্যাণ অবধারিত।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ-

"মনে রেখো! শুধু আল্লাহ পাকের স্মরণের মাধ্যমেই মানব মন শান্তি লাভ করে"।

আমরা বিষয়টিকে অন্যভাবেও বিশ্লেষণ করতে পারি। আজকের পৃথিবী পুঁজিবাদ এবং সমাজবাদে বিভক্ত। পুঁজিবাদের সর্বগ্রাসী অভিশাপ থেকে আত্মরক্ষার লক্ষ্যে পৃথিবীর কোন কোন দেশ আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর পূর্বে সমাজবাদের ছায়ায় আশ্রয় নেয় কিন্তু সমাজবাদ মানুষের জন্যে মরীচিকা বলে প্রমাণিত হয়। মানুষকে আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে রেখে তার জন্মগত স্বাধীনতা হরণ করে দু' মুঠো অন্নের যে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিলো, তা থেকেও যখন হতভাগা আদম সন্তানেরা বঞ্চিত হয়েছে, তখনই শুরু হয়েছে বাঁচার দাবীতে আন্দোলন। পূর্ব জার্মানী, হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড এমনকি, খোদ (সাবেক) সোভিয়েত ইউনিয়নেও আন্দোলনের দাবানল আজ ছড়িয়ে পড়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ বাঁচার দাবীতে প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নিচ্ছে। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, পুঁজিবাদ বা সমাজ বাদ কোনটিতেই মানুষের বাঁচার মত ন্যূনতম উপকরণ নেই। মানুষকে এ পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণ জীবন লাভ করতে হলে ফিরে আসতে হবে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা এবং বিশ্বনবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের চাঁদোয়ার তলে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করছেন ঃ

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ-

আর আল্লাহ্ পাক আহ্বান করছেন, শান্তি ধামের দিকে।

পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে তার মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় পবিত্র কোরআনের বহু তফসীর ও তরজমা হলেও বাংলা ভাষায় আজও পবিত্র কোরআনের কোন মৌলিক তফসীর গ্রন্থ রচিত হয়নি।

অতএব, বাংলা ভাষায় পবিত্র কোরআনের তফসীর বা ব্যাখ্যা করা একান্ত কর্তব্য।

বস্তুতঃ এ কর্তব্য পালনার্থেই শুরু হয় তফসীরে নূরুল কোরআনের সাধনা। আল্লাহ্ পাকের বিশেষ রহমতে এর প্রথম খন্ড (প্রথম পারা) প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে। আলহামদুলিল্লাহ্! আজ এর ষষ্ঠ খন্ড প্রকাশিত হল। এ পর্যন্ত এ মহান গ্রন্থের ২২৫২ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হয়েছে। হে আল্লাহ্! দয়া করে কবুল কর।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"হে প্রতিপালক! আমাদের এই সাধনা কবুল কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী"।

আমরা সকল পাঠক-পাঠিকার নিকট বিশেষভাবে দোয়া প্রার্থী, দয়া করে দোয়া করুন, যেন আল্লাহ্ পাক এ মহান গ্রন্থকে কবুল করেন, এ তফসীর গ্রন্থ সম্পূর্ণ করার তওফিক দান করেন এবং আখেরাতে এই গুনাহগারকে মাগফেরাত দান করেন। আমীন।

বিনীত
মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
১১/১১/৮৯ ইংরেজী

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

# সূচীপত্র

## ষষ্ঠ খন্ড


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| জালেমের বিরুদ্ধে অভিযোগের অনুমতি | ২ |
| শানে নুযুল | ৩ |
| আয়াতের মর্মকথা | ৬ |
| সৎ কাজঃ প্রকাশ্যে বা গোপনে | ৭ |
| আয়াতের অন্য একটি অর্থ | ৮ |
| ঈমান কখন গ্রহণযোগ্য হয়? | ১০ |
| শানে নুযুল | ১২ |
| প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা প্রদান | ১২ |
| ইহুদীদের অপরাধ এবং শাস্তি | ১৩ |
| হযরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে ইহুদীদের ভূমিকা | ১৬ |
| হযরত ঈসা (আঃ)-এর আসমানে গমন | ১৭ |
| হযরত ঈসা (আঃ)-এর বর্তমান অবস্থান | ২১ |
| ঈসায়ীদের বিভিন্ন ফেরকা | ২২ |
| এবনে জরীর (রঃ)–এর বক্তব্য | ২৩ |
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ২৬ |
| হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী | ২৬ |
| হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে ইসলামী আকীদা | ২৭ |
| হযরত ঈসা (আঃ)-এর পুনঃ আগমনের হেকমত | ২৮ |
| আলোচ্য আয়াতের তফসীরে কয়েকটি অভিমত | ২৯ |
| কোন্ সময় ঈমান গ্রহণযোগ্য হয় না | ৩১ |
| হাদীসের আলোকে | ৩২ |
| দজ্জাল সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সতর্কবাণী | ৩৩ |
| আয়াতের মর্মকথা | ৩৬ |
| শানে নুযুল | ৩৮ |
| ইহুদীদের ভিত্তিহীন দাবী | ৩৮ |
| আয়াতের মর্মকথা | ৪০ |
| হযরত দাউদ (আঃ) যখন যবুর পাঠ করতেন | ৪১ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| আম্বিয়ায়ে কেরামের সংখ্যা | ৪২ |
| হযরত আবু জর (রাঃ)-এর বর্ণনা | ৪২ |
| আম্বিয়ায়ে কেরামের সংখ্যা কত? | ৪৩ |
| আসমানী কিতাব সমূহের সংখ্যা | ৪৪ |
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ৫১ |
| শানে নুযুল | ৫২ |
| পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্য | ৫২ |
| আয়াতের মর্মকথা | ৫৩ |
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ৫৬ |
| আহলে কেতাবদের সীমা লঙ্ঘন | ৫৬ |
| খৃষ্টানদের বিভিন্ন ফেরকা | ৫৭ |
| অমার্জনীয় অপরাধ | ৫৭ |
| হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর বন্দা এবং তাঁর রসূল | ৫৭ |
| হযরত ঈসা (আঃ)-এর চারটি বৈশিষ্ট্য | ৫৮ |
| ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করার নির্দেশ | ৫৯ |
| রুহের ব্যাখ্যা | ৬১ |
| শানে নুযুল | ৬৫ |
| মানবতার অবমাননা | ৬৫ |
| মানুষের চেয়ে ফেরেশতাদের মর্যাদা অধিকতর নয় | ৬৮ |
| আয়াতের মর্মকথা | ৬৯ |
| ঈমান আনয়নের আহ্বান | ৭২ |
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ৭৩ |
| শানে নুযুল | ৭৩ |
| সূরা মায়েদা প্রসঙ্গে | ৭৯ |
| অঙ্গীকার রক্ষা করার তাগিদ | ৮০ |
| আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার | ৮০ |
| সৃষ্টির সাথে অঙ্গীকার | ৮১ |
| শানে নুযুল | ৮৭ |
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ৮৯ |
| আয়াতের মর্মকথা | ৮৯ |
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ৯৪ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| মাছআলা | ৯৭ |
| মোমেনদের জন্যে বিশেষ সুসংবাদ | ১০০ |
| সুসংবাদের নেপথ্য ঘটনা | ১০০ |
| দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ | ১০১ |
| পরিপূর্ণ জীবন বিধান | ১০৩ |
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ১০৬ |
| শানে নুযুল | ১০৭ |
| আয়াতের মর্মকথা | ১০৮ |
| শিকারী জন্তুর শিকার কয়েকটি শর্তে হালাল হতে পারে– | ১০৮ |
| কোন্ জন্তুর দ্বারা শিকার করা বৈধ | ১০৯ |
| প্রশিক্ষণের নিয়ম-কানুন | ১০৯ |
| বিসমিল্লাহ্ অবশ্যই পাঠ করতে হবে | ১০৯ |
| শিকারী জন্তু ছেড়ে দেয়ার সময় বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর | ১১০ |
| মাছআলা | ১১০ |
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ১১২ |
| সকল উত্তম বস্তু মুসলমানদের জন্যে হালাল | ১১২ |
| মাসআলা | ১১৪ |
| মাসআলা | ১১৬ |
| ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব | ১১৯ |
| পটভূমি | ১২২ |
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ১২২ |
| মাসআলা | ১২৪ |
| অজুর ফজিলত | ১২৬ |
| 'মিসাক' শব্দের ব্যাখ্যা | ১২৮ |
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ১২৯ |
| সুবিচার কায়েমের নির্দেশ | ১৩০ |
| তাকওয়া পরহেযগারী | ১৩১ |
| আয়াতের মর্মকথা | ১৩৫ |
| শানে নুযুল | ১৩৭ |
| আল্লাহ্র নেয়ামতকে স্মরণ কর | ১৪০ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ১৪৪ |
| অঙ্গীকার ভঙ্গ করার শাস্তি অবধারিত | ১৪৫ |
| আয়াতের মর্মকথা | ১৪৫ |
| একটি বিরল সুসংবাদ | ১৪৬ |
| সুসংবাদের শর্ত সমূহ | ১৪৭ |
| লক্ষ্যনীয় বিষয় | ১৪৮ |
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ১৪৯ |
| লা'নতের তাৎপর্য | ১৫০ |
| আয়াতের মর্মকথা | ১৫০ |
| হতভাগ্য জাতি | ১৫২ |
| বনী ইসরাঈলের খেয়ানতের তাৎপর্য | ১৫২ |
| ক্ষমার আদর্শ গ্রহণ কর | ১৫৩ |
| নাসারাদের অবস্থা | ১৫৪ |
| একটি প্রশ্ন ও তার জবাব | ১৫৬ |
| ইহুদী নাসারাদের পরিণাম | ১৫৬ |
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ১৫৭ |
| শানে নুযুল | ১৫৮ |
| আহলে কিতাবদের প্রতি মূর্খতা পরিহার করার আহবান | ১৫৮ |
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ১৬২ |
| সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ পাক | ১৬২ |
| শানে নুযুল | ১৬৫ |
| আয়াতের মর্মকথা | ১৬৫ |
| প্রিয় বন্দা হবার পথ উন্মুক্ত | ১৬৬ |
| সতর্কবাণী | ১৬৮ |
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ১৬৯ |
| শানে নুযুল | ১৬৯ |
| সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের আবির্ভাবের সুসংবাদ | ১৬৯ |
| জান্নাতী লোক তিন প্রকার | ১৭২ |
| আয়াতের মর্মকথা | ১৭২ |
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ১৭৪ |

বিষয় পৃষ্ঠা


বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার পরিণতি.....১৭৫
আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করার নির্দেশ.....১৭৬
বনি ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত.....১৭৬
পবিত্র ভূমিতে প্রবেশের অনুমতি.....১৭৮
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক.....১৮৪
তাওয়াক্কুলের তাৎপর্য.....১৮৫
শিক্ষনীয় বিষয়.....১৮৯
উম্মতের মোহাম্মদীয়ার বৈশিষ্ট্য.....১৯০
ঘটনার পরিসমাপ্তি.....১৯১
পাপিষ্ঠদের পরিণাম দেখে আক্ষেপ করোনা.....১৯৩
হযরত হারুন (আঃ)-এর মৃত্যুর ঘটনা.....১৯৩
হযরত মূসা (আঃ)-এর ইন্তেকালের ঘটনা.....১৯৫
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক.....১৯৮
হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার কর.....১৯৮
হাবিল কাবিলের ঘটনা.....১৯৯
পৃথিবীতে সর্বপ্রথম হত্যা.....২০০
মোত্তাকী কারা?.....২০০
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক.....২০৯
'ফাসাদ' শব্দের তাৎপর্য.....২০৯
একজন মানুষকে হত্যা করা সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করার নামান্তর.....২১০
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক.....২১২
শানে নুযুল.....২১৩
মানব কল্যাণ সাধনের পন্থা.....২১৬
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক.....২২০
"ওয়াসিলাহ" শব্দটির ব্যাখ্যা.....২২১
একটি প্রশ্ন.....২২২
জবাব.....২২২
তাকওয়া অবলম্বনের আদেশ.....২২৪
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক.....২২৭
কবি আবুল আলার ঘটনা.....২২৮
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ.....২২৯

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| কয়েকটি দৃষ্টান্ত | ২২৯ |
| ব্যতিক্রম | ২৩০ |
| বার বার চুরি করার শাস্তি | ২৩১ |
| কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় | ২৩৩ |
| শানে নুযুল | ২৩৬ |
| প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা | ২৩৮ |
| শানে নুযুল | ২৪১ |
| হযরত ওমর (রাঃ)-এর আদালত | ২৪৩ |
| ঘুষ কয়েক প্রকার হয়– | ২৪৪ |
| ন্যায় বিচার কায়েম অবশ্য কর্তব্য | ২৪৫ |
| পবিত্র কোরআনের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ পাক গ্রহণ করেছেন | ২৪৯ |
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ২৫১ |
| কেসাসের আদেশ | ২৫২ |
| বিস্ময়কর বিষয় | ২৫২ |
| বর্তমানে তৌরাতের অবস্থা | ২৫৪ |
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ২৫৬ |
| ইঞ্জিল গ্রন্থের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য | ২৫৭ |
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ২৬১ |
| পবিত্র কোরআন সম্পর্কে আলোচনা | ২৬১ |
| শানে নুযুল | ২৬২ |
| পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম | ২৬২ |
| ইহুদীদের ষড়যন্ত্র | ২৬৪ |
| শেরআতের ব্যাখ্যা | ২৬৫ |
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ২৬৯ |
| শানে নুযুল | ২৭০ |
| ইহুদী ও খৃষ্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করোনা | ২৭১ |
| একটি ঘটনা | ২৭৩ |
| পবিত্র কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হয় | ২৭৫ |
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ২৭৬ |
| পবিত্র কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত | ২৭৮ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| যারা মুরতাদ হল | ২৭৯ |
| মুরতাদদের শাস্তি | ২৮৩ |
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ২৮৫ |
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ২৮৯ |
| শানে নুযুল | ২৮৯ |
| আযানের ইতিহাস | ২৯১ |
| আযানের হেকমত | ২৯১ |
| শানে নুযুল | ২৯৩ |
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ২৯৭ |
| ইহুদী ধর্মযাজকরা দায়িত্ব পালন করেনি | ২৯৮ |
| ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা কর্তব্য | ২৯৯ |
| আল্লাহ্ পাকের শানে ইহুদীদের বেয়াদবী | ২৯৯ |
| শানে নুযুল | ৩০০ |
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ৩০৬ |
| পবিত্র কোরআনের ঘোষণার বাস্তবায়ন | ৩০৭ |
| ইসলাম ক্ষমা ও ঔদার্যের ধর্ম | ৩০৭ |
| যারা নাজাত লাভে ধন্য হবে | ৩১০ |
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ৩১২ |
| শানে নুযুল | ৩১২ |
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ৩১৮ |
| সমগ্র বিশ্ববাসীর নাজাতের একমাত্র পথ | ৩১৯ |
| সা'বীদের পরিচয় | ৩২০ |
| বনি ইসরাঈলের শাস্তি | ৩২২ |
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ৩২৪ |
| তারা উভয়ে পানাহার করতেন | ৩৩০ |
| পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক | ৩৩১ |
| আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে আরো কিছু কথা | ৩৩৮ |

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

# তফসীরে নূরুল কোরআন

**ষষ্ঠ খণ্ড** **ষষ্ঠ পারা**

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ
ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿١٤٨﴾ اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ
اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿١٤٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ
يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ
وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ
اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١٥٠﴾ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ
وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿١٥١﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ
وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٥٢﴾

## তরজমা

(১৪৮) মজলুম ব্যতীত (আর কারো নিকট থেকে) আল্লাহ পাক উচ্চস্বরে মন্দ কথা বলা পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

(১৪৯) যদি তোমরা সৎ কাজ কর প্রকাশ্যে অথবা গোপনে কিংবা কারো অপরাধ মার্জনা কর তবে নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতিশয় ক্ষমতাবান।

(১৫০) নিশ্চয় যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলকে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং একথা বলে থাকে যে, আমরা কিছু সংখ্যক রসূলের উপর বিশ্বাস করি; আর কিছু সংখ্যক রসূলকে অবিশ্বাস করি, আর তারা চায় যেন এর মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করে।

(১৫১) বাস্তবিকপক্ষে এরাই কাফের এবং আমি কাফেরদের জন্যে অত্যন্ত অপমানজনক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি।

(১৫২) এবং যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস করেছে এবং রসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করেনা, আল্লাহ পাক অচিরেই তাদেরকে দান করবেন তাদের কর্মফল। আর আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়।

## জালেমের বিরুদ্ধে অভিযোগের অনুমতি

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন, কোন মুসলমানের পক্ষে অন্য মুসলমানের ব্যাপারে বদ দোয়া করা বৈধ নয়। তবে যে মজলুম বা অত্যাচারিত সে জালেমের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করতে পারে–এর অনুমতি রয়েছে। আর যদি সে ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিতে পারে তবে তাতেই রয়েছে ফজিলত।

আবু দাউদ শরীফে আছে, হযরত আয়েশার (রাঃ) কোন জিনিষ চুরি হয় তখন তিনি চোরকে বদ দোয়া করতে লাগলেন, তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা শ্রবণ করে বললেনঃ কেন তার বোঝা হালকা করছো? অর্থাৎ সে তোমার প্রতি জুলুম করেছে, তোমার সম্পদ চুরি করে অন্যায় করেছে, তুমি বদদোয়া করে তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিচ্ছ। এভাবে তার পাপের বোঝা হালকা হয়ে যাবে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বর্ণনা করেন, তার জন্যে বদদোয়া না করে এভাবে দোয়া করা উচিত–

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلَيْهِ وَاسْتَخْرِجْ حَقِّىْ مِنْهُ

(হে আল্লাহ! এ চোরের বিরুদ্ধে তুমি আমাকে সাহায্য কর এবং তার কাছ থেকে আমার হক্ব আদায় করিয়ে দাও)

অন্য একটি সূত্রে হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর আরেকটি কথাও বর্ণিত আছে যে যদিও জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের বদদোয়ার অনুমতি রয়েছে তবে সীমা লঙ্ঘন যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৬, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৫

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আল্লাহ পাক মন্দ কথা পছন্দ করেন না। তবে জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমকে এর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। মজলুম যদি জালেমের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করে এবং তার বিরুদ্ধে বদদোয়া করে তবে তা অবৈধ হবে না।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো কাউকে গালি দেয়া বৈধ নয় কিন্তু মজলুম জালেমকে গালি দিতে পারে।

হযরত আনাস (রাঃ) এবং হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) উভয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ দুজনের মধ্যে যে প্রথম গালি দেয় দোষ তারই হবে, যতক্ষণ মজলুম ব্যক্তি সীমা লঙ্ঘন না করে অর্থাৎ তাকে যতখানি গালি দেয়া হয়েছে সে ততখানি গালি দিতে পারে তার চেয়ে বেশী নয়।

## তফসীরে কোরআন

### শানে নুযুল

আল্লামা বগবী মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত মেহমানদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি কারো মেহমান হয়, আর তার যথাযোগ্য মেহমানদারী না করা হয় তবে মেহমানের জন্যে এ বিষয়ের অভিযোগ করা এবং তার সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয়েছে তা প্রকাশ করা বৈধ।

হান্নাদ 'কেতাবুজ্জোহদে' মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মদীনা শরীফে কোন ব্যক্তির নিকট একজন মেহমান আসে। মেজবান তার সঠিক মেহমানদারী করলো না। পরিণামে মেহমান সেখান থেকে চলে যায় এবং মেজবান তার সঙ্গে যে আচরণ করেছে তা মানুষের নিকট বর্ণনা করে। এর অনুমতি প্রদান করে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। আবদুর রাজ্জাক আবদ্ এবনে হোমায়েদ এবং এবনে জরীর মুজাহেদের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে জনৈক ব্যক্তি এক সম্প্রদায়ের নিকট মেহমান হলো, কিন্তু তারা তার পানাহারের কোন ব্যবস্থাই করলো না। তখন সে তাদের বিরুদ্ধে মানুষের নিকট অভিযোগ করলো। তখন তারা তাকে পাকড়াও করলো। এ সময় আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। হযরত আকাবা এবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা আরজ করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি আমাদেরকে তবলীগ অথবা জেহাদের জন্যে প্রেরণ করেন। আমরা এমন লোকদের নিকট উপস্থিত হই যারা আমাদের মেহমানদারী করে না। এমন অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত? তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ তোমরা যে সব লোকের নিকট অবস্থান কর তারা যদি

তোমাদের যথাযোগ্য মেহমানদারী না করে তবে তাদের অবস্থা মোতাবেক তাদের নিকট থেকে মেহমানদারী উশুল কর।[১] –(বোখারী ও মুসলিম)

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে লিখেছেন ঃ এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আবু বকর (রাঃ) সম্পর্কে। তাঁকে এক ব্যক্তি গালি দেয়। কিন্তু তিনি নীরব থাকেন। ঐ ব্যক্তি বারংবার গালি দেয়ার পর হযরত আবু বকর (রাঃ) তাকেও ফিরিয়ে গালি দেন। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়ান। এমন সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করেন, আমাকে যখন লোকটি গালি দেয় তখন আপনি উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু আমি যখন পাল্টা গালি দিলাম তখন আপনি উঠে দাড়ালেন (এর হেকমত কি?) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ ঐ লোকটির গালির জবাব দিচ্ছিল তোমার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা। কিন্তু যখন তুমি পাল্টা গালি দিলে তখন ফেরেশতা বিদায় নিল এবং শয়তান হাযির হলো। শয়তান আসার পর আমি বসে থাকা পছন্দ করি না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا

আর আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। অর্থাৎ তিনি মজলুমের অভিযোগ এবং বদদোয়া শ্রবণ করেন এবং জালেমের কার্যকলাপ সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণ অবগত থাকেন। এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) লিখেছেনঃ পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক মুনাফেকদের ষড়যন্ত্রমূলক কীর্তিকলাপ এজন্যে বর্ণনা করেছেন যেন মুসলমানগণ তাদের চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে এবং নিজেদেরকে তাদের মন্দ চরিত্রের ন্যায় চরিত্র থেকে রক্ষা করতে পারে। যেহেতু এ জালেমরা মুসলমানদের উপর চরম জুলুম করেছে তাই মুসলমানদের জন্যে তাদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা বৈধ। জালেমের জুলুমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার অনুমতি দিয়েছে ইসলাম।

অথবা এর অর্থ হলো পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মুনাফেকদের দোষ-ত্রুটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কারো নাম উচ্চারিত হয়নি কেননা, আল্লাহ পাক কারো নাম নিয়ে দোষ বর্ণনা করা পছন্দ করেন না। অবশ্য জালেমের নাম নিয়ে তার দোষ বর্ণনা করা বা তার জুলুমের বিবরণ দেয়া অবৈধ নয়। জালেমের জুলুমের কথা বর্ণনা করা গীবত বা পরনিন্দার অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, জালেমের নাম না নিয়ে তার বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করা সম্ভব হয় না। এতদ্ব্যতীত আরো কিছু পন্থা রয়েছে যে পন্থায় গীবতের অনুমতি রয়েছে (বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন এহইয়াউল উলুম, খন্ড-৩ পৃষ্ঠা-১৩২)।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩১৭-১৮

আলোচ্য আয়াতে এ আদেশ হয়তো এজন্যে বর্ণিত হয়েছে যে, তখনও মুনাফেকদের নাম প্রচার করার অনুমতি হয়নি। প্রকাশ্যে কোন ব্যক্তির বদনাম বা অপমানিত করা কাম্য নয়। প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো নসিহত করা। এজন্যে আল্লাহ্ পাক অস্পষ্ট পন্থায় মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কারো নামোল্লেখ করেননি, যাতে করে মুনাফেকরা সত্য উপলব্ধি করতে পারে এবং সঠিক পথ অবলম্বন করে।

অথবা এর তাৎপর্য হলো, পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মুনাফেকদের মন্দ অভ্যাসের বিবরণ রয়েছে আর হাদীস শরীফে আছে মুনাফেকদের নিকট মন্দ অভ্যাস হলো এই, কলহ-দ্বন্দ্বের সময় তাদের মুখ থেকে গাল-মন্দ বেরিয়ে আসে, এজন্যে এ আয়াতে মুসলমানদেরকে হেদায়েত করা হয়েছে যে, তারা যেন মন্দ কথা না বলে। তবে হ্যাঁ যে মজলুম, যে অত্যাচারিত সে যদি জালেমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চায় তা তার জন্যে বৈধ।

এরপর এরশাদ হয়েছে, "আর যদি মজলুম মাফ করে দেয় তবে আল্লাহ্ পাক তার গুনাহ্ মাফ করে দেবেন"।

অথবা পূর্ববর্তী আয়াতে একথাও এরশাদ হয়েছে যে, যদি কোন পাপী ব্যক্তি তওবা করে তবে পূণ্যবান মোমেনদের মধ্যে সে অন্তর্ভুক্ত হবে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ যদি কোন মুনাফেক খাঁটি তওবা করার পর প্রকৃত মোমেনদের মধ্যে শামিল হয়ে যায়, এরপর তার পূর্বেকার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে তাকে অপমানিত করা বৈধ নয়। অবশ্য কেউ যদি কারো প্রতি জুলুম করে তবে জালেমকে মন্দ বলার হক্ব মজলুমের রয়েছে। এজন্যে যে হাদীস শরীফে আছে, "যে হক্বদার তার বক্তব্য রাখার অধিকার রয়েছে"।

অথবা এ আয়াতের অর্থ হলো, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ

অর্থাৎ "আল্লাহ্ পাক তোমাদের আযাব দিয়ে কি করবেন যদি তোমরা শোকর আদায় কর এবং ঈমান আন", তথা অকারণে আল্লাহ্ পাক কাউকে আযাব দেয়া পছন্দ করেন না। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, এটিও আল্লাহর অপছন্দনীয় যে, কোন ব্যক্তি কাউকে প্রকাশ্যে মন্দ বলবে কিন্তু মজলুমকে অনুমতি দেয়া হলো, সে জালেমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারে আর যদি জালেমকে মাফ করে দেয় তবে তা তার জন্যে আরো ভাল কেননা, পরাক্রমশালী আল্লাহ্ পাক যা ইচ্ছা তা করতে পারেন কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি তাঁর বন্দাগণকে মাফ করে দেন।

অথবা এ আয়াতের তাৎপর্য হলো পূর্ববর্তী আয়াতে ছিল–

وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا

এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ পাক কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে পছন্দ করেন আর বর্তমান আয়াতে ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ পাক মন্দ কথার প্রচারকে অপছন্দ করেন।

অথবা এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক তাঁর শোকর গুজার বন্দাদেরকে শাস্তি দেন না। কিন্তু শাস্তি তাদেরকে দিয়ে থাকেন যারা অকৃতজ্ঞ, যারা কৃতজ্ঞতার স্থলে অভিযোগ করে। অধিকন্তু আল্লাহ পাক তো কোন সৃষ্টির বিরুদ্ধে অভিযোগও পছন্দ করেন না। এজন্যে তিনি আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ পাক কোন মন্দ কথার প্রচার পছন্দ করেন না। তবে হ্যাঁ যে মজলুম সে যদি জালেমের জুলুমের করুণ কাহিনী বর্ণনা করে তবে তার অনুমতি রয়েছে। এরপর আল্লাহ পাক একথাও এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ পাক সর্বজ্ঞাত। অর্থাৎ আল্লাহ পাক মজলুমের ফরিয়াদ শ্রবণ করেন। আর তিনি একথাও জানেন যে, জালেম কতখানি জুলুম করেছে আর সে কি শাস্তির যোগ্য হয়েছে। আর তিনি এও জানেন যে, মজলুমের অভিযোগ জালেমের জুলুমের সমান না তার চেয়ে বেশী। এরপর এরশাদ হয়েছেঃ মজলুম ইচ্ছা করলে জালেমকে ক্ষমাও করতে পারে। কেননা, ক্ষমা করা আল্লাহ পাকের দরবারে অতি পছন্দনীয় কাজ।[১]

## আয়াতের মর্মকথা

কোন মানুষের মাঝে দোষ-ত্রুটি লক্ষ্য করলে তা প্রচার করা আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় নয় এজন্যে পরনিন্দা, পরচর্চা ইসলামে অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং নিষিদ্ধ কাজ। তবে যে মজলুম সে যদি জালেমের জুলুমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় তবে তাতে দোষ নেই। হযরত থানভী (রঃ) লিখেছেন যে, এ আয়াতে মজলুমকে প্রতিশোধের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে যার একটি অংশ হলো অভিযোগ বা জালেমের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ। এতে যারা দুর্বল তাদের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে।

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে পরনিন্দা, পরচর্চা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে এমনি চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করার অপেক্ষা রাখে না। তবে যে মজলুম তার জন্যে অনুমতি রয়েছে সে জালেমের বিরুদ্ধে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট

১। তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-২ পৃষ্ঠা-১৯০-৯২

ফরিয়াদ করতে পারে। অথবা মানুষের নিকট জালেমের জুলুমের বিবরণ পেশ করতে পারে। এতে মানুষের স্বভাবের যে জন্মগত দাবী তা পূরণ করা হয়েছে। এরপর আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত– একথা বলে জালেমের উদ্দেশ্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, মজলুম কারো নিকট ফরিয়াদ করুক বা না করুক– আল্লাহ পাক সব কিছু শ্রবণ করেন এবং সবকিছু জানেন। আর এতে মজলুমকেও সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, তুমি কারো নিকট জালেমের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ কর বা না কর আল্লাহ পাক সব বিষয় সম্পর্কে অবগত। অবশেষে প্রত্যেককেই হাযির হতে হবে আল্লাহ পাকের দরবারে এবং প্রত্যেককেই তার কর্মফল ভোগ করতে হবে।[১]

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো মন্দ কথার প্রচার আল্লাহ পাক আদৌ পছন্দ করেন না। তিনি এর উপর অসন্তুষ্ট থাকেন। তবে শুধু মজলুমের জন্যে এর অনুমতি রয়েছে, সে জালেমের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের ফরিয়াদের অনুমতি। আর মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না যে, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করুক। তবে মজলুমের জন্যে অনুমতি রয়েছে সে জালেমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারে।

হাসান, সুদ্দী এবং হযরত আবু জাফর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এ অর্থ হলো, আল্লাহ পাক পরস্পরকে গালি দেয়া পছন্দ করেন না।[২]

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا

অর্থাৎ– তোমরা যদি সৎ কাজ কর এবং তা প্রকাশ কর অথবা গোপন কর অথবা জালেমের মন্দ আচরণের জন্যে তাকে মাফ কর তবে নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী।

## সৎ কাজ প্রকাশ্যে বা গোপনে

(মানুষ কোন সৎ কাজ করে যদি তা প্রকাশ করে দেয় তাতে অন্যরা সৎ কাজে অনুপ্রাণিত হতে পারে) কিন্তু যদি সৎ কাজ গোপনে করা হয়, মানুষের নিকট কোন প্রশংসার আকাঙ্ক্ষাই না থাকে বরং এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের আশায়ই

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২২৫
২। তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২

সৎ কাজ করা হয় (তবে তা আরো ভাল) আর কেউ যদি কারো প্রতি জুলুম করে, সে জালেমকে ক্ষমা করে দেয় (তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ) কেননা, মানুষের প্রতিশোধ নেয়ার কিইবা ক্ষমতা আছে? আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান এতদসত্ত্বেও তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, আলোচ্য আয়াতের প্রথম দু'টি বাক্যের অর্থ হলো, দান খয়রাত গোপনে কর কিংবা প্রকাশ্যে কর (উভয় প্রকারেরই অনুমতি রয়েছে)।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো, জালেমকে মন্দ বলার স্থলে তাকে যদি ক্ষমা কর তার সঙ্গে ভাল ব্যবহারের কথা প্রকাশ কর এবং তার মন্দ আচরণকে তোমার ভাল ব্যবহার দ্বারা পরিবর্তন কর (তবে তা অনেক ভাল)।

أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ

অর্থাৎ– যদি জালেমের সঙ্গে ভাল ব্যবহার নাও করতে পার তবে অন্তত তার জুলুমের কথা মন থেকে দূর কর এবং তাকে মাফ কর।

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا

কেননা, আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর শাস্তি দানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যখন তিনি ক্ষমা করেন তবে যার ক্ষমতা নেই তার অবশ্যই ক্ষমা করা উচিত। কেননা, আল্লাহ পাক ক্ষমা প্রদর্শনের অনেক সওয়াব দান করবেন।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমে মজলুমকে প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে পরে ক্ষমা প্রদর্শনে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয় খাদেমকে কতবার মাফ করা যায়? তিনি এরশাদ করেনঃ প্রত্যহ ৭০ বার অর্থাৎ বহু বার।[১] (আবু দাউদ, তিরমিজী)

## আয়াতের অন্য একটি অর্থ

কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের এ অর্থও বর্ণনা করেছেন যে, মুনাফেকরা মুসলমানদেরকে চরম কষ্ট দিত, এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ যদি তোমরা তাদেরকে সংশোধন করতে ইচ্ছুক হও তবে তাদের জুলুম অত্যাচার সহ্য করতে থাক। বিনম্র ভাষায়

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩১৮

তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা কর, প্রকাশ্যে তাদেরকে তিরস্কার করোনা, অপমানিত করোনা এবং তাদেরকে প্রকাশ্য শত্রুতে পরিণত করোনা।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমার প্রতিবেশী আমাকে চরম কষ্ট দেয়। তিনি এরশাদ করলেন, তুমি যাও একটি কাজ কর। তোমার যাবতীয় আসবাবপত্র ঘর থেকে বের করে বাইরে রেখে দাও। সে তাই করলো। মালপত্র বাইরে এনে সেখানেই বসে গেল। তখন ঐ পথের প্রত্যেক পথচারী তাকে জিজ্ঞাসা করে কি ব্যাপার? কি হয়েছে? সে বলে, আমার প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দেয়। আমি অপারগ হয়ে অবশেষে পথে এসে বসেছি। তখন লোকেরা প্রতিবেশীকে মন্দ বলে। কেউ বলে, আল্লাহ তার বিচার করুক। কেউ বলে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুক। যখন প্রতিবেশী জানতে পারে যে, এভাবে তার বদনাম ছড়িয়ে পড়ছে এবং সে অপমানিত হচ্ছে তখন সে মজলুম প্রতিবেশীর নিকট হাযির হলো এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আবেদন করলো– তুমি তোমার বাড়ীতে ফিরে আস। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আর কোন দিন তোমাকে কষ্ট দেব না।

একখানি হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ পাকের আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ সর্বদা আল্লাহ পাকের তসবীহ পাঠ করতে থাকেন। কোন কোন ফেরেশতা বলেনঃ

سُبْحَانَكَ عَلٰى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার পবিত্র সত্ত্বা, তুমি জানা সত্ত্বেও সহ্য কর। আর কোন কোন ফেরেশতা বলেন–

سُبْحَانَكَ عَلٰى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ

হে আল্লাহ! সমস্ত পবিত্রতা তোমারই জন্যে, তুমি শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করতে থাক।

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দান খয়রাতের কারণে সম্পদ কমে না, আর ক্ষমা প্রদর্শন করলে আল্লাহ পাক সম্মান বৃদ্ধি করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমে বিনয় প্রকাশ করে আল্লাহ পাক তার সম্মান বৃদ্ধি করে দেন।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে ইহুদীদের সম্পর্কে, এরশাদ হয়েছেঃ যারা আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ পাক ও রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে সচেষ্ট হয় যেমন আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে কিন্তু তাঁর রসূলগণের প্রতি অবিশ্বাস করে কিংবা কোন কোন রসূলকে মানে আর কোন কোন রসূলকে মানে না, ইসলাম ও কুফরের মধ্যে একটি মধ্য পন্থা অবলম্বন করে তারাই হলো প্রকৃত কাফের। আল্লাহ পাক তাদের জন্যে অত্যন্ত অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়– ইহুদীরা হযরত মূসা (আঃ) এবং তৌরাতের প্রতি ঈমান আনে কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) এবং ইঞ্জিলকে অস্বীকার করে। এমনকি, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখায়। এমনিভাবে খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ) এবং ইঞ্জিলকে বিশ্বাস করে কিন্তু হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও কোরআনকে অস্বীকার করে।

## ঈমান কখন গ্রহণযোগ্য হয়?

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান তখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে যখন আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রসূলগণ এবং তাঁর অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থ সমূহের প্রতি ঈমান আনা হয়। একজনকে মানবো আরেক জনকে মানবো না– এ স্ববিরোধী নীতি ইসলামে অচল। কিছু ইসলামের কথা মানবো আর কিছু কুফরী কাজও পছন্দ করবো– ইসলাম এ দ্বিমুখী নীতি বরদাশত করে না।

দিল্লীর মোগল বাদশাহ আকবর দ্বীনে এলাহীর নামে যা করেছিল তা যে বাতিল এবং চির বর্জন যোগ্য এ আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত হয়।

বর্তমান যুগেও কিছু অতি আধুনিক লোক ইসলাম এবং কুফরের কিছু কিছু বিষয়কে একত্রিত করে নতুন কিছু করার অপচেষ্টা করে। আলোচ্য আয়াতে এসব কিছুকে বাতিল এবং কুফর বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ

আর যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে এবং রসূলগণের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করে না, আল্লাহ পাক সেই ভাগ্যবান মুসলমানদেরকে অশেষ সওয়াব ও পুরস্কার দান করবেন।

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

আর তাদের দ্বারা যে ভুল-ত্রুটি হয়েছে আল্লাহ পাক তা মাফ করে দেবেন। এবং তাদের প্রতি বিশেষভাবে দয়া করবেন তথা তাদের নেক আমলের সওয়াব কয়েক গুণ বৃদ্ধি করবেন, তাঁর অনন্ত অসীম দানে তাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন।

লক্ষণীয়, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলগণের প্রতি প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ ঈমান আনয়নের পরই মাগফেরাত লাভের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ ক্ষমা ও দয়া লাভের পূর্বশর্ত হলো প্রকৃত ঈমান। দ্বিতীয়তঃ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর তাঁর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়, এজন্যে ইহুদী ও খৃষ্টানদের ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়।

يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ الْكِتٰبِ أَنْ تُنَزِّلَ
عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسٰٓى أَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ
فَقَالُوٓا أَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ
اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ
ذٰلِكَ ۚ وَءَاتَيْنَا مُوسٰى سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿١٥٣﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ
الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا
لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿١٥٤﴾

**তরজমা**

(১৫৩) (হে রসূল!) আপনার নিকট আহলে কিতাবরা এ দাবী করে যেন আপনি আসমান থেকে কোন কিতাব আনয়ন করুন। প্রকৃতপক্ষে এরা মূসা (আঃ)-এর নিকট এর চেয়েও বড় জিনিষের দাবী করেছিল এবং বলেছিল, আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে আল্লাহ তায়ালাকে দেখিয়ে দাও। তাদের পাপের পরিণামেই তাদের উপর বজ্রাঘাত হয়। অনন্তর তাদের নিকট সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ উপস্থিত হওয়ার পরও তারা গো-বৎসকে গ্রহণ করেছিল। আমি তা-ও ক্ষমা করে দিলাম এবং মূসা (আঃ)-কে স্পষ্ট ক্ষমতা দান করলাম।

(১৫৪) এবং আমি তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণের জন্যে তাদের উপর তূর পাহাড়কে তুলে ধরেছি এবং তাদের প্রতি এ আদেশ দিয়েছি যে, তোমরা সেজদারত অবস্থায় দ্বার দেশে প্রবেশ করবে এবং তাদেরকে এ আদেশও দিয়েছি যেন শনিবার সম্পর্কে (অর্থাৎ শনিবারের পবিত্রতা রক্ষার্থে এদিন মৎস্য শিকার না করার আদেশ ছিল) সীমা লঙ্ঘন না করে এবং আমি তাদের নিকট থেকে অত্যন্ত কঠিন ও দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি।

## তফসীরুল কোরআন

### শানে নুযুল

একবার কতিপয় ইহুদী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বললোঃ আপনি যদি সত্যি সত্যিই আল্লাহর নবী হন তবে হযরত মূসা (আঃ)-এর ন্যায় আসমান থেকে একখানি কিতাব নিয়ে আসুন।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তারা এ অলীক দাবীও করেছিল, ইহুদী প্রধানদের নিকট আল্লাহ পাকের চিঠি নিয়ে আসুন এ মর্মে যে, আপনি আল্লাহর রসূল। বর্ণিত আছে তারা এ দাবীও করেছিল, আমরা যেন আল্লাহর কিতাব নাযিল হওয়ার সময় দেখতে পারি, তখন আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনবো। ইহুদী প্রধানদের এসব বিদ্বেষ-ধর্মী এবং মূর্খতাপূর্ণ কথা–বার্তার জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।[১]

এ পর্যায়ে আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন যে, ইহুদীদের এ অর্থহীন প্রশ্নটির দৃষ্টান্ত হলো মক্কার কাফেরদের ঐ প্রশ্নের ন্যায় যা তারা ঈমান আনয়নের শর্ত হিসেবে পেশ করেছিল। তারা বলেছিল যতক্ষণ পর্যন্ত আরব ভূমিতে নহর প্রবাহিত না হবে এবং আরব ভূমি শষ্য–শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ঈমান আনব না।

### প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা প্রদান

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনি ইহুদীদের এসব অর্থহীন এবং ভিত্তিহীন কথায় বিস্মিত হবেন না। ইহুদীদের এ নিন্দনীয় আচরণ একান্তই বিদ্বেষ-প্রসূত।[২] সত্যকে জানার এবং বোঝার কোন ইচ্ছাই তাদের নেই। এতদ্ব্যতীত তাদের এ ঘৃণ্য চরিত্র আদৌ নতুন কিছু নয়; বরং চির পরিচিত।

(হে রসূল!) আপনার নিকট তো তারা শুধু একটি কিতাব আনয়নের কথাই বলেছে, ইতিপূর্বে তারা মূসা (আঃ)-এর নিকট এর চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৯৪-৯৫
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-৬ খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৭
২। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২২৬

বিষয়ের দাবী উত্থাপন করেছিল। তারা বলেছিল, হে মূসা! আমরা সরাসরি আল্লাহকে দেখতে চাই। আমরা সুস্পষ্টভাবে তাঁকে দেখার পরই আপনাকে সত্য নবী বলে মেনে নিতে পারি। যারা আল্লাহ পাককে দেখিয়ে দেয়ার দাবীর মত ধৃষ্টতা প্রকাশ করতে পারে তারা যদি আপনার সমীপে কিতাব আনয়নের দাবী উত্থাপন করে তবে তা আদৌ আশ্চর্যের বিষয় নয়।

## ইহুদীদের অপরাধ এবং শাস্তি

এখানে উল্লেখ্য, তাদের ঐ ধৃষ্টতার অপরাধে তারা বজ্রাহত হয়, মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এরপর হযরত মূসা (আঃ) তাদের পক্ষে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ফরিয়াদ করলে আল্লাহ পাক তাদের জীবন ফিরিয়ে দেন। কিন্তু তারপরও এ ভাগ্যাহত লোকদের কোন শিক্ষা হয়নি। তারা ইতিপূর্বে যে তিমিরে ছিল আজও সে তিমিরেই রয়েছে।

بِظُلْمِهِمْ

(তাদের জুলুমের কারণে)

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা আল্লাহ পাককে দেখিয়ে দেয়ার দাবী উত্থাপনের মাধ্যমে নিজেদের প্রতি যে জুলুম করেছে তারই শাস্তি স্বরূপ তারা বজ্রাহত হয়েছিল।

এখানে জুলুমের অর্থ হলো জেদ করা এবং এমন কিছু চাওয়া যা হওয়া আল্লাহ পাকের বিধান এবং হেকমতের খেলাফ। এতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, দীদারে এলাহী অসম্ভব। যেমন বাতিল ফেরকা মুতাজেলাগোষ্ঠী এ অভিমত পোষণ করে।[১]

ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ

অর্থাৎ– এরপরও ইহুদীরা আল্লাহর নাফরমানীতে ছিল বদ্ধপরিকর। তারা সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ দেখার পরও গো-বৎস তৈরী করে তার পূজা শুরু করে। এখানে একথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনয়নের পূর্বে জালেম ফেরাউন তাদেরকে গোলাম করে রেখেছিল। সে তাদের পুত্র সন্তানদের জবেহ করতো আর কন্যাদেরকে ছেড়ে দিত। এরপর যখন সে হযরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলা করলো, আল্লাহ পাক ফেরাউন ও তার দলবলকে ধ্বংস করলেন এবং বনী ইসরাঈলকে তার জুলুম থেকে নাজাত দিলেন। লোহিত

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩২০-২১

সাগর নির্বিঘ্নে পার করে দিলেন। এরপরও তারা গো-বৎস তৈরী করে তার পূজা শুরু করলো। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে বিশেষ ক্ষমতা এবং প্রভাব- প্রতিপত্তি দান করেছিলেন। তিনি তাদের গো-দেবতাকে পুড়িয়ে ফেললেন এবং তার ছাইকে বাতাসে উড়িয়ে দিলেন।

فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ

এরপরও আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। অবশ্য তাদেরকে আল্লাহ পাকের দারবারে তওবা করতে হয়েছে, আর এ তওবার উদ্দেশ্যে একে অন্যকে হত্যা করতে হয়েছে এবং এতে তাদের ৭০ হাজার লোক নিহত হয়েছে। কিন্তু তবুও কি তাদের হঠকারীতা এবং সত্য বিরোধিতা বন্ধ হয়েছে? না, বন্ধ হয়নি; বরং তাদের ধৃষ্টতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

লোহিত সাগর পার হওয়ার পর তারা বারংবার এ আবদার করে যে, আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব আসলে আমরা তা মেনে চলবো। তাদের এ পীড়াপীড়ির পর এবং এ পর্যায়ে সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি প্রদানের পর যখন হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক তৌরাত দান করলেন তখন এ ইহুদীরা বলতে লাগলো তৌরাতের বিধি-নিষেধ অত্যন্ত কঠিন। এর হুকুম আহকাম মেনে চলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা তা মানতে পারবো না।

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ

তখন আল্লাহ পাক তাদের উপর তূর পর্বত উত্তোলন করে বললেনঃ তৌরাতের বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে মান, অন্যথায় তোমাদের উপর পাহাড় পড়লো বলে জেনে রাখ।

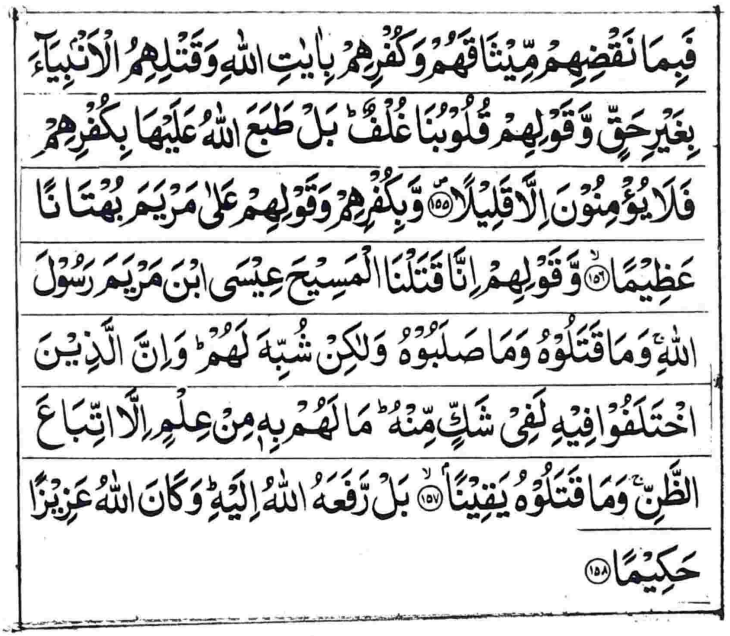
وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

আর আমি তাদেরকে বললাম, সেজদারত অবস্থায় (এলিয়া নামক শহরে) প্রবেশ কর। কিন্তু এ দূরাত্মা ইহুদীরা এ আদেশ অমান্য করলো এবং তার পরিবর্তে তারা নিতম্ব টেনে টেনে শহরে প্রবেশ করে। এ নাফরমানীর শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ শহরে প্রবেশ করা মাত্রই তারা প্লেগে আক্রান্ত হয়। আর এভাবে তাদের ৭০ হাজার লোক এ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করে।

لَا تَعْدُوْا فِى السَّبْتِ

অর্থাৎ– আমি তাদের আদেশ দিয়েছিলাম তোমরা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করোনা। কেননা, শনিবারে মৎস্য শিকার করা ইহুদীদের জন্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা

করা হয়। কিন্তু যেহেতু ঐ দিনই মাছ সবচেয়ে বেশী দেখা যেতো, তাই তারা লোভ সামলাতে না পেরে একটি কূট-কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। শনিবারে মাছ শিকার না করে নদীর মোহনায় জলাশয় তৈরী করে রাখতো। মাছ যখন তাতে প্রবেশ করতো তখন তার পথ রুদ্ধ করে দিত। এভাবে পরের দিন মাছ শিকার করতো। অথচ আল্লাহ পাক তাদের কাছ থেকে তৌরাতের বিধি-নিষেধ মেনে চলার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন।১


فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ
بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ
فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٥٥﴾ وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا
عَظِيْمًا ﴿١٥٦﴾ وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ
اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ
اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ
الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ﴿١٥٧﴾ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا
حَكِيْمًا ﴿١٥٨﴾

## তরজমা

(১৫৫) অতঃপর (আমি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করলাম) তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে এবং আল্লাহ তায়ালার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করার ও অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করার কারণে, আর তাদের একথার দরুন যে তাদের অন্তর সমূহ আচ্ছাদিত বরং তাদের নাফরমানীর দরুণ আল্লাহ পাক তাদের অন্তর সমূহকে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন। অতএব, তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তারা ঈমান আনবে না।

(১৫৬) (এবং তাদেরকে এজন্যে শাস্তি দেয়া হয়েছে) যে, তারা নাফরমানী করেছে এবং মরয়মের উপর অত্যন্ত জঘন্য মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে।

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তফসীরে নূরুল কোরআনের প্রথম খন্ডে দ্রষ্টব্য।

(১৫৭) (এবং তারা এজন্যেও কোপগ্রস্ত হওয়ার উপযুক্ত) তাদের একথার কারণে যে, নিশ্চয় আমরা ঈসা মসীহ এবনে মরয়মকে হত্যা করেছি যিনি আল্লাহ তায়ালার রসূল এবং তারা তাকে হত্যাও করেনি, শূলেও দেয়নি। কিন্তু তাদের শুধু সন্দেহ হয়েছিল এবং নিশ্চয় যারা তাঁর সম্পর্কে মতভেদ করেছে তারা অত্যন্ত ভুল ধারণায় রয়েছে। শুধু কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত তাদের নিকট তাঁর সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান নেই। আর একথা নিশ্চিত সত্য যে, তারা তাকে হত্যা করেনি।

(১৫৮) বরং আল্লাহ তায়ালা তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং আল্লাহ তায়ালা ক্ষমতাবান, বিজ্ঞানময়।

## তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন ইহুদীদের অন্যায় আচরণ এবং তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন।

১. আল্লাহ পাকের সঙ্গে তারা যে অঙ্গীকার করেছিল তা তারা ভঙ্গ করেছে,

২. আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে সব উজ্জ্বল নিদর্শন অকাট্য দলিল প্রমাণ এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের মোজেযা প্রকাশ পেয়েছে সেগুলোকে তারা অস্বীকার করেছে,

৩. এ দূরাত্মা ইহুদীরা আম্বিয়ায়ে কেরামকে হত্যা করেছে।

৪. তারা এ দাবী করেছে যে, তাদের অন্তর আবৃত, তাই নবীর আহ্বান আমাদের অন্তরে সাড়া জাগায় না। আল্লাহ পাক তার জবাবে এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের অন্তর আবৃত নয়; বরং তোমাদের নাফরমানীর কারণে আল্লাহ পাক তোমাদের অন্তরকে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন আর তা করেছেন তোমাদের কুফরী ও নাফরমানীর কারণে। পরিণামে ইহুদীরা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

৫. দূরাত্মা ইহুদী জাতির দুস্কৃতির তালিকা বিস্তৃত। তারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাতা হযরত মরয়মের উপর ব্যাভিচারের অপবাদ দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি।

৬. হযরত ঈসা (আঃ)-কে অস্বীকার করেছে। এমনকি, তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেছে বলে মিথ্যা দাবীও করেছে। এ সমস্ত অন্যায়ের কারণেই ইহুদী জাতি আল্লাহর গজবে পতিত হয়েছে।

## হযরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে ইহুদীদের ভূমিকা

হযরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে ইহুদীদের ভূমিকা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং ঘৃণ্য। আল্লাহ পাক যখন হযরত ঈসা (আঃ)-কে নবুওয়্যত দান করলেন তখন ইহুদীরা তাঁর বিরোধিতা করল, অথচ তিনি আল্লাহ পাকের নবুওয়্যত ও রেসালত লাভের পর

অনেক মোজেযা এবং অলৌকিক শক্তিও লাভ করেন। মেযন জন্মান্ধ তাঁর ফুঁকে চক্ষুস্মান হত। কুষ্ঠ রোগী আরোগ্য লাভ করত এবং তিনি আল্লাহর নামে ডাক দিলে মৃত ব্যক্তি কবর থেকে বের হত এবং কথা বলত। মাটির তৈরী পাখীকে ফুঁক দিলে সে জীবনী শক্তি লাভ করত এবং উড়ে যেত। কিন্তু তারপরও ইহুদীরা শুধু যে তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি তাই নয়; বরং তারা তাঁর বিরোধিতায় তৎপর হয়ে ওঠে এবং তাঁকে সর্বপ্রকার কষ্ট দিতে থাকে এমনকি, তার জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। কোন জনপদে একসঙ্গে কয়েকটি দিন তাঁকে বিশ্রাম নিতে দেয়নি; সারাটি জীবন তাঁকে বনে-জঙ্গলে মাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে।[১]

## হযরত ঈসা (আঃ)-এর আসমানে গমন

বর্ণিত আছে যে, ইহুদীদের একদল হযরত ঈসা (আঃ)-কে এবং তাঁর মহিমান্বিতা মাতাকে গালি দেয়, তিনি তাদের ব্যাপারে বদদোয়া করেন। তখন আল্লাহ পাক তাঁর বদদোয়ার কারণে তাদেরকে বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করেন। এ ঘটনার পর ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করার ব্যাপারে একমত হয়। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁকে জানিয়ে দেন যে, তোমাকে আসমানে উঠানো হবে।[২]

এ পর্যায়ে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে দামেস্কের তদানীন্তন রাজার নিকট হাযির হয়। সে ছিল নক্ষত্রের পূজারী মুশরেক। ইহুদীরা তাকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে যে তিনি দেশে নতুন ফেৎনা সৃষ্টি করেন এবং মানুষকে বিদ্রোহের জন্যে উদ্বুদ্ধ করেন। এ কারণে রাজা বায়তুল মোকাদ্দাসের গভর্ণরের নিকট ফরমান জারি করলো যে হযরত ঈসা (আঃ)-কে গ্রেফতার করে শূলে চড়িয়ে দেয়া হোক এবং তাঁর মাথায় কাঁটা রেখে দেয়া হোক এবং তাঁর কষ্টদায়ক আচরণ থেকে জনগণকে নাজাত দেয়া হোক।

বায়তুল মোকাদ্দাসের গভর্ণর এ ফরমান পেয়ে ইহুদীদের এক দল নিয়ে সেই বাড়ীটি ঘেরাও করে ফেলে যে বাড়ীতে হযরত ঈসা (আঃ) অবস্থান করছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে বার, তের অথবা সতের জন লোক ছিল। জুমআর দিন আসরের পর তারা বাড়ী ঘেরাও করে এবং শনিবার রাত পর্যন্ত ঘেরাও অব্যাহত থাকে। যখন হযরত ঈসা (আঃ) উপলব্ধি করলেন যে, হয়তো এখন দুশমনরা তাঁকে গ্রেফতার করে ফেলবে অথবা তাঁকে বের হয়ে আসতে হবে তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-৬ খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৯
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩২৩

বললেন, তোমাদের মধ্যে কে পছন্দ করে যাকে আমার আকৃতি দেয়া হবে অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাকে আমার আকৃতির ন্যায় আকৃতি প্রদান করবেন এবং সে দুশমনের হাতে গ্রেফতার হবে এবং আল্লাহ পাক আমাকে তাদের হাত থেকে নাজাত দেবেন। আমি সে ব্যক্তির জন্যে জান্নাতের দায়িত্ব নেব। একথা শ্রবণ করে একজন যুবক বললো, আমি এ প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। হযরত ঈসা (আঃ) তাকে এর যোগ্য মনে না করে, কথাটি দ্বিতীয়বার বললেন, এমনকি তৃতীয়বারও বললেন। প্রত্যেকবার এ ব্যক্তিই এমনি ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হলো। তখন হযরত ঈসা (আঃ) তার কথা মঞ্জুর করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আল্লাহ পাক তাকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আকৃতি দান করলেন। মনে হলো সেই ঈসা (আঃ)। এদিকে হযরত ঈসা (আঃ) তন্দ্রাহত হলেন এবং তাঁকে আসমানে তোলা হলো। তাই আল্লাহ পাক এ আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ

(এবং তাদের একথার কারণে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছে) যে, নিশ্চয় আমরা ঈসা মসীহ এবনে মরয়মকে হত্যা করেছি, যিনি আল্লাহ তায়ালার রসূল এবং প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা তাকে হত্যাও করেনি; শূলেও দেয়নি। কিন্তু তাদের শুধু সন্দেহ হয়েছে।

যাহোক, হযরত ঈসা (আঃ)-কে আসমানে উঠিয়ে নেয়ার পর ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর আকৃতি ধারণকারী তাঁর সেই সঙ্গীকে গ্রেফতার করে এবং তাকে ঐ রাত্রেই শূলে চড়িয়ে দেয় এবং আনন্দ করতে থাকে যে, আমরা ঈসা এবনে মরয়মকে হত্যা করেছি।

মজার ব্যাপার এই যে, খৃষ্টানদের এক দল নির্বোধ লোকও ইহুদীদের এ মিথ্যা দাবীতে ঐক্যমত পোষণ করে। তবে যারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গে ঐ বাড়ীতে ছিলেন তারা নিশ্চিত ভাবে জানতেন যে, হযরত ঈসা (আঃ)-কে আসমানে উঠানো হয়েছে আর যাকে শহীদ করা হয়েছে তিনি ছিলেন হযরত ঈসা (আঃ)-এর একজন অনুসারী। এ ব্যাপারে খৃষ্টানদের মধ্যে অনেক মতভেদ হয়। এমনকি তারা একথাও বলে যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাতা শূলের কাছে এসে ক্রন্দন করেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তা নয় যা ইহুদী বা ঈসায়ীরা প্রচার করেছে।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-৬ খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১০

আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের আলোচ্য আয়াত দ্বারা সকল অজানার অবগুণ্ঠন সরিয়ে দিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেনঃ তারা ঈসা (আঃ)-কে হত্যাও করেনি, শূলেও চড়ায়নি কিন্তু তাদের শুধু সন্দেহ হয়েছিল।

পবিত্র কোরআনের সূরা আলে এমরানে আল্লাহ পাক আরো এরশাদ করেছেনঃ

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ

অর্থাৎ– "যখন আল্লাহ পাক (হযরত) ঈসা (আঃ)-কে বলেছিলেন– হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে ওফাত প্রদান করব এবং আমার নিকট তুলে নেব"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) উপরোক্ত ঘটনা সম্পর্কে অন্য একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা কালবী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ইহুদীদের সর্দার ইয়াহুদা তাইতানুস নামক এক ব্যক্তিকে এজন্যে নিযুক্ত করেছিলো যে, সে কক্ষে প্রবেশ করে হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করবে, কিন্তু আল্লাহ পাক এরই মধ্যে হযরত ঈসা (আঃ)-কে আসমানে তুলে নিয়েছেন এবং তাইতানুছকে ঈসা (আঃ)-এর আকৃতি দিয়ে তাঁর ন্যায় বানিয়ে দিয়েছেন, যখন সে বের হয়ে আসে তখন লোকেরা তাকে ঈসা (আঃ) মনে করে পাকড়াও করে এবং হত্যা করে শূলে চড়িয়ে দেয়।

কারো কারো মতে, হযরত ঈসা (আঃ)-কে একটি বাড়ীতে আবদ্ধ করে রাখা হয়। একজন লোককে প্রহরী নিযুক্ত করা হয়, আল্লাহ পাক সে প্রহরীকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আকৃতি দান করেন, আর তাঁকে তুলে নেন। লোকেরা সে প্রহরীকে হত্যা করে।

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) উল্লেখিত দু'টি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এছাড়া আরো একটি কথা বলেছেনঃ যখন ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যার ইচ্ছা করল তখন আল্লাহ পাক তাকে আসমানে তুলে নিলেন। তথাকথিত ইহুদী নেতারা তখন প্রমাদ গুণল যে, জনসাধারণ আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে যে আমরা কি করেছি। তখন তারা একজন লোককে ধরে এনে মেরে ফেলল এবং শূলে চড়িয়ে দিল। এরপর প্রচার করে দিল যে, আমরা ঈসা এবনে মরয়মকে মেরে ফেলেছি। আর এ কাজ তাদের পক্ষে এজন্যে সম্ভব হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ)-কে লোকেরা নামে জানত, চেহারায় কম চিনত, কেননা তিনি মানুষের সঙ্গে খুব কমই মেলামেশা করতেন।

ইমাম রাজী (রঃ) এ পর্যায়ে আরেকটি কথাও লিখেছেনঃ এক ব্যক্তি দাবী করত যে সে ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গী অথচ লোকটি ছিল মুনাফেক। সে ইহুদীদের নিকট গমন

করে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সন্ধান দিল এবং ইহুদীদের নিয়ে সেই বাড়ীতে হাযির হল যেখানে ঈসা (আঃ) ছিলেন। আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-কে আসমানে তুলে নিলেন এবং ঐ ব্যক্তিকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর আকৃতি দিলেন। পরিণামে ইহুদীদের দ্বারা সে নিহত হল এবং তাকে শূলে চড়ান হলো।[১]

وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

(আর আল্লাহ পাক সর্বাধিক জ্ঞানী)

وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ

অর্থাৎ– এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে যারা মতভেদ করেছে তারা তাঁর হত্যার ব্যাপারে সন্দিহান রয়েছে।

কালবী বর্ণনা করেছেনঃ তাদের মতবাদ হলো এই, ইহুদীরা দাবী করতো "আমরা ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেছি"। আর নাসারাদের একটি দলের দাবী হলো, আমরা তাকে হত্যা করেছি। আর নাসারাদের অন্য দলের বক্তব্য হলো, "ইহুদীরাও তাকে হত্যা করেনি, নাসারারাও হত্যা করেনি; বরং আল্লাহ পাক তাঁকে আসমানের দিকে তুলে নিয়েছেন। আর এ ঘটনা আমাদের সম্মুখেই হয়েছে"।

সুদ্দী বলেছেনঃ ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে মতভেদের কারণ এই, ইহুদীরা বলেছে যাকে আমরা হত্যা করেছি তিনি যদি ঈসা হন তাহলে যাকে আমরা হত্যা করার জন্যে প্রেরণ করেছি (অর্থাৎ তাইতানুস) সে কোথায় গেল?

আর যাকে হত্যা করা হয়েছে সে যদি আমাদের লোক হয় তবে ঈসা (আঃ) কোথায় গেলেন?

مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ

অর্থাৎ– হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। তারা শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে মত প্রকাশ করছে। তবে একথা নিশ্চিত যে, তারা ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেনি। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا

একথা নিশ্চিত যে ইহুদীরা ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেনি অথবা এর অর্থ হলো, তাদের নিজেদেরও ধারণা ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করা নিশ্চিত বিষয় নয়।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩২৩-২৪
তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১০০

অথবা এর অর্থ হলো, তারা যাকে হত্যা করেছে সে ঈসা (আঃ) হওয়ার ব্যাপারে তাদেরও নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল না।

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ

বরং তাঁর ব্যাপারে প্রকৃত অবস্থা এই যে, আল্লাহ পাক তাকে আসমানে তুলে নিয়েছেন।

## হযরত ঈসা (আঃ)-এর বর্তমান অবস্থান

আল্লামা আলুসী (রঃ) তাঁর তফসীরে রুহুল মাআনীতে আলোচ্য বাক্যের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) বর্তমানে দ্বিতীয় আসমানে রয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মে'রাজ সম্পর্কীয় হাদীসে এ সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি সেখানে আছেন। পরবর্তী কালে যখন দজ্জাল বের হবে তখন হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে প্রেরণ করবেন। তিনি দজ্জালকে হত্যা করবেন। তিনি নবী হিসেবে নয়; বরং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে আগমন করবেন এবং ৪০ বছর যাবত দুনিয়াতে বাস করবেন। যেহেতু দুনিয়া জুলুম অত্যাচারে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে তখন তিনি আগমন করবেন এবং পৃথিবীকে সুবিচারে পরিপূর্ণ করে দেবেন। যখন তাঁকে আসমানে তুলে নেয়া হয় তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৩ বছর, দ্বিতীয় বার আগমনের পরে তিনি আরো ৪০ বছর অতিবাহিত করে অন্য মানুষের ন্যায় মৃত্যুবরণ করবেন। তাঁকে মদীনা তৈয়্যেবায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রওজায় পাকে দাফন করা হবে অথবা বায়তুল মোকাদ্দাসে।১

وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

অর্থাৎ– আল্লাহ পাক অত্যন্ত পরাক্রমশালী, তিনি যা ইচ্ছা করেন তা করতে পারেন। তাঁর ইচ্ছাকে কেউ বাধা দিতে পারে না। তিনি ইহুদীদেরকে শাস্তি দেতে পারেন, তাই তিনি তাদের প্রতি লা'নত দিয়েছেন এবং তাদেরকে কোপগ্রস্ত করেছেন। তবে তাঁর যাবতীয় কর্ম হেকমত পূর্ণ, হযরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে গৃহীত কর্মসূচী তাঁর হেকমতের উজ্জ্বল নিদর্শন।

আলোচ্য আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে ইহুদী এবং নাসারাদের যে মতবিরোধের উল্লেখ রয়েছে তার প্রেক্ষিতে ঈসায়ীগণ তিন দলে বিভক্ত হয়েছে। এ পর্যায়ে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) তাঁর তফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১২

## ঈসায়ীদের বিভিন্ন ফেরকা

হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণের ভিত্তিতে ঈসায়ীদের মধ্যে যে সব ফেরকা তৈরী হয় তন্মধ্যে একটি হল– ইয়াকুবীয়া, আরেকটি হল– নেছতুরীয়া এবং মুসলমান।

ইয়াকুবীয়া ফেরকার লোকেরা বলত খোদা নিজেই আমাদের মধ্যে ছিলেন (নাউজুবিল্লাহ), যত দিন তাঁর ইচ্ছা হয়েছে তিনি আমাদের মাঝে বিরাজমান ছিলেন, আর যখন তাঁর ইচ্ছা হয়েছে তিনি আসমানে গমন করেছেন।

আর নেছতুরীয়া ফেরকার ধারণা হল– খোদার পুত্র ছিল আমাদের মাঝে (নাউজুবিল্লাহ), তাকে যতদিন খোদা চেয়েছেন ততদিন আমাদের মাঝে রেখেছেন। অতঃপর তিনি নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।

পক্ষান্তরে, হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে মুসলমানদের আকীদা হল– তিনি হলেন আল্লাহর বন্দা ও রসূল। আল্লাহ পাকের যতদিন ইচ্ছা হয়েছে তিনি তাঁকে আমাদের মাঝে রেখেছেন, আর যখন ইচ্ছা হয়েছে তখন আসমানে তুলে নিয়েছেন।

পূর্বোক্ত দু'টি বাতিল ফেরকা যখন শক্তিশালী হয় তখন তারা তৃতীয় দল তথা হক্বপন্থী দলের প্রতি জুলুম করতে শুরু করে। এভাবে সত্যপন্থী দল বাতিল ফেরকার লোকদের দ্বারা নির্যাতিত-উৎপীড়িত হতে থাকে। এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেন এবং ইসলামকে বিজয় দান করেন। এ বিবরণ নেছায়ী শরীফেও সংকলিত হয়েছে। হযরত আবু মাবিয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ওহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বর্ণনা করেনঃ যখন ইহুদীরা রাজকীয় বাহিনী নিয়ে হযরত ঈসা (আঃ)-এর কক্ষ ঘেরাও করে, তখন তাঁর নিকট তাঁর ১৭ জন অনুসারী উপস্থিত ছিলেন। যখন ইহুদীরা ঘরে প্রবেশ করে তখন দেখে যে, যত লোক আছে সকলেই ঈসা (আঃ)-এর আকৃতির অধিকারী অর্থাৎ সকলেই যেন ঈসা (আঃ)। তখন তারা বলে, মনে হয় তোমরা আমাদের উপর যাদু করেছ, অতএব তোমাদের মধ্যে যে প্রকৃত ঈসা তাঁকে আমাদের হাতে সোপর্দ কর অন্যথায় আমরা তোমাদের সকলকে হত্যা করব। তখন হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ আছে কি, যে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে এবং এখানে আমার স্থলে শূলে চড়া পছন্দ করবে। তখন তাঁর এক সঙ্গী এজন্যে প্রস্তুত হলেন এবং বললেন, আমিই ঈসা। দ্বীনের দুশমনরা তাকে গ্রেফতার করল এবং হত্যা করে শূলে চড়িয়ে দিল। এরপর তারা আনন্দ করতে লাগল যে, আমরা ঈসাকে হত্যা করতে পেরেছি অথচ প্রকৃত অবস্থা তা নয়। কেননা, আল্লাহ পাক তাঁর রসূলকে সে সময়ই নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।

## এবনে জরীর (রঃ)–এর বক্তব্য

এ পর্যায়ে আল্লামা এবনে জরীর (রঃ) তাঁর তফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ পাক যখন হযরত ঈসা (আঃ)-কে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁকে পৃথিবী থেকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে তখন বিষয়টি তাঁর নিকট অত্যন্ত কষ্টকর মনে হয় এবং মৃত্যু ভয় তাঁর অন্তরে প্রবেশ করে। ঐ সময় তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে দাওয়াত করেন। তাদের খাবারের ব্যবস্থা করেন এবং বলেন, আজ রাতে তোমরা আমার নিকট আস। জরুরী কাজ আছে। যখন তাঁর অনুসারীরা তাঁর নিকট হাযির হয় তখন তিনি তাদের সবাইকে আহার করান। এমনকি খাবার শেষে তিনি তাদের হাত ধুয়ে দেন এবং তাঁর নিজের কাপড় দ্বারা তাদের হাত মুছে দেন। তারা অত্যন্ত বিনীত ভাবে এসব কাজে বাঁধা দেন কিন্তু তিনি বলেনঃ শোন! আজ রাতে যা কিছু করছি যদি তোমাদের কেউ তাতে বাঁধা দেয় তবে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। সে আমার নয়। আমি তার নই। একথা শ্রবণ করে তাঁর সকল ভক্ত নীরব হয়ে গেল। তখন তিনি তাদেরকে বললেনঃ দেখ, তোমাদের মধ্যে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমি তোমাদের খেদমত করেছি, যেন তোমরা আমার এ আদর্শের অনুসারী হও। খবরদার! তোমাদের মধ্যে কেউ যেন নিজের ভাইদের থেকে নিজেকে বড় মনে না করে, বরং প্রত্যেক বড় যে ছোট তার খেদমত করবে যেভাবে আমি নিজে তোমাদের খেদমত করেছি। এখন যে বিশেষ কাজে আমি আজ তোমাদেরকে ডেকেছি সে সম্পর্কে শ্রবণ কর। আজ রাতে অত্যন্ত বিনীত হয়ে এবং মনযোগ সহকারে তোমরা সবাই আল্লাহ পাকের নিকট আমার জন্যে দোয়া কর, যেন আল্লাহ পাক আমার মৃত্যুকে বিলম্বিত করে দেন। তাই সকলে দোয়া করতে শুরু করেন। কিন্তু বিনয় এবং অন্তরে একাগ্রতা আসার পূর্বেই তাদেরকে নিদ্রা পেয়ে বসে। এমনকি রসনা দ্বারা একটি বাক্য উচ্চারণ করাও তাদের জন্যে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তিনি একেকজন করে জাগ্রত করার চেষ্টা করতে থাকেন কিন্তু তারা নিদ্রা মগ্ন থাকে। তিনি বলতে লাগলেন তোমাদের কি হলো? তোমরা আমার জন্যে একটি রাতও জাগতে পার না? আমার কি কোন সাহায্য তোমরা করতে পারবে না? কিন্তু তারা জবাব দিল, হে আল্লাহর রসূল! আমরা নিজেরাই বিস্মিত যে কি হলো? এক রাতই নয় বহু রাতই আমরা জেগেছি। জাগরণে আমরা অভ্যস্ত কিন্তু আজ কি হলো তা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। এত নিদ্রা কেন এসেছে? আমাদের দোয়ার মধ্যে এবং আমাদের মধ্যে আল্লাহর তরফ থেকে একটি ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছে। তখন তিনি বলেনঃ তাহলে তো রাখালও থাকবে না। বকরী পালিয়ে যাবে। আকার-ইঙ্গিতে তিনি প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করতে থাকেন। এরপর তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি ভোরে মুরগীর ডাক দেয়ার পূর্বে আমার সঙ্গে তিন বার কুফর করবে আর তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি মাত্র কয়েক দেরহামের বিনিময়ে আমাকে বিক্রয় করবে। অতঃপর ঐ লোকগুলো সেখান থেকে বের হয়ে পড়ে। এদিকে ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসন্ধান

করছিল। তারা শামউন নামক তাঁর এক সাথীকে পেয়ে গেল এবং তাকে গ্রেফতার করলো এবং বললো, এ ব্যক্তিও ঈসা (আঃ)-এর সাথী। কিন্তু শামউন বললো, মিথ্যা কথা। আমি তার সাথী নই। একথা বিশ্বাস করে তারা তাকে ছেড়ে দিল। কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হওয়া পর তাকে ইহুদীদের আরেকটি দল পাকড়াও করলো। সেখান থেকেও সে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গে তার সম্পর্ক অস্বীকার করে ছাড়া পেল। এমন সময় রাতের শেষ প্রহরে মুরগীর ডাক শ্রুত হতে লাগলো। তখন সে আক্ষেপ করলো এবং চিন্তিত হলো।

অতি প্রত্যুষে হযরত ঈসা (আঃ)-এর একজন সাথী ইহুদীদের নিকট গমন করে বললোঃ আমি যদি তোমাদেরকে ঈসা (আঃ)-এর ঠিকানা বলে দেই তবে আমাকে তোমরা কি দেবে? বললোঃ ৩০ দেরহাম। সে ব্যক্তি ৩০ দেরহাম তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করলো এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর ঠিকানা জানিয়ে দিল। তারা তাঁকে গ্রেফতার করে ফেলল এবং তাকে শূলে চড়াতে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে আসল। তখন আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে আসমানে তুলে নিলেন এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর আকৃতি বিশিষ্ট অন্য এক ব্যক্তিকে শূলে চড়িয়ে দিল।[১]

যাহোক, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে ইহুদীদের মিথ্যা দাবীর প্রতিবাদ করেছেন এবং তাঁর সম্পর্কে সত্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, তারা তাঁকে হত্যা করেনি এবং শূলেও চড়ায়নি এবং আল্লাহ পাক তাঁকে জীবিত অবস্থায় নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।

এখানে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে প্রনিধানযোগ্য যে, পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদীদের সম্পর্কে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর নবীদের হত্যা করেছে কিন্তু এ বর্ণনার পর একথা বলা হয়নি যে, "আল্লাহ পাক তাদেরকে তুলে নিয়েছেন" অথচ হত্যার পর আম্বিয়ায়ে কেরামের পবিত্র রুহ অবশ্যই আসমানে তুলে নেয়া হয়েছে।

পক্ষান্তরে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে–

وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ

অর্থাৎ– তারা নিশ্চয় তাঁকে হত্যা করেনি; বরং আল্লাহ পাক তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আঃ)-কে সশরীরে, জীবিত অবস্থায় আসমানে তুলে নেয়া হয়েছে এবং দুশমনদের আক্রমণ থেকে আল্লাহ পাক তাঁকে হেফাজত করেছেন। আর এ কাজ আল্লাহ পাকের জন্যে আদৌ কঠিন নয়। এজন্যেই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছে–

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-৬ খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১১

وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

অর্থাৎ– আল্লাহ পাক অত্যন্ত পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়, আসমান জমিনের সব কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, তিনি যা ইচ্ছা তা করেন আর তাঁর প্রতিটি কাজ হেকমত পূর্ণ। হযরত ঈসা (আঃ)-কে আসমানে তুলে নেয়ার মধ্যে কি হেকমত রয়েছে তা আল্লাহ পাকই জানেন। মানুষকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে। যদি আল্লাহ পাকের হেকমতপূর্ণ কর্মের অনুসন্ধান করা হয় তবে মানুষের জ্ঞানের দৈন্যই প্রকাশ পাবে। আল্লাহ পাক হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফে হিজরত করিয়ে সাফল্য দান করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে এ সাফল্য মক্কা শরীফেও দিতে পারতেন। প্রশ্ন হল হিজরতের হেকমত কি? এর জবাব কে দিতে পারে? এমনিভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে ইরাক থেকে সিরিয়া কেন নিয়ে গিয়েছিলেন একথাও আল্লাহ পাকই জানেন। ঠিক এমনিভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-কে কেন আসমানে তুলে নিয়েছেন একথাও আল্লাহ পাকই জানেন। তিনিই মহাজ্ঞানী।

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ
وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ﴿١٥٩﴾ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
كَثِيْرًا ﴿١٦٠﴾ وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ ۭ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦١﴾ لٰكِنِ
الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ
وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ
الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٦٢﴾

## তরজমা

(১৫৯) এবং আহলে কিতাবদের সকল সম্প্রদায়ই (হযরত) ঈসার (আঃ) মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে (কেননা, কেময়ামতের পূর্বে তিনি পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন এবং দজ্জালকে হত্যা করবেন, তখন সকলেই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে) এবং কেয়ামতের দিন তিনি তাদের প্রতি সাক্ষ্য দেবেন।

(১৬০) অতঃপর ইহুদীদের এসব অন্যায় অবিচারের দরুণ এবং বহু লোককে আল্লাহ তায়ালার পথে আসতে বিরত রাখার কারণে আমি তাদের জন্যে বহু পবিত্র বস্তু হারাম করে দিয়েছি যা তাদের জন্যে হালাল ছিল।

(১৬১) এবং এজন্যে যে তারা সুদ গ্রহণ করত অথচ তাদের প্রতি সুদ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে তারা মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করত আর আমি কাফেরদের জন্যে অত্যন্ত বেদনাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।

(১৬২) কিন্তু তাদের মধ্যে যারা বিদ্যা-বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ এবং মোমেন যারা সেই কিতাবের উপরও ঈমান আনে যা (হে রসূল!) আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেই কিতাবের প্রতিও যা আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে এবং যারা নামায প্রতিষ্ঠাকারী এবং যাকাত আদায়কারী আর যারা আল্লাহ তায়ালার উপর ও শেষ বিচারের দিনের উপর বিশ্বাসী– এসব লোককে আমি মহান পুরস্কার দান করব।

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে দূরাত্মা ইহুদীদের দুষ্কৃতি এবং দৌরাত্মের বিবরণ রয়েছে। এমনকি তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করার যে অপচেষ্টা করেছিল এবং তাদের সে অপচেষ্টা যে ব্যর্থ হয়েছে তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, কেয়ামতের প্রাক্কালে হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে পুনরায় আগমন করবেন। তখন সকল আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টানরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। কেয়ামতের দিন হযরত ঈসা (আঃ) তাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবেন, কে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে আর কে ঈমান আনেনি তার বিবরণ পেশ করবেন।

## হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত ঈসা (আঃ) পুনরায় দুনিয়াতে আগমন করবেন এবং দজ্জালকে হত্যা করবেন, তখন ইহুদী খৃষ্টানরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে, হযরত ঈসা (আঃ) নিহত হননি এবং তিনি আল্লাহ্‌র বন্দা ও রসূল, আল্লাহ্‌র পুত্র নন, এভাবে খৃষ্টানদের ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হবে আর যেহেতু তিনি আসমান থেকে অবতরণ করবেন এবং ইহুদী

গোত্রীয় দজ্জালকে হত্যা করবেন, এসব দেখে ইহুদীদের বিভ্রান্তির অমানিষা কেটে যাবে, তারা যে তাঁকে হত্যা করতে পারেনি; এ সত্য উপলব্ধি করবে এবং তাঁর সম্পর্কে পবিত্র কোরআন যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হবে এবং তারা তখন তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, আর যেহেতু তখন তিনি নবী হিসেবে আগমন করবেন না; বরং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে আগমন করবেন, তাই তাঁর প্রতি ঈমান আনা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনারই নামান্তর হবে। কেননা, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান না আনলে হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না।

## হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে ইসলামী আকীদা

তাঁর সম্পর্কে মুসলমানদের সর্বসম্মত আকীদা হল হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরতে আসমানে তোলা হয়েছে, তিনি বর্তমানে আসমানে আছেন। শবে মে'রাজে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। তিনি কেয়ামতের প্রাক্কালে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, যখন ইমাম মাহদী (আঃ) মুসলিম বাহিনীকে দজ্জালের বিরুদ্ধে প্রস্তুত করবেন, তিনি মুসলিম বাহিনীকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করবেন এবং তাদের মধ্যে অস্ত্রও বন্টন করে দেবেন, দামেস্কের মসজিদে মোয়াজ্জিন আসরের নামাজের আযান দেবেন। মানুষ নামাজের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকবে, ঠিক সে মুহূর্তে হযরত ঈসা (আঃ) দু'জন ফেরেশতার কাঁধে ভর করে দামেস্কের জামে মসজিদের ছাদের পূর্বপ্রান্তে অবতরণ করে আদেশ দেবেন যে, সিঁড়ি নিয়ে আস। অতঃপর সিঁড়ি নিয়ে আসা হবে এবং তিনি জমিনে অবতরণ করে ইমাম মাহদীর সঙ্গে সাক্ষাত করবেন। ইমাম মাহদী (আঃ) অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গে মোলাকাত করবেন এবং বলবেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি ইমামতি করুন। হযরত ঈসা (আঃ) বলবেনঃ ইমামতি আপনিই করুন কেননা, আপনাদের একজন আরেকজনের ইমাম হতে পারেন, এ বৈশিষ্ট্য আল্লাহ পাক এ উম্মতকেই দান করেছেন। অতঃপর ইমাম মাহদী (আঃ) নামাযে ইমামতি করবেন এবং হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর ইমামতিতে নামায আদায় করবেন।

নামাযের পর ইমাম মাহদী (আঃ) ঈসা (আঃ)-কে বলবেন, হে আল্লাহর নবী! এখন থেকে আপনি সৈন্য বাহিনীর দায়িত্ব পালন করুন।

কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) বলবেন, না । এ কাজ যথারীতি আপনাকেই করে যেতে হবে। আমি তো শুধু দজ্জালকে হত্যা করার জন্যে এসেছি কেননা, আমার

হাতেই হবে তার মৃত্যু। এটিই তকদীর। এ রাত্রটি শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করার পর ইমাম মাহদী (আঃ) সৈন্যবাহিনী নিয়ে রণাঙ্গণে উপস্থিত হবেন। হযরত ঈসা (আঃ) বলবেন, আমার জন্যে অশ্ব ও বর্শা আনয়ন কর যাতে করে আমি এ অভিশপ্ত দজ্জালের অন্যায় বিচার থেকে জমিনকে পবিত্র করতে পারি।

অতঃপর ইসলামী বাহিনী দজ্জালের সৈন্যদের উপর এবং হযরত ঈসা (আঃ) দজ্জালের প্রতি আক্রমণ করবেন। ভীষণ যুদ্ধ শুরু হবে। এ সময় হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিঃশ্বাসের বৈশিষ্ট্য হবে যে, তাঁর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত নিঃশ্বাস প্রতিক্রিয়া করবে। আর প্রতিক্রিয়া হল এই যে, দৃষ্টিসীমার ভেতর যত কাফের থাকবে সব ধ্বংস হয়ে যাবে।

দজ্জাল হযরত ঈসা (আঃ)-এর মোকাবেলা থেকে পলায়ন করবে। তিনি তাকে 'লুদ' নামক স্থানে পাকড়াও করবেন এবং বর্শা দ্বারা হত্যা করে মানুষের নিকট তার ধ্বংসের কথা ঘোষণা করবেন।[১]

## হযরত ঈসা (আঃ)-এর পুনঃ আগমনের হেকমত

আলোচ্য আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর পুনরায় পৃথিবীতে আগমনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যখন হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন তখন ইহুদীরা তাঁর বিরোধিতা করেছিল এবং তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিল। শুধু তাই নয়; বরং তাঁকে হত্যা করার জঘন্য ষড়যন্ত্র করেছিল।

যদিও তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু তবুও তারা এ মিথ্যা দাবী করেছে যে তারা তাঁকে হত্যা করেছে। পক্ষান্তরে খৃষ্টানরা তাঁকে মেনে নিয়েছে কিন্তু তাঁর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে সীমা লঙ্ঘন করেছে। তাঁকে নবুওয়্যত ও রেসালতের মর্তবা থেকে বাড়িয়ে আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র বলে দাবী করেছে (নাউজুবিল্লাহি মিন জালেক)। কেয়ামতের পূর্বে যখন দজ্জাল আসবে তখন ইহুদীরা তাঁর অনুসারী হবে।

এ সময় হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে অবতরণ করবেন যেন আহলে কেতাব-তথা ইহুদী ও খৃষ্টানদের বিভ্রান্তি দূর হয়। ইহুদীরা যেন এ সত্য উপলব্ধি করে যে তাঁকে হত্যা করেছে বলে তাদের যে ধারণা রয়েছে তা সত্য নয়; বরং তিনি আসমানে জীবিত ছিলেন এবং জীবিত অবস্থাতেই আসমান থেকে অবতরণ করলেন আর যে দজ্জালের তারা অনুসরণ করছে আল্লাহ পাকের হুকুমে হযরত ঈসা (আঃ) তাকে হত্যা করবেন। তখন ইহুদীরা তাদের গোমরাহী এবং পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে অবগত হয়ে তওবা করবে এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনবে আর হযরত ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের কারণে খৃষ্টানরা বিভ্রান্তি থেকে নাজাত পাবে।

---

১। মুসলিম শরীফ পৃষ্ঠা-৪০১

এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন লেখক অনুদিত ইমাম মাহদীর (আঃ) আগমনের পূর্বে ও পরে

তিনি আল্লাহর বন্দা এবং রসূল– একথার প্রতি বিশ্বাস করবে, তাঁর সম্পর্কে তারা যেসব ভ্রান্ত ধারণা করেছিল তা বর্জন করবে।[১] তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ

অর্থাৎ– আহলে কিতাব মাত্রই তার মৃত্যুর পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনবে।

## আলোচ্য আয়াতের তফসীরে কয়েকটি অভিমত

ইমাম এবনে জরীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন, এর ব্যাখ্যায় কয়েকটি মত রয়েছে–

এর অর্থ হল– হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বে সকল আহলে কিতাব তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। অর্থাৎ– ঈসা (আঃ) যখন দ্বিতীয় বার পৃথিবীতে আগমন করবেন তখন সকল বাতিল ধর্ম বিদায় নেবে, শুধু সত্য ধর্ম ইসলামই থাকবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে– مَوْتِهٖ শব্দের সর্বনামটি হযরত ঈসা (আঃ)-এর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বে সকলে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে।

আবু মালেক (রঃ) বর্ণনা করেন, যখন হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে অবতরণ করবেন তখন সকল আহলে কিতাব তাঁর প্রতি ঈমান আনবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তখন একজন ইহুদীও ঈমান ব্যতীত থাকবে না, সকলেই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর শপথ! হযরত ঈসা (আঃ) এখন আল্লাহ পাকের নিকট জীবিত অবস্থায় রয়েছেন। যখন তিনি এ পৃথিবীতে অবতরণ করবেন তখন আহলে কিতাবের সকলেই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। যখন তাঁকে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হতো তখন তিনি বলতেন, আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-কে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। কেয়ামতের প্রাক্কালে তাঁকে এভাবে পৃথিবীতে প্রেরণ করবেন যে, ভাল-মন্দ সকলেই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। হযরত কাতাদাহ (রঃ) এবং হযরত আবদুর রহমান (রঃ) সহ অনেক তফসীরকারই আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন। আল্লামা এবনে জরীর (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই সঠিক।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-মাওলানা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩০-৩১

এ আয়াতের তফসীর সম্পর্কে আরেকটি অভিমত হলো– مَوْتِهٖ শব্দের সর্বনামটি আহলে কিতাবের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে, আহলে কিতাব মাত্রই তার মৃত্যুর পূর্বে ঈমান আনে। কেননা, মৃত্যুর সময়ে হক্ব ও বাতিল সবকিছু দিবালোকের মত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। এজন্যে প্রত্যেক ইহুদী ও খৃষ্টান তথা আহলে কিতাব মাত্রই মৃত্যুর পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সত্যতার উপর বিশ্বাস করে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, কোন ইহুদীর মৃত্যু হয় না, যে পর্যন্ত না সে হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনে।

বিখ্যাত তফসীরকার হযরত মুজাহেদ (রঃ)-ও অনুরূপ মত পোষণ করতেন, এমনকি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে একথাও বর্ণিত আছে যে, যদি কোন আহলে কিতাবকে তরবারি দ্বারা আঘাত করা হয় তবে তার রুহ সে পর্যন্ত বের হয় না, যে পর্যন্ত না সে হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনে, আর একথা না বলে যে তিনি ছিলেন আল্লাহর বন্দা এবং রসূল।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় কোন ব্যক্তি দেয়াল থেকে পড়ে নিহত হয় তখন কি অবস্থা হবে?

তিনি বললেন, ঐ সময়ও সে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সত্যতার উপর ঈমান আনবে। একরামা (রঃ), মোহাম্মদ এবনে শীরিন (রঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ)-এর তরফ থেকেও এ অভিমত বর্ণিত আছে। আর হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-ও অনুরূপ মত পোষণ করতেন বলে একটি সুত্রে বর্ণিত আছে।

এ আয়াতের তফসীরে তৃতীয় মতটি এই, আহলে কিতাব মাত্রই মৃত্যুর পূর্বে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনবে। একরামা (রঃ) একথা বলেছেন। ইমাম এবনে জরীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, এ তিনটি অভিমতের মধ্যে সঠিক হলো প্রথম অভিমত। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) যখন কেয়ামতের প্রাক্কালে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন তখন কোন আহলে কিতাব তাঁর প্রতি ঈমান না এনে থাকবে না।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বলেনঃ ইমাম এবনে জরীর (রহঃ)-এর মন্তব্যই সঠিক, কেননা এ পর্যায়ে কোরআনে করীমের আয়াত সমূহ দ্বারা যা প্রমাণিত হয় তা হলো সমস্ত কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইহুদীদের দাবীকে মিথ্যা প্রমাণিত করা। কেননা, তারা দাবী করেছে যে, তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেছে। এমনিভাবে কতিপয় মূর্খ খৃষ্টান এমন অলীক দাবী করেছে, আল্লাহ পাক তাদের এসব ভিত্তিহীন কথার বাতুলতা ঘোষণা করেছেন। বাস্তব কথা হলো এই যে, তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করতে পারেনি; বরং তাঁর আকৃতি বিশিষ্ট অন্য এক ব্যক্তিকে হত্যা

করেছে। আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। তিনি জীবিত আছেন, কেয়ামতের প্রাক্কালে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন।

বিশুদ্ধ হাদীসে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে অবতরণ করে দজ্জালকে হত্যা করবেন। ক্রশ চিহ্নকে বিনষ্ট করবেন। শুকর হত্যা করবেন ও জিজিয়া (অমুসলিম কর) গ্রহণ করবেন না। তিনি ঘোষণা করবেন, হয় ইসলাম কবুল কর অথবা তরবারি দ্বারা মোকাবেলা কর। সে সময়ের জন্যে আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তখন সমস্ত আহলে কিতাব তাঁর হাতে ঈমান আনবে এবং ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত একজনও থাকবে না। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যাঁকে এ বিভ্রান্ত ইহুদীরা নিহত মনে করে আর কিছু মূর্খ খৃষ্টানও তাঁর সম্পর্কে এমন ভ্রান্ত মত পোষণ করে তারা তখন দেখবে তিনি মৃত নন জীবিত, শুধু তাই নয়; বরং তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তারা সকলেই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। আলোচ্য আয়াতে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাঁকে আসমানে তুলে নেয়ার পূর্বে তারা তাঁর সাথে যে ব্যবহার করেছে এবং তাঁর পৃথিবীতে অবতরণের পর যা কিছু ঘটেছে সব কিছু তিনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে পেশ করবেন।

## কোন্ সময় ঈমান গ্রহণযোগ্য হয় না

এখানে এ-ও উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতের তফসীর সম্পর্কে আরো যে দু'টি অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে তা-ও সঠিক। কেননা, যমদূত তথা মৃত্যুর ফেরেশতার আগমনের পর পরকালীন জিন্দেগীর দৃশ্য মৃত্যুপথের যাত্রী মাত্রকেই দেখতে হয়, তখন সকলেই সত্যকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং ঈমান আনে, কিন্তু সে সময়ের ঈমান আল্লাহ পাকের মহান দরবারে গ্রহণযোগ্য হয় না। এজন্যে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় অন্য আয়াতে ঘোষণা করেছেন–

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْئٰنَ

অর্থাৎ– আর তওবা তাদের জন্যে নয়, যারা মন্দ কাজে মত্ত থাকে। এমনকি যখন তাদের কারো নিকট মৃত্যু আসে তখন সে বলে– "আমি এখন তওবা করলাম" কিন্তু এমন তওবা কবুল হয় না। এমনিভাবে অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ

"যখন তারা আল্লাহর আযাব দেখে তখন বলে– আমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি"।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, এমনি সময় ঈমান আনা হলে তা উপকারী হয় না।

এদিক থেকে বিচার করলে উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অর্থকেও সঠিক বলা যেতে পারে, যদিও আয়াতের যে অর্থটি প্রথমে বর্ণিত হয়েছে তা–ই এখানে সঠিকতর, যার মর্ম হল ঈসা (আঃ) আসমানে জীবিত অবস্থায় রয়েছেন, কেয়ামতের প্রাক্কালে তিনি অবতরণ করবেন, ইহুদী এবং খৃষ্টানদের গোমরাহীর সকল অমানিষাই তিনি দূর করবেন এবং তারা তাঁর ব্যাপারে যা বাড়াবাড়ি করেছে তার বাতুলতা ঘোষণা করবেন।[১]

## হাদীসের আলোকে

আমরা বিষয়টিকে হাদীসের আলোকেও দেখতে পারি। ইমাম বোখারী (রঃ) বোখারী শরীফে এ সম্পর্কে যে হাদীস সংকলন করেছেন তা হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সেই আল্লাহর শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের মাঝে মরয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন, সুবিচারক শাসনকর্তা হিসেবে ক্রুশ চিহ্নকে বিনষ্ট করবেন, শুকরকে হত্যা করবেন, জিযিয়া তথা অমুসলিম কর উঠিয়ে দেবেন এবং তখন অর্থ-সম্পদ এত বেশী হবে যে, কেউ তা গ্রহণ করতে রাজি হবে না; তখন একটি সেজদা করা সারা পৃথিবী ও পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ থেকে প্রিয় হবে।[২] এই হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)। তিনি এই হাদীস বর্ণনা করার পর প্রমাণ হিসেবে পবিত্র কোরআনের আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন। মুসলিম শরীফেও এই হাদীস সংকলিত হয়েছে। মসনদে আহমদে একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে তাতে রয়েছে, হযরত ঈসা (আঃ) হজ্ব অথবা ওমরায় অথবা উভয়টিতে "লাব্বায়েক" বলবেন।

মসনদে আহমদের আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে হযরত ঈসা এবনে মরয়ম অবতরণ করবেন, শুকরকে হত্যা করবেন এবং ক্রুশ চিহ্নকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করা হবে এবং আল্লাহর রাহে এত অধিক দান করা হবে যে, তা গ্রহণকারী পাওয়া যাবে না।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা–৬ খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১২-১৩
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা–৩২৬

অন্য হাদীসে একথাও রয়েছে যে, তিনি মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন, তাঁর যমানায় সব ধর্মই নিশ্চিহ্ন হয়ে শুধু ইসলাম বাকী থাকবে। তাঁর যমানায় আল্লাহ্ পাক দজ্জালকে ধ্বংস করবেন। এরপর পৃথিবীতে আমানত সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এমনিকি, কালো সর্প উষ্ট্রের সঙ্গে, বাঘ গাভীর সাথে একই সঙ্গে চরে বেড়াবে। আর শিশুরা সাপ নিয়ে খেলবে।

কিন্তু তারা কোন ক্ষতি করবে না। হযরত ঈসা (আঃ) ৪০ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। অতঃপর তাঁর ইন্তেকাল হবে। মুসলমানগণ তাঁর জানাযার নামায আদায় করবেন।[১]

### দজ্জাল সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সতর্কবাণী

এবনে মাজা শরীফে একখানি সুদীর্ঘ হাদীস সংকলিত হয়েছে। তাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দজ্জালের ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং তার সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেন যে, দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোন ফেতনা এর চেয়ে বড় হবে না। সমস্ত নবীগণ নিজ নিজ উম্মতকে তার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। আমি সর্বশেষ নবী এবং তোমরা সর্বশেষ উম্মত অতএব, সে নিশ্চয় তোমাদের মধ্যেই আসবে। যদি সে আমার বর্তমানে আসে তবে আমি নিজেই তার সমস্যার সমাধান করব আর যদি সে আমার পরে আসে, তবে প্রত্যেককে তার ফেতনা থেকে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হতে হবে। আমি প্রত্যেক মুসলমানকে আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ করছি। দজ্জাল সিরিয়া এবং ইরাকের মধ্যস্থল থেকে বের হবে এবং চারিদিকে ঘোরাফেরা করবে। হে লোক সকল! হে আল্লাহর বন্দাগণ, তোমরা অবশ্যই সুদৃঢ় থাকবে। আমি তোমাদেরকে তার এমন অবস্থা বর্ণনা করছি, যা কোন নবী তাঁর উম্মতের নিকট বর্ণনা করেননি। দজ্জাল সর্ব প্রথম দাবী করবে যে, "আমি নবী", কিন্তু তোমরা মনে রাখবে যে, আমার পরে কোন নবী নেই।

এরপর সে আরও অগ্রসর হবে এবং বলবে, "আমি খোদা" (নাঊজুবিল্লাহ) অতএব, তোমরা মনে রাখবে যে, খোদাকে কেউ এ চক্ষু দ্বারা দেখতে পারে না। শুধু মৃত্যুর পর আখেরাতে তাঁর দীদার হতে পারে। আর শোন! সে কানা হবে, অথচ তোমাদের প্রতিপালক কানা নন। তার দু' চোখের মাঝখানে "কাফের" শব্দটি লিপিবদ্ধ থাকবে, যা শিক্ষিত, অশিক্ষিত তথা ঈমানদার মাত্রই পাঠ করবে। তার সঙ্গে থাকবে অগ্নি এবং থাকবে বাগান। প্রকৃতপক্ষে তার অগ্নি হবে জান্নাত আর

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-৬ খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৪

তার বাগান হবে দোযখ। তোমাদের মধ্যে যাকে সে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করবে, সে যেন আল্লাহ্ পাকের নিকট ফরিয়াদ করে এবং সূরা কাফেরুনের কয়েক খানি আয়াত তেলাওয়াত করে। তখন ঐ অগ্নি তার জন্যে সুশীতল এবং শান্তিময় হবে। যেমন নমরুদের অগ্নি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি সুশীতল হয়েছিল।

তার একটি ফেতনা এই হবে, সে কোন গ্রাম্য ব্যক্তিকে বলবে, আমি যদি তোমার মৃত পিতা-মাতাকে জীবিত করে দেই তবে তুমি কি আমার প্রতি বিশ্বাস করবে? তখন সে স্বীকার করবে, এমন সময় দু'টি শয়তান তার পিতা-মাতার আকৃতি ধরে আত্মপ্রকাশ করবে এবং বলবে, হে আমাদের সন্তান, এ হলো তোমার প্রতিপালক, তুমি তাকে মেনে নাও। এমনিভাবে দজ্জালের আরও ফেতনার কথা হাদীস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথা বলেছেন যে, দজ্জালের আরেকটি ফেতনা হবে এই, সে আসমানকে বারি বর্ষণের আদেশ দেবে। তখন বৃষ্টিপাত হবে। সে জমীনকে আদেশ দেবে, খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন করার জন্যে, তখন জমীনে তা উৎপন্ন হবে।

তার আরেকটি ফেতনা হবে এই, দজ্জাল এক গোত্রের কাছে যাবে কিন্তু তারা তাকে মানবে না, তখন তাদের সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। অন্য একটি গোত্রের নিকট যাবে, তারা তাকে মেনে নেবে এবং তৎক্ষণাত তার আদেশে আসমান থেকে বারিপাত হবে এবং জমীনে ফল-ফুল উৎপন্ন হবে, তাদের জীব জন্তু পূর্বের চেয়ে মোটা তাজা হবে এবং দুধ ওয়ালা হবে। সে মক্কা শরীফ এবং মদীনা শরীফ ব্যতীত পৃথিবীর সর্বত্র ঘোরাফেরা করবে, যখন সে মদীনা শরীফ প্রবেশের ইচ্ছা করবে তখন দেখতে পাবে মদীনা শরীফের প্রত্যেকটি রাস্তায় ফেরেশতাগণ তরবারী নিয়ে দন্ডায়মান তাই সে "জরীবে আহমর" নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে থেমে যাবে। অতঃপর মদীনা শরীফে তিনবার ভূমিকম্প হবে। পরিণামে মদীনা শরীফে যত মুনাফেক নারী-পুরুষ থাকবে তারা বের হয়ে যাবে এবং তার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবে, এভাবে মদীনা শরীফ মন্দ লোকদেরকে দূরে সরিয়ে দেবে যেমন অগ্নি লোহার ময়লাকে দূর করে দেয়। সেদিনের নাম হবে ইয়াওমুল খালাস। হযরত উম্মে শরীফ (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এ আরজী পেশ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! সেদিন আরবরা কোথায় থাকবে? তখন তিনি এরশাদ করলেন, প্রথমতঃ তারা সংখ্যায় খুব কম হবে। দ্বিতীয়তঃ তাদের অধিক সংখ্যকই বায়তুল মোকাদ্দাসে থাকবে। তাদের ইমাম হবেন একজন নেককার ব্যক্তি। এরপর হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন। 'লুদ' নামক স্থানে তিনি দজ্জালকে হত্যা করবেন। এরপর ইহুদীরা চারিদিকে পলায়ন করতে থাকবে কিন্তু তারা পলায়নের জন্যে কোন

স্থান পাবে না। প্রত্যেকটি পাথর, প্রত্যেকটি বৃক্ষ, প্রত্যেকটি দেয়াল এবং প্রত্যেকটি জীব-জন্তু বলবে, হে মুসলমান, এখানে ইহুদী আছে তাকে মারো।[১] এভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফেতনা তথা দজ্জালের ফেতনার অবসান ঘটবে।

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন যে, এতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ইহুদী ও খৃষ্টানরা অবশ্যই ঈমান আনবে, কিন্তু আমরা অনেক ইহুদীকে দেখেছি মৃত্যুর সময় তারা ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনেনি। অতঃপর ইমাম রাজী (রহঃ) প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, শহর এবনে হাওসাব বর্ণনা করেন, একবার হাজ্জাজ বলেছিল এ আয়াতখানি যখন আমি পাঠ করি, তখনই আমার অন্তরে একথাটি উত্থিত হয় যে, অনেক ইহুদীর মৃত্যু দেখি কিন্তু তাদের ঈমানের কলেমা পাঠ করতে তো দেখিনা।

হাওসাব বললেনঃ ইহুদীর নিকট যখন মৃত্যু আসে তখন ফেরেশতারা তাদেরকে সজোরে মারে এবং বলে, হে আল্লাহর দুশমন! তোমার নিকট আল্লাহর নবী এসেছিলেন কিন্তু তুমি তাঁকে মিথ্যা জ্ঞান করেছ, তখন সে বলে, আমি বিশ্বাস করি যে, তিনি আল্লাহর বন্দা ও রসূল এবং ফেরেশতারা খৃষ্টানকেও বলে, তোমার নিকট ঈসা (আঃ) নবী হিসেবে এসেছিলেন, কিন্তু তুমি মনে করেছ তিনি নিজেই আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র (নাঊজুবিল্লাহি মিন জালেক)। তখন খৃষ্টান বলে যে, তিনি আল্লাহর বন্দা ও রসূল। এভাবে প্রত্যেক আহলে কিতাব মৃত্যুর পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনে। আর একথাই ঘোষণা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। কিন্তু এ সময়ে ঈমান তাদের জন্যে উপকারী হয় না। একথা শ্রবণ করে হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করল, তুমি একথা কোথা থেকে শুনলে অর্থাৎ এর কি সনদ রয়েছে? শহর এবনে হাওসাব হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) সনদ বর্ণনা করলেন।[২]

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ– দূরাত্মা ইহুদীদের এ সমস্ত দৌরাত্মের কারণেই তাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে জুলুমের ব্যাখ্যা হলো, ইহুদীদের যাবতীয় অন্যায় অনাচার যার উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে যেমন অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, আল্লাহর নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করা, আম্বিয়ায়ে

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-৬ খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৬-১৭
২। তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১০৩-০৪

কেরামকে হত্যা করা, হযরত মরয়ম (আঃ)-এর প্রতি অপবাদ দেয়া এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করার মিথ্যা দাবী করা প্রভৃতি। মূলতঃ এসব কারণেই ইহুদী জাতির ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে এবং তাদের জন্যে যে সব বস্তু হালাল ছিল আল্লাহ পাক তা হারাম করে দিয়েছেন। যারা এত অন্যায় কর্মে লিপ্ত হতে পারে, দিনের পর দিন যারা অপরাধ করে বেড়ায় তারা যদি পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করে তবে তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। শুধু তাই নয়; ইহুদীদের অন্যায়ের ফিরিস্তি অনেক সুদীর্ঘ, তারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে এবং সুদ গ্রহণ করে, অথচ এসব ব্যাপারে তাদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এমনিভাবে মানুষের অর্থ-সম্পদ তারা অন্যায়ভাবে ভোগ করে যথা ঘুষ, প্রতারণা, চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি অন্যায় পন্থায় মানুষের অর্থ-সম্পদ তারা গ্রহণ করে, এ কারণে তাদের জন্যে হালাল বস্তু সমূহ হারাম করে দেয়া হয়েছে।

وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

(আর আমি তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদের জন্যে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি।)

পূর্ববর্তী আয়াত দ্বারা হয়তো কেউ একথা বুঝতে পারে যে, শাস্তির এ ঘোষণা সকল আহলে কিতাবের জন্যেই। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, আহলে কিতাবের মধ্যেও কিছু ঈমানদার, নেককার লোক রয়েছে।[১] এরশাদ হয়েছে ঃ

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ

ইমাম রাজী (রহঃ) পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে এ আয়াতের ব্যাখ্যা করে বলেছেন, পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মূর্খ কাফের ইহুদীদের সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে, আর এ আয়াতে ইহুদীদের মধ্যে যারা ঈমানদার, নেককার, গুণী জ্ঞানী তাদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

## আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াতের মর্মকথা হল, ইহুদীদের মধ্যে যারা ঈমানদার যেমন, আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) এবং তাঁর সাথীগণ। তারা জ্ঞানে গুণে সমৃদ্ধ ছিলেন। অতএব, তাদের সে পরিণাম নয় যা ইতিপূর্বে ঘোষিত হয়েছে কেননা, এরা ইহুদী ধর্ম ছেড়ে দিয়ে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আন্তরিকভাবে ইসলাম কবুল করেছেন। বায়হাকী দালায়েলে এবনে এছহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আবদুল্লাহ এবনে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩২৮

সালাম (রাঃ), উসায়েদ এবনে শোবা (রাঃ) এবং সাআলাবা এবনে শোবা (রাঃ) সম্পর্কে। কেননা, তাঁরা ইহুদীদের ধর্ম বর্জন করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যাহোক, আয়াতের অর্থ হলো ইহুদীদের মধ্যে যারা ইসলাম কবুল করেছে, এতদ্ব্যতীত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোহাজের ও আনসার সাহাবাগণ এবং যারা পবিত্র কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যারা পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে বিশ্বাস করে এবং যারা নামায কায়েম করে ও যথানিয়মে যাকাত আদায় করে এবং যারা আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বাস করে শেষ বিচারের দিনের প্রতি তথা কেয়ামতের প্রতি যারা অটুট ঈমান রাখে, তারা নিঃসন্দেহে মহা সৌভাগ্যবান। তাদের এ সৌভাগ্যের কথা আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

অর্থাৎ– এরাই সে সব লোক যাদেরকে আমি মহান এবং বিরাট সওয়াব দান করবো। আর এ সওয়াব লাভ করতে হলে চাই আল্লাহ পাকের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি এবং কেয়ামতের দিনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস। কামেল ঈমান এবং এ ঈমানের সত্যতা প্রমাণিত হতে হবে আমলের মাধ্যমে।[১] তারা নিয়মিত নামায কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে। নামায কায়েমের মাধ্যমে "হক্কুল এবাদ" বা বন্দার হক্ব আদায় করবে। যারা এসব গুণের অধিকারী তাদের জন্যেই রয়েছে এ আয়াতে বিরাট সওয়াবের বিশেষ সুসংবাদ।

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن
بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ
وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن
قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ
تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ
عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১০৫

## তরজমা

(১৬৩) (হে রসূল!) আমি আপনার নিকট ওহী নাযিল করেছি, যেভাবে নূহ নবী এবং তার পরবর্তী অন্যান্য নবীগণের নিকট নাযিল করেছি এবং আমি ইব্রাহীম (আঃ), ইসমাঈল (আঃ), ইছহাক (আঃ) ও ইয়াকুব (আঃ) এবং তাঁর সন্তানগণ ও ঈসা (আঃ), আইয়ুব (আঃ), ইউসুফ এবং হারুন (আঃ) ও সোলায়মান (আঃ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করেছি এবং আমি দাউদ (আঃ)-কে যবুর কিতাব দান করেছি।

(১৬৪) এ সমস্ত রসূলকে সুসংবাদ দানকারী এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে এজন্যে প্রেরণ করা হয়েছে যেন রসূলগণের আগমনের পর আল্লাহ পাকের দরবারে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে এবং আল্লাহ পাক পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।

## তফসীরুল কোরআন

### শানে নুযুল

এবনে এছহাক হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আদি এবনে যায়েদ নামক ইহুদী বলেছিলোঃ আমরা জানিনা যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর পর আল্লাহ পাক কারো নিকট কোন কিতাব নাযিল করেছেন কি-না? একথার জবাবে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাযিল করেছেন।[১]

### ইহুদীদের ভিত্তিহীন দাবী

এ আয়াত সম্পর্কে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, ইহুদীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ দাবী উত্থাপন করে যে, যদি আপনি সত্য নবী হন তবে মূসা (আঃ)-এর ন্যায় একখানি আস্ত কিতাব নিয়ে আসুন। ইহুদীদের এ ভিত্তিহীন দাবীর প্রতিবাদে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যে, ইহুদীদের এ দাবী হল মূর্খতা ও হিংসা প্রসূত। কেননা, নবুওয়্যতের প্রমাণের জন্যে তওরাতের ন্যায় কিতাব আনয়নের দাবী একেবারেই ভিত্তিহীন এবং অমূলক। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্বে বহু আম্বিয়ায়ে কেরাম আগমন করেছেন, যাঁদের নবুওয়্যত ইহুদীরাও মানে, অথচ তাঁদের নিকট তওরাতের ন্যায় কিতাব আসেনি।

এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, নবুওয়্যতের প্রমাণের জন্যে তওরাতের ন্যায় কিতাব আনয়ন শর্ত নয়; বরং যে কোন মোযেজা দ্বারা নবুওয়্যত প্রমাণ করাই যথেষ্ট। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দ্বারা অগণিত মোযেজা প্রকাশ পেয়েছে যা তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নের জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু যারা ভাগ্যাহত তারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহান ধ্বংস হয়েছে।

---

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩২৯
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-৬ খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-২২-২৩

إِنَّا أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ

(হে রসূল!) আমি আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন ইতিপূর্বে নূহ (আঃ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম। এখানে সর্বপ্রথম নূহ (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করার কয়েকটি কারণ বর্ণিত হয়েছে।

১. যেহেতু হযরত আদম (আঃ)-এর ন্যায় হযরত নূহ (আঃ)-ও আদি পিতা হিসেবে পরিগণিত, কেননা নূহ (আঃ)-এর যুগের ঐতিহাসিক প্লাবনের পর যারা তাঁর তরীতে আরোহন করেছিল শুধু তারাই পৃথিবীতে আবাদ হয়েছিল। হযরত নূহ (আঃ)-এর বংশধর ব্যতীত প্লাবনের পর আর কেউ বেঁচে ছিল না। এজন্যে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَٰقِينَ

"আমি তাঁর বংশকেই বাকী রেখেছি"।

২. হযরত আদম (আঃ)-এর প্রতি যে ওহী নাযিল হয়েছিলো তা একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের। এজন্যে হযরত নূহ (আঃ)-কে সর্বপ্রথম শরীয়তের নবী বলা হয়, আর এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ ওহীকে তুলনা করা হয় হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ ওহীর সাথে।

৩. সর্বপ্রথম নূহ (আঃ)–ই শেরকের কারণে আযাব আসবে বলে তাঁর সম্প্রদায়কে ভয় প্রদর্শন করেন। তিনি তওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন কিন্তু সে দাওয়াতে তাঁর উম্মত সাড়া দেয়নি; পরে তিনি বদদোয়া করেছিলেন। পরিণামে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম আযাব আসে।

এতদ্বারা উম্মতে মোহাম্মদীয়ার উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, যদি তোমরা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি ঈমান না আন, তাঁর অনুসরণ না কর তবে তোমাদের প্রতিও যে কোন সময় আযাব আসতে পারে।

বস্তুতঃ হযরত নূহ (আঃ)-এর পূর্বে আল্লাহর ওহীর বিরোধীদের প্রতি আযাব নাযিল হতো না; বরং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হতো। তাদেরকে আত্ম-সংশোধনের সুযোগ দেয়া হতো। কিন্তু হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগে সর্বনাশা প্লাবন আসে এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্য নাফরমান এবং আল্লাহর নবীর আদেশ অমান্যকারীদের নিশ্চিহ্ন করা হয়। পরবর্তীতে হযরত হুদ (আঃ), হযরত ছালেহ (আঃ), হযরত শোয়ায়েব (আঃ) প্রমুখ আম্বিয়ায়ে কেরামের আ মলেও তাদের আদেশ অমান্যকারীদের উপর তথা আল্লাহর নাফরমানদের উপর আযাব আসতে থাকে।

অতএব, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধীদের উপরও আল্লাহর আযাব যে কোন সময় আসতে পারে। পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে–

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْيُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

যারা আল্লাহর নাফরমানী করে তাদের ভয় করা উচিত, যে কোন সময় তাদের উপর বিপদ আপতিত হতে পারে অথবা তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসতে পারে।

এখানে একথাও উল্লেখ্য, সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে সর্বাধিক বয়স পেয়েছেন হযরত নূহ (আঃ)। আর এ অধিক বয়সকে তাঁকে মোযেজা বলা হয়েছে–

فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا

অর্থাৎ– সে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর তাদের মধ্যে অতিবাহিত করে অথচ এত অধিক বয়স হওয়া সত্ত্বেও তাঁর একটি দাঁত পড়েনি। কোন চুল সাদা হয়নি; শারীরিক শক্তি কমেনি। এ সুদীর্ঘকাল যাবত তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের অন্যায় আচরণ সহ্য করেছেন।[১]

## আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াতের মর্মকথা এই, যেভাবে হযরত নূহ (আঃ) থেকে আরম্ভ করে তাঁর পরে হযরত ইব্রাহীম (আঃ), ইসমাঈল (আঃ), ইছহাক (আঃ), ইয়াকুব (আঃ) এবং তাঁর সন্তানগণ এবং ঈসা (আঃ), হারুন (আঃ), সোলায়মান (আঃ) প্রমুখ আম্বিয়ায়ে কেরামের নিকট ওহী প্রেরণ করা হয়েছে, ঠিক তেমনি (হে রসূল!) আপনার প্রতিও ওহী নাযিল করা হয়েছে। পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতি অবতীর্ণ ওহীর যে গুরুত্ব এবং মর্যাদা ছিল প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ ওহী অনুরূপভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং এর বিধি-নিষেধ পালন সবার জন্যে অবশ্য কর্তব্য। এর ব্যতিক্রম করার অধিকার কারোই নেই। যেভাবে পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতি অবতীর্ণ ওহীর বিরোধীদের শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে ঠিক তেমনি (হে রসূল!) যারা আপনার বিরোধিতা করে তাদের পরিণামও ভয়াবহ, তাদের শাস্তিও অবধারিত।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩২৯

وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا

"আর আমি দাউদকে যবুর দান করেছি"।

যবুর সে গ্রন্থের নাম যা হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিলো।

## হযরত দাউদ (আঃ) যখন যবুর পাঠ করতেন

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেন যে, যবুরে আল্লাহ্ পাকের হাম্দ ও সানার বিবরণ ছিল, হযরত দাউদ (আঃ) যখন শহরের বাইরের জঙ্গলে যবুর তেলাওয়াত করতেন তখন বনী ইসরাঈলের ধর্মযাজকগণ তাঁর পেছনে কাতার বন্দী হয়ে দন্ডায়মান হতেন। তাদের পেছনে থাকত অন্যান্য লোক সকল। আর সকল মানুষের পেছনে কাতার বন্দী হয়ে দন্ডায়মান হত জ্বীন জাতি। এদিকে জঙ্গলের চতুঃষ্পদ জন্তুরা তাঁর সম্মুখে হাযির হত এবং নীরবে যবুরের তেলাওয়াত শ্রবণ করত। এমনকি, পাখীরা উড়ে এসে বসত মানুষের মাথার উপর এবং যবুরের তেলাওয়াত শ্রবণ করত।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ রাত্রে তুমি কি আমাকে দেখেছ? আমি তোমার তেলাওয়াত শ্রবণ করছিলাম। দাউদকে প্রদত্ত সুর সমূহ থেকে একটি সুর তোমাকে প্রদান করা হয়েছে। আবু মূসা (রাঃ) আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! যদি আমি জানতাম যে, আপনি শ্রবণ করছেন তবে আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, আমি আরো সুন্দর করে তেলাওয়াত করতাম। হযরত ওমর (রাঃ)-এর সঙ্গে যখন হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-এর দেখা হত তখন তিনি বলতেন আবু মূসা, আমাকে কোরআন পাঠ করে শোনাও যেন আমি নছিহত হাসিল করতে পারি। তখন হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) পবিত্র কোরআন পাঠ করে শোনাতেন।[১]

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ

এবং কয়েকজন পয়গম্বর সম্পর্কে (হে রসূল!) আপনার নিকট ইতিপূর্বে আমি বর্ণনা করেছি যেমন আদম (আঃ), শীশ (আঃ), ইদ্রিস (আঃ), নূহ (আঃ), হুদ (আঃ), ছালেহ (আঃ), ইব্রাহীম (আঃ), লূত (আঃ), ইসমাঈল (আঃ), ইয়াকুব (আঃ), ইউসুফ (আঃ), শোয়ায়েব (আঃ), মূসা (আঃ), হারুন (আঃ), ইউনুস (আঃ), দাউদ (আঃ), সোলায়মান (আঃ), ইয়াসা (আঃ) এবং যাকারিয়া (আঃ), ইয়াহয়া (আঃ), আইয়ুব (আঃ), ইলিয়াস (আঃ) প্রমুখ আম্বিয়ায়ে কেরাম। আর এমন রসূলও রয়েছেন যাঁদের নাম আপনার নিকট তথা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়নি।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৩০

## আম্বিয়ায়ে কেরামের সংখ্যা

এ প্রশ্নটি প্রায় সকলেরই মনে উত্থিত হয়। এ পর্যায়ে হযরত আবু জর (রাঃ) বর্ণিত হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত আবু জর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি আরজ করেছি– ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! সর্বপ্রথম পয়গম্বর কে ছিলেন? তিনি এরশাদ করলেন– আদম (আঃ)। আমি আরজ করলাম তিনি কি নবী ছিলেন? তিনি এরশাদ করলেন– হ্যাঁ নবী ছিলেন যাঁর সাথে কথা বলা হয়েছে।

আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! কতজন রসূল প্রেরিত হয়েছেন?

তিনি এরশাদ করলেন– ৩১০ এর উপর কিছু সংখ্যা, এক বিরাট দল।

হযরত আবু জর (রাঃ) বণিত সুদীর্ঘ হাদীসের এ অংশটুকু আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) তাঁর তফসীরে মাজহারীতে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) তাঁর তফসীরে এবনে মরদবিয়ার সূত্রে এই হাদীসের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন। এ বিবরণ উল্লেখ করার পূর্বে আমরা আম্বিয়ায়ে কেরামের সংখ্যা সম্পর্কে হযরত আবু উমামা (রাঃ)-এর বর্ণনা পেশ করতে চাই।

তিনি বলেন, আমি আরজ করেছিঃ ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আম্বিয়ায়ে কেরামের সংখ্যা কত?

তিনি এরশাদ করলেন, ১ লক্ষ ২৪ হাজার। যাঁদের মধ্যে ৩১৫ জন রসূল হিসেবে আগমন করেছেন।

## হযরত আবু জর (রাঃ)-এর বর্ণনা

তিনি বর্ণনা করেন, আমি মসজিদে হাযির হই। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একাকী তশরিফ রাখছিলেন। আমিও তাঁর নিকট উপবিষ্ট হলাম। আমি আরজ করলাম, আপনি কি নামাজের আদেশ দিয়েছেন?

তিনি এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ, তা উত্তম কাজ, কেউ বেশী করুক বা কম।

আমি আরজ করলামঃ হুজুর কোন্ আমল উত্তম?

তিনি এরশাদ করলেনঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং তাঁর রাহে জেহাদ করা।

আমি আরজ করলামঃ কোন্ মোমেন উত্তম?

তিনি এরশাদ করলেনঃ যে উন্নত চরিত্রের অধিকারী।

আমি আরজ করলামঃ কোন্ মুসলমান সর্বশ্রেষ্ঠ?

তিনি এরশাদ করলেনঃ যার রসনা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।

আমি আরজ করলামঃ কোন্ হিজরত উত্তম?

তিনি এরশাদ করলেনঃ মন্দ কাজ পরিহার করা।

আমি আরজ করলামঃ কোন্ নামায উত্তম?

তিনি এরশাদ করলেনঃ যে নামাযের কেরাত সুদীর্ঘ হয়।

আমি আরজ করলামঃ কোন্ রোজা উত্তম?

তিনি এরশাদ করলেনঃ ফরজ যা যথেষ্ট, আর আল্লাহ্ পাকের নিকট বহু সওয়াব রয়েছে।

আমি আরজ করলামঃ কোন্ জেহাদ উত্তম?

তিনি এরশাদ করলেনঃ যার ঘোড়া কেটে ফেলা হয়, যার রক্ত প্রবাহিত হয়।

আমি আরজ করলামঃ কোন্ গোলাম আজাদ করা উত্তম?

তিনি এরশাদ করলেনঃ যার মূল্য হয় অধিকতর। আর যে গোলাম মালিকের সবচেয়ে প্রিয়।

আমি আরজ করলামঃ কোন্ সদকা উত্তম?

তিনি এরশাদ করেলেনঃ যার সম্পদ কম তার সদকা দানে সচেষ্ট হওয়া এবং গোপনে মোহতাজ ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া।

আমি আরজ করলামঃ পবিত্র কোরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত কোন্টি?

তিনি এরশাদ করলেনঃ আয়াতুল কুরসী।

অতঃপর তিনি এরশাদ করলেনঃ হে আবু জর! সাত আসমান সাত জমীনের তুলনায় আরশ সেরূপ, যেন ময়দানে একটি ঘোড়া পড়ে আছে। আবার কুরসী আরশের তুলনায় সেরূপ যেরূপ একটি খোসার তুলনায় ময়দানের শ্রেষ্ঠত্ব।

## আম্বিয়ায়ে কেরামের সংখ্য কত?

আমি আরজ করলামঃ আম্বিয়ায়ে কেরামের সংখ্যা কত?

তিনি এরশাদ করলেনঃ ১ লক্ষ ২৪ হাজার।

আমি আরজ করলামঃ তন্মধ্যে রসূল কতজন?

তিনি এরশাদ করলেনঃ ৩১৩ জন, অত্যন্ত বড় পবিত্র দল।

আমি আরজ করলামঃ সর্ব প্রথম কে?

তিনি এরশাদ করলেনঃ আদম (আঃ)।

তিনি কি নবীও ছিলেন?

তিনি এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ, আল্লাহ পাক তাঁকে স্বীয় দস্তে মোবারকে পয়দা করেছেন এবং তাঁর মধ্যে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং তাঁকে সঠিকভাবে তৈরী করেছেন।

এরপর তিনি এরশাদ করলেনঃ শোন, চারজন নবী ছুরিয়ানী (১) আদম (২) শীশ (৩) ইদ্রিস, যিনি সর্ব প্রথম কলম দ্বারা লিখেছেন; (৪) আর নূহ এবং আরো চারজন হলেন আরবী, তারা হলেন হুদ, শোয়ায়েব, ছালেহ এবং তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। সর্বপ্রথম রসূল হলেন হযরত আদম (আঃ), সর্বশেষ রসূল হলেন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

## আসমানী কিতাব সমূহের সংখ্যা

আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ আল্লাহ পাক যেসব কিতাব নাযিল করেছেন তার সংখ্যা কত?

তিনি এরশাদ করলেনঃ ১০৪। হযরত শীশ (আঃ)-এর প্রতি ৫০ খানি সহীফা, হযরত ইদ্রিস (আঃ)-এর প্রতি ৩০ খানি ছহীফা, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উপর ১০ খানি সহীফা, আর হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি তওরাত নাযিল হবার পূর্বে ১০ খানি সহীফা। আর কিতাব হল চার খানা। তওরাত, ইঞ্জিল, যবুর এবং পবিত্র কোরআন।

আমি আরজ করলাম– ইয়া রসূলাল্লাহ! হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সহীফায় কি ছিল?

তিনি এরশাদ করলেনঃ তাঁর মূল বক্তব্য ছিল এই– হে বাদশাহ! আমি তোমাকে এ ক্ষণস্থায়ী জগতের সম্পদ একত্রিত করার জন্যে প্রেরণ করিনি; বরং এজন্যে প্রেরণ করেছি, যেন তুমি মজলুমের ফরিয়াদ আমার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে রাখ। যদি আমার নিকট কোন মজলুমের ফরিয়াদ পৌঁছে তবে আমি তা প্রত্যাখ্যান করব না, যদি সে মজলুম কাফের হয় তবুও। আর তাতে কিছু দৃষ্টান্তও স্থান পেয়েছে। যেমন– বুদ্ধিমানের কর্তব্য হল নিজের সময়কে কয়েক ভাগে বিভক্ত করবে। সময়ের একটি অংশ আত্ম জিজ্ঞাসায় ব্যয় করবে। সময়ের আরেকটি অংশ আল্লাহ পাকের গুণাবলীতে চিন্তা ও গবেষণায় অতিবাহিত করবে।

আরেকটি অংশ স্বীয় পানাহারের ব্যবস্থায় ব্যয় করবে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সহীফায় আরো রয়েছে– বুদ্ধিমানের তিনটি কাজ ব্যতীত অন্য কাজে অংশগ্রহণ উচিত নয়।

১. আখেরাতের সম্বল সংগ্রহ করা,

২. জীবিকা নির্বাহে সচেষ্ট হওয়া,

এবং ৩. হালাল বস্তু সমূহের স্বাদ গ্রহণের মাধ্যমে আনন্দিত হওয়া।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সহীফায় একথাও রয়েছে বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্তব্য হল– নিজের সময়ের হেফাজত করা তথা কোন অবস্থাতেই সময়ের অপচয় না করা এবং নিজের কাজে মশগুল থাকা এবং স্বীয় রসনার হেফাজত করা। যে ব্যক্তি নিজের কথা এবং কাজে সামঞ্জস্য বজায় রাখবে সে কথা খুব কমই বলবে। সে কথাই বল যা দ্বারা তুমি উপকৃত হবে।

হযরত আবু জর (রাঃ) বলেনঃ আমি আরজ করলাম– মূসা (আঃ)-এর সহীফায় কি ছিল?

তিনি এরশাদ করলেনঃ তাতে শুধু নছিহত ছিল যেমন আমার আশ্চর্য হয় সে ব্যক্তির প্রতি যে তার মৃত্যুর প্রতি বিশ্বাস রাখে অথচ দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যে ব্যক্তি তকদীদের প্রতি বিশ্বাস করে কিন্তু কোন কিছু না পাওয়ার জন্যে হায়-আক্ষেপ করে। দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী একথা জানে এতদসত্ত্বেও নিশ্চিন্ত মনে থাকে। কেয়ামতের দিন হিসাব দিতে হবে একথাও জানে, এতদসত্ত্বেও সে আমল করে না।

আমি আরজ করলামঃ পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ সমূহে যা কিছু রয়েছে তার কোন অংশ কি আমাদের গ্রন্থে (পবিত্র কোরআনে) রয়েছে?

তিনি এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ সে ব্যক্তিই সফলকাম হয়েছে যে পবিত্র হয়েছে।

আমি আরজ করলামঃ হুজুর আমাকে নছিহত করুন।

তিনি এরশাদ করলেনঃ আমি তোমাকে আল্লাহ্কে ভয় করার নছিহত করছি। এটিই হবে তোমার জন্যে উপকারী।

আমি আরজ করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আরো কিছু নছিহত করুন।

তিনি এরশাদ করলেনঃ তুমি পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত এবং আল্লাহর জিকরে মশগুল থাক। তাহলে তা আসমানে তোমার আলোচনার এবং জমীনে নূর লাভের কারণ হবে।

এরপর আমি আরজ কলাম– আরো কিছু নছিহত করুন।

তিনি এরশাদ করলেনঃ খবরদার! অধিক পরিমাণে হাসির কারণে মানুষের কলবের মৃত্যু হয়, চেহারার নূর দূরীভূত হয়, অতএব তা থেকে তুমি আত্মরক্ষা কর।

আমি আরজ করলামঃ আরো কিছু নছিহত করুন।

তিনি এরশাদ করলেনঃ জেহাদে মশগুল থাক। এতেই রয়েছে আমার উম্মতের দরবেশী।

আমি আরজ করলামঃ আরো নছিহত করুন।

তিনি এরশাদ করলেনঃ উত্তম কথা ব্যতীত অন্য সকল প্রসঙ্গে মুখ বন্ধ রাখবে, তাহলে শয়তান পালিয়ে যাবে এবং দ্বীনি কাজে সাহায্য হবে।

আমি আরজ করলামঃ আরো কিছু নছিহত করুন।

তিনি এরশাদ করলেনঃ তোমার চেয়ে যারা নিম্নস্তরের তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। যারা তোমার চেয়ে উঁচু স্তরে রয়েছে তাদের দিকে নজর দিয়ো না। এতদ্বারা তোমার অন্তরে আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহের মাহাত্ম সৃষ্টি হবে।

আমি আরজ করলামঃ আরো কিছু নছিহত করুন।

তিনি এরশাদ করলেনঃ মিসকীনদের সঙ্গে মহব্বত রাখ, আর তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা কর, তাহলে তুমি আল্লাহ্‌র অনেক রহমত উপলব্ধি করবে।

আমি আরজ করলাম আরো কিছু এরশাদ করুন।

তিনি বললেনঃ আত্মীয়-স্বজনের সাথে মিলে মিশে থাক, যদিও তারা তোমার সঙ্গে না মেশে।

আমি আরজ করলামঃ আরো কিছু নছিহত করুন।

তিনি এরশাদ করলেনঃ হক্ব কথা বলতে থাক, যদিও তা অপ্রিয় হয়।

আমি আরো নছিহতের জন্যে আরজ করলাম।

তিনি এরশাদ করলেনঃ আল্লাহ পাকের ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করোনা।

আমি আরজ করলামঃ আরো কিছু নছিহত করুন।

তিনি এরশাদ করলেনঃ নিজের দোষ-ত্রুটির প্রতি দৃষ্টিপাত করে পরের নিন্দাবাদ থেকে বিরত থাক।

অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার বক্ষে তাঁর দস্তে মোবারক স্থাপন করে এরশাদ করলেনঃ হে আবুজর! চেষ্টা-তদ্বীরের মত বুদ্ধিমত্তার কাজ আর কিছুই নেই। হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার ন্যায় পরহেযগারী আর কিছুই নেই। উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন বংশ মর্যাদা নেই।

মসনদে আহমদেও এই হাদীস সংকলিত হয়েছে। তবে তাতে কিছু কথা কম রয়েছে।[১]

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا

আল্লাহ পাক মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে কথা বলেছেন। সমস্ত নবীগণের প্রতি ওহী এসেছে ফেরেশতাদের মাধ্যমে। কিন্তু মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক এ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, পর্দার অন্তরাল থেকে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। ফেরেশতার মাধ্যম এ পর্যায়ে রাখা হয়নি। এটি তাঁর প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যাঁর মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য থাকবে না, তিনি নবী হবেন না। ঠিক এভাবে সম্পূর্ণ কিতাব এক সঙ্গে নাযিল হওয়া হযরত মূসা (আঃ)-এর অন্য একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এটি নবুওয়্যতের শর্ত নয়। আল্লাহ পাকের বিধান এই যে, কোন কোন নবীকে বিশেষ বিশেষ ফজিলত এবং মর্যাদা দান করেছেন। যেমন হাদীস শরীফে আছে–

"আল্লাহ্ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে তাঁর বন্ধু হওয়ার বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, আর মূসা (আঃ)-কে এ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, তাঁর সঙ্গে আল্লাহ্ পাক কথা বলেছেন। আর আমাকে এ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, তাঁর দীদার লাভে ধন্য করেছেন"।

লক্ষ্যনীয়, হযরত মূসা (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহ পাক তাঁর সাথে কথা বলেছেন কিন্তু তাঁকে দীদার লাভের সুযোগ দেননি এবং তাঁর দরবারে বিনীত নিবেদনের পরও এ দরখাস্ত মঞ্জুর হয়নি। অথচ আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বৈশিষ্ট্য দান করেছেন তা হল তাঁর সঙ্গে কথাও বলেছেন, দীদারও নছিব করেছেন।

এতে একথা প্রমাণিত হলো যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে ইহুদীদের এ দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং অর্থহীন যে, যদি আপনি সত্য নবী হন তবে মূসা (আঃ)-এর ন্যায় আস্ত কিতাব নিয়ে আসুন কেননা, যদি মূসা (আঃ)-এর নিকট আস্ত কিতাব না আসত এবং পর্যায় ক্রমে ওহী আসত, তবুও নবী হিসেবে তাঁর দাবী সত্য হতো।

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-৬ খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৪-২৫

অর্থাৎ– আল্লাহ্ পাক রসূলগণকে এজন্যে প্রেরণ করেছেন যেন তারা মানুষকে আল্লাহর রহমতের খোশ খবরী দান করেন এবং তাঁর আযাবের ভয় প্রদর্শন করেন যেন কেয়ামতের দিন মানুষ এ অভিযোগ করতে না পারে যে, হে আল্লাহ! আমরা পৃথিবীতে তোমার পরিচয় পাইনি এবং কি কাজে তুমি সন্তুষ্ট আর কি কাজে তুমি অসন্তুষ্ট তা-ও বুঝতে পারিনি। যদি তা বুঝতে পারতাম, যদি তোমার বিধি-নিষেধ সম্পর্কে অবগত হতাম তবে অবশ্যই তোমার বিধি-নিষেধ মেনে চলতাম। কোন অবস্থাতেই তোমার নাফরমানী করতাম না। কোন মানুষ কেয়ামতের দিন যেন এমন অভিযোগ করতে না পারে সেজন্যে আল্লাহ পাক পূর্বেই পৃথিবীতে আম্বিয়ায়ে কেরামকে প্রেরণ করেছেন, যেন তারা মোমেনদেরকে জান্নাতের খোশখবরী দান করেন এবং কাফেরদেরকে দোযখের ভয় প্রদর্শন করেন।

বস্তুতঃ যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে ও পরিবেশে আল্লাহর নবীগণ আগমন করেছেন এবং তাঁদের সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র বিধান জানিয়ে দিয়েছেন। অবশেষে আগমন করেছেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তিনি বিশ্বনবী, খাতেমুন নবীয়্যিন, তাঁর পরে আর কোন নবী আসবে না। এর প্রয়োজনও হবে না। তাঁর হেদায়েত সর্বকালের মানুষের জন্যে, তাঁর মহান আদর্শ সার্বজনীন। তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীকে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন, তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়া বিশ্ববাসীর কর্তব্য। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পৃথিবীতে বর্তমান।

অতএব, বিশ্বের কল্যাণকামী, পরিণামদর্শী মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য হল সর্বশেষ নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা এবং পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ করা। যদি কেউ তা গ্রহণ না করে তবে তার শোচনীয় পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, অতঃপর আর কারো একথা বলার সুযোগ থাকবে না যে, হে আল্লাহ! আমরা তো তোমার কথা শুনিনি; অর্থাৎ কাল কেয়ামতের কঠিন দিনে না জানার ভান করা সম্ভব হবে না। দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে অবগতির অভাব, অজ্ঞতার ওজর-আপত্তি আল্লাহ পাকের দরবারে চলবে না।

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাক পয়গম্বর প্রেরণ ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেবেন না। যেমন অন্য আয়াতেও আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

"এবং আমি রসূল প্রেরণ ব্যতীত কোন সম্প্রদায়ের প্রতি আযাব প্রেরণ করি না"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে দুনিয়ার আযাবের ব্যাপারে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কোন সম্প্রদায়ের নিকট নবী প্রেরণ করার পর তারা অবাধ্য হলে তাদের প্রতি আযাব করা হয়, তার পূর্বে নয়।[১]

وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

অর্থাৎ আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান, তাঁর ক্ষমতা অনন্ত অসীম। তিনি মহা-পরাক্রমশালী, তাঁর ক্ষমতা যেমন অপরিমেয় তেমনি অপ্রতিহত। তিনি যদি পূর্বেই নবীদের দ্বারা মানব জাতিকে সতর্ক না করে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে ইচ্ছা করতেন তবে কেউ তাঁকে বাঁধা দিতে পারত না। কিন্তু তিনি যেমন সর্বশক্তিমান তেমনি মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়, সুবিবেচক, করুণাময়, তাই তিনি এভাবে শাস্তি দেন না।[২]

এর অন্য একটি অর্থ হলো, আল্লাহ পাক পরাক্রমশালী, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। ইহুদীরা সম্পূর্ণ কিতাব এক সঙ্গে নাযিল কেন হলোনা তার অভিযোগ করছে। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তা-ও করতে পারতেন, এটি তাঁর জন্যে আদৌ কঠিন কিছু নয়, অতি সহজ। ইমাম রাজী (রঃ)-এর ভাষায়–

অর্থাৎ ইহুদীরা যা চায় তা অত্যন্ত সহজ কাজ।

কিন্তু আল্লাহ পাকের যাবতীয় কাজ হেকমতপূর্ণ। তাদের এ শত্রুতাপূর্ণ এবং অর্থহীন দাবী পূরণ না করাই আল্লাহ পাকের মর্জি।[৩]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৩২
২। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩১
৩। তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১১০
তফসীরে মাআ'রেফুল কোরআন কৃত– আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রহঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩৮

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ
يَشْهَدُوْنَ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿١٦٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿١٦٧﴾ اِنَّ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ
طَرِيْقًا ﴿١٦٨﴾ اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ
عَلَي اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٦٩﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاۗءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ
مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۭ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ
مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧٠﴾

## তরজমা

(১৬৬) কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যা আপনার নিকট নাযিল করেছেন তার সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তা তিনি স্বীয় জ্ঞান দ্বারা নাযিল করেছেন এবং ফেরেশতাগণও তার সত্যতা প্রমাণ করে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট।

(১৬৭) নিশ্চয় যারা কাফের হয়েছে এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিরত রেখেছে, তারা পথভ্রষ্টতায় অত্যন্ত দূরে সরে পড়েছে।

(১৬৮) নিশ্চয় যারা কাফের এবং অত্যাচারী আল্লাহ পাক তাদের কোন দিনও ক্ষমা করবেন না এবং তাদের কোন পথও দেখাবেন না।

(১৬৯) জাহান্নামের পথ ব্যতীত, যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে এবং (কাফেরদেরকে এ শাস্তি প্রদান) আল্লাহ পাকের পক্ষে অত্যন্ত সহজ কাজ।

(১৭০) হে মানব মন্ডলী! তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে তোমাদের নিকট সত্যবাণী বহন করে রসূল এসেছেন, অতএব তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন কর। এটি তোমাদের জন্যে উত্তম পন্থা। আর যদি তোমরা নাফরমানী কর তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আসমান জমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্ পাকের। আর আল্লাহ্ পাক সব বিষয়ে অবগত, তিনি বিজ্ঞানময়।

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাতে সম্পর্ক

যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াত সমূহ প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের প্রমাণ ছিল এবং যারা তাঁর নবুওয়্যতকে অস্বীকার করে তাদের কথার প্রতিবাদ ছিল, তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) যদিও কতিপয় লোক আপনার রেসালতকে মানে না, তারা আপনার বিরোধিতায় তৎপর, কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ পাক আপনার রেসালতের সাক্ষী, তিনিই আপনার নিকট পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন, পবিত্র কোরআন এক অনন্য-সাধারণ মাহাত্মপূর্ণ, বৈশিষ্ট্যমন্ডিত আসমানী গ্রন্থ। আল্লাহ পাক এ মহান গ্রন্থে যে জ্ঞান ভান্ডার পরিবেশন করেছেন এবং যে অমূল্য সম্পদ রেখেছেন, তা অতুলনীয়। তার সম্মুখে বাতিল টিকতে পারে না, আল্লাহ পাক রেখেছেন তাতে হেদায়েতের সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ। যে সব কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করা যায় তার বিবরণ স্থান পেয়েছে এ মহা গ্রন্থে-এর পাশাপাশি যে সব অন্যায় কাজ আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি কারণ হয়, পবিত্র কোরআনে তার বিবরণও রয়েছে।

আর একথা সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত যে, পবিত্র কোরআনে যত জ্ঞান, যত তত্ত্ব ও তথ্য স্থান পেয়েছে, পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে বিশ্ববাসী যে জ্ঞান ভান্ডারের সন্ধান পেয়েছে, তা অন্য কোন আসমানী কিতাব দ্বারা সম্ভব হয়নি। এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে যত লোক হেদায়েত লাভ করেছে অন্য কোন নবী দ্বারা তা হয়নি। পবিত্র কোরআনের তত্ত্ব ও তথ্য মানুষের ধারণা ও অভিজ্ঞতার অনেক ঊর্ধ্বে। এজন্যেই পবিত্র কোরআনের তত্ত্ব ও তথ্য কোন দিনই শেষ হবার নয়; যুগে যুগে যত নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে, পবিত্র কোরআন তার সমাধান পেশ করতে থাকবে কেননা, পবিত্র কোরআন হলো সর্বকালীন মানুষের মুক্তির মহাসনদ, চিরস্থায়ী হেদায়েত।

وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ

অর্থাৎ– (হে রসূল!) আপনার রেসালতের সাক্ষী হয়েছে ফেরেশতাগণ কেননা, আল্লাহ পাকের হুকুমে বদর এবং হোনায়েনের যুদ্ধে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহায্যার্থে ফেরেশতাগণ সরাসরি অবতরণ করেছিলেন।

وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا

(হে রসূল!) যদিও এ ইহুদীরা আপনার রেসালতের সাক্ষ্য না দেয় তবে তাতে কিছু যায় আসে না কেননা, আপনার রেসালতের সাক্ষী হিসেবে স্বয়ং আল্লাহ পাকই

যথেষ্ট। আর আল্লাহ পাকের সাক্ষ্যের তাৎপর্য হলো, আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নবুওয়্যতের দলিল হিসেবে অনেক মোজেযা দান করেছেন এবং অনেক উজ্জ্বল নিদর্শন দিয়েছেন, যা দেখার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করার কোন উপায় থাকে না।[১]

## শানে নুযুল

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ইহুদীদের এক দল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো, তখন তিনি এরশাদ করলেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি তোমরা খুব ভাল ভাবেই জান যে, আমি আল্লাহর সত্য রসূল। তখন তারা বলল, না আমরা তা জানিনা। ঐ সময় এ আয়াত নাযিল হয়।

এবনে জরীর অন্য একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যখন পূর্ববর্তী আয়াত–

اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ

নাযিল হয় তখন ইহুদীরা বলে আপনার নিকট আল্লাহ পাক ওহী প্রেরণ করেছেন একথা আমরা মানিনা। তখন আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাযিল করেছেন এ মর্মে যে, ইহুদীরা অস্বীকার করলেও তাতে কোন ক্ষতি নেই, আল্লাহ পাক স্বয়ং আপনার রেসালতের সাক্ষী।

বায়হাকী দালায়েলে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ

## পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্য

আল্লামা আলুসী (রঃ) এ বাক্যের একাধিক অর্থ বর্ণনা করেছেন।[২]

১. এর অর্থ হলো– আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনকে তাঁর বিশেষ জ্ঞান থেকে নাযিল করেছেন, যে জ্ঞান আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারোই নেই। কোন নবী এবং নৈকট্য-ধন্য কোন ফেরেশতাও সে সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নয়। কেননা, পবিত্র কোরআনের ভাষায় যে উচ্ছ্বাস এবং ভাবের যে অপূর্ব তরঙ্গ রয়েছে আর তার ব্যাকরণের বাঁধনে যে বিস্ময়কর দৃঢ়তা, শব্দচয়নে যে অলংকার রয়েছে তা সত্যিই অতুলনীয়, মানব রচিত কোন গ্রন্থে এর সামান্যতম দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া যায় না।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রহঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪৯
২। তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৯

২. পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিল করেছেন কেননা, আল্লাহ পাক জানেন যে তিনিই এর যোগ্য। ইমাম তাবারী এ অর্থই গ্রহণ করেছেন।

৩. আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন, তাতে রয়েছে বিশ্বমানবের সার্বিক কল্যাণ, আর আল্লাহ পাকই মানব জাতির কল্যাণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল।

৪. আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন, আর তিনি তার হেফাজতও করছেন এবং কিভাবে তার হেফাজত করতে হয় তা তিনি ভাল ভাবেই জানেন।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে লিখেছেন যে, আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় কোরায়শের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরজ করলঃ আমরা আপনার সম্পর্কে এবং আপনার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইহুদীদের জিজ্ঞাসা করেছি যে, তাদের গ্রন্থে আপনার সম্পর্কে কোন আলোচনা আছে কি–না? ইহুদীরা জবাব দিয়েছে আমাদের কিতাবে এ সম্পর্কে কিছু আছে বলে আমরা জানি না। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

## আয়াতের মর্মকথা

এর অর্থ হলো ইহুদীরা অস্বীকার করলে কি হবে আল্লাহ পাক আপনার প্রতি (হে রসূল!) যে কিতাব নাযিল করেছেন তা আপনার সাক্ষ্য দেয় কেননা, পবিত্র কোরআন ভাষা এবং ভাবের দিক থেকে একটি মোজেযা, সর্বকালের মানুষের সম্মুখে পবিত্র কোরআন চ্যালেঞ্জ দিয়েছে-এর অনুরূপ কমপক্ষে ৩ খানি আয়াত রচনা করে হাযির কর কিন্তু আজ পর্যন্ত এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার সাহস ও শক্তি কারোই হয়নি।

অতএব, পবিত্র কোরআনই আপনার নবুওয়্যত প্রমাণ করে।

أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক এই কিতাব তাঁর বিশেষ এলম থেকে নাযিল করেছেন। এ বিশেষ এলমের অর্থ হলো অতীত এবং ভবিষ্যতের গায়বী বিষয়ের এলম। এমনিভাবে এ বিষয়ে অবগত হওয়া যে, কে নবুওয়্যতের যোগ্য আর কার প্রতি কিতাব নাযিল করা যায়। আর এ সম্পর্কে জানা যে, মানব জাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য কিসে রয়েছে, এসব কিছুর এলম শুধু আল্লাহ পাকেরই রয়েছে, আর পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক সে এলম নিহিত রেখেছেন।[২]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা–৬ খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৭
২। তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৩২-৩৩

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং পবিত্র কোরআনের সত্যতার কথা ঘোষণার পর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করে, তৌরাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে তা গোপন রাখে এবং মানুষকে সত্য ধর্ম ইসলাম গ্রহণে বাঁধা দেয়, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তারা প্রথভ্রষ্টতায় অনেক দূরে সরে পড়েছে, তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে, অন্যকেও পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব, তাদের হেদায়েত এবং মাগফেরাত নেই, এর পরিণামে তাদের জান্নাতের কোন সম্ভাবনা নেই। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমনের পর তাঁর অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে শান্তি, মুক্তি এবং নাজাত।

পক্ষান্তরে তাঁর বিরোধিতার অর্থই হলো– গোমরাহীর অন্ধকার এবং সর্বনাশ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান ব্যতীত হেদায়েতের কোন বিকল্প পথ নেই।

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا

অর্থাৎ– যারা আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছে এবং জুলুম করেছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সত্য রসূল একথা জানার পরও তারা অস্বীকার করেছে, মানুষকে তারা কল্যাণের পথ থেকে বিরত রেখেছে, আল্লাহ পাক তাদেরকে মাফ করবেন না। শুধু গোমরাহী এবং পথভ্রষ্টতার কারণে তাদেরকে দোযখের পথ দেখানো হবে যাতে তারা চিরদিন থাকবে আর এ লোকদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষে অত্যন্ত সহজ কাজ।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের সত্যতা, ইহুদী সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা এবং তাদের শোচনীয় পরিণামের কথা ঘোষণার পর এ আয়াতে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি ঈমান আনয়নের আহ্বান জানিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ হে মানব জাতি! তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সত্য ধর্ম নিয়ে আল্লাহর রসূল আগমন করেছেন, অতএব তোমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। মনে রেখ! তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নে এবং তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণেই রয়েছে তোমাদের সার্বিক কল্যাণ।

অতএব, তোমাদের যাবতীয় কল্যাণের লক্ষ্যেই তোমরা তাঁর অনুসরণ কর কিন্তু যদি তোমরা তাঁর অবাধ্য হও, তবে মনে রেখ আসমান জমিনের তথা সমগ্র বিশ্বের একমাত্র অধিপতি হলেন আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন। পৃথিবী ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তার একমাত্র মালিক আল্লাহ পাকই। তোমাদের ঈমানের তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। তোমাদের প্রয়োজনেই তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। তোমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ, তোমাদের সকল গতি-বিধি তাঁর নখদর্পণে। তোমাদের কার্যাবলীর হিসাব নেবেন তিনি, তোমাদের প্রতি তাঁর প্রদত্ত অনন্ত অসীম নেয়ামত কিভাবে ব্যয় হয়েছে তারও হিসাব নেবেন তিনি। অতএব, আল্লাহর রসূলের বিরোধিতা করার মধ্যে শুধু যে তোমাদের কোন কল্যাণ নেই তা নয়; বরং তোমাদের গত্যন্তরও নেই।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর রসূলের প্রতি আল্লাহ পাক যে ওহী প্রেরণ করেন, তা মেনে চলা প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য আর তা অমান্য করা পথভ্রষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

আর আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, তিনি জানেন কে হেদায়েত লাভের যোগ্য আর কে গোমরাহ। তিনি বিজ্ঞানময়। তাঁর কর্ম হেকমত পূর্ণ।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ
اِلَّا الْحَقَّ ؕ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ
كَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰىهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۫ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۟
وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ
سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۱۷۱﴾

**তরজমা**

(১৭১) হে আহলে কিতাব! তোমরা নিজেদের ধর্ম বিষয়ে সীমা লঙ্ঘন করোনা এবং আল্লাহ পাকের সম্পর্কে সত্য কথা ভিন্ন কিছুই বলোনা। মরয়মের পুত্র ঈসা

আল্লাহর রসূল এবং আল্লাহর একটি আদেশ মাত্র (কলেমা) যা আল্লাহ্ পাক মরয়মের নিকট রেখেছিলেন এক আল্লাহ পাকের তরফ থেকে একটি রুহ অতএব, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর, খোদা তিনজন (নাউজুবিল্লাহ) একথা বলোনা; এমন কথা বর্জন কর তা তোমাদের জন্যে ভাল হবে। আল্লাহ পাক অদ্বিতীয় মা'বুদ, এতে সন্দেহ নেই (বন্দেগীর উপযুক্ত শুধু একমাত্র আল্লাহ পাক)। তাঁর জন্যে সন্তান হবে, এ থেকে তিনি পবিত্র এবং আসমান জমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের এবং কার্যনির্বাহক হিসেবে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট।

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্কে

পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদীদের সন্দেহ এবং শত্রুতাপূর্ণ কথাবার্তার জবাব দেয়া হয়েছে এবং দূরাত্মা ইহুদীদের অপকর্মের বিবরণ দিয়ে তাদের ভয়াবহ পরিণামের কথা ঘোষণা করা হয়েছে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের অকাট্য দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। যখন তাঁর নবুওয়্যত প্রমাণিত হয়েছে তখন সমগ্র মানব জাতিকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানানো হয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াতে পুনরায় আহলে কেতাবকে সম্বোধন করা হয়েছে তবে আলোচ্য আয়াতে আহলে কেতাব বলতে বিশেষভাবে খৃষ্টানদের বোঝানো হয়েছে এবং তাদের উদ্দেশ্যে এ নছিহত করা হয়েছে যে তোমরা বাতিল আকীদা পরিহার কর; আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্র রসূলের অনুকরণ কর, যদি তা না কর তবে কঠিন শাস্তির অপেক্ষা কর।

### আহলে কেতাবদের সীমা লঙ্ঘন

বস্তুতঃ আহলে কেতাবরা ধর্মীয় ব্যাপারে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করত, এ পর্যায়ে সীমালঙ্ঘন করতে তারা আদৌ দ্বিধাবোধ করত না। আহলে কেতাবদের দু' দল। ইহুদী এবং খৃষ্টান। ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর অমর্যাদা করতে কসুর করেনি; তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে, তাঁর মাতা হযরত মরয়ম (আঃ)-এর প্রতি অপবাদ দিয়েছে এবং তাঁকে অপমানিত করার জন্যে সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছে।

পক্ষান্তরে খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে সীমালঙ্ঘন করেছে। তাঁকে খোদা এবং খোদার পুত্র বলে অতি ভক্তি প্রকাশ করেছে (নাউজুবিল্লাহি মিন জালেক)। আল্লাহ পাক এ বাড়াবাড়ি আদৌ পছন্দ করেন না; তাই আলোচ্য আয়াতে আহলে কেতাবদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেঃ হে আহলে কেতাব! তোমরা ধর্মীয় ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করোনা;

ভক্তি-শ্রদ্ধারও একটি সীমা আছে, সে সীমা লঙ্ঘন করা আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয় কাজ। যা সত্য যা নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য তাই বল, তার চেয়ে বেশী কিছু বলোনা। মরয়মের পুত্র ঈসা (আঃ) তিনি আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, আল্লাহর বন্দা এবং তাঁর রসূল, তোমরা তাকে স্রষ্টার আসন দিচ্ছ, তাকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে প্রচার করছো। ঈসা, মরয়ম এবং আল্লাহ– এ তিনজনকেই খোদা বলে ত্রিত্ববাদের আবিষ্কার করেছ। এমন ধারণা ধ্বংসাত্মক, মর্মন্তুদ, বিপজ্জনক। এ সর্বনাশা ধারণা বর্জন কর। আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস কর। আল্লাহ পাক এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই, তিনি স্ত্রী-পুত্র ধারণের অনেক উর্ধ্বে, তাঁর মর্তবা এর চেয়ে অনেক উর্দ্ধে। তওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের বিরোধিতা হলো তোমাদের বিভ্রান্তির মূল কারণ অতএব, তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হও। পবিত্র কোরআনের প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর, অনুকরণ কর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের।

## খৃষ্টানদের বিভিন্ন ফেরকা

এখানে উল্লেখ্য, খৃষ্টানদের মধ্যে চারটি ফেরকা বর্তমান ছিলঃ

১. ইয়াকুবিরা ২. মালকানিয়া ৩. নাছতুরিয়া ৪. মারকুছিয়া।

ইয়াকুবিয়া এবং মালকানিয়া ঈসা (আঃ)-কে খোদা বলে বিশ্বাস করত (নাঊজুবিল্লাহ) আর নাছতুরিয়া ফেরকা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে তাঁর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার অর্ঘ নিবেদন করত। আর মারকুছিয়া বলত যে তিনি তিন খোদার একজন (নাঊযুবিল্লাহ)।

## অমার্জনীয় অপরাধ

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক সমস্ত বাতিল ফেরকার ভ্রান্ত আকীদার প্রতিবাদ করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ হে আহলে কেতাব! তোমরা নিজেদের ধর্মীয় ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করোনা; যা দ্বীন নয় তাকে দ্বীন মনে করোনা, আর যা দ্বীনে নেই তাকে দ্বীনে অনুপ্রবেশ ঘটাতে যেয়োনা, এমন কথা যা দ্বীনে নেই তাকে দ্বীনের অংশ মনে করা অমার্জনীয় অপরাধ।

## হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর বন্দা এবং তাঁর রসূল

وَكَلِمَتُهٗ

হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র কলেমা বলা হয়েছে এর কারণ এই, আল্লাহ্ পাক তাঁর সম্পর্কে 'কুন' বাক্য ব্যবহার করেছেন, 'কুন' শব্দের অর্থ 'হও', আল্লাহ্ পাকের এ আদেশের বরকতেই তিনি পয়দা হয়েছেন, তাই তাঁকে আল্লাহর কলেমা

বলা হয়েছে। যেমন সূরা ইয়াছীনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের ব্যবস্থা এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন 'হও' তখন তা হয়ে যায়। আর যেহেতু আল্লহ পাকের হুকুমে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ফুঁক দিয়েছেন, এজন্যে তাঁকে রুহ বলা হয়েছে।

## হযরত ঈসা (আঃ)-এর চারটি বৈশিষ্ট্য

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-এর চারটি গুণ বর্ণনা করেছেন।

১. তিনি মরয়ম পুত্র, আল্লাহ পাকের হুকুমে পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেছেন, ইহুদীরা তাঁর সম্পর্কে যা বলে তা সত্য নয় আর খৃষ্টানরা যা বলে তাও সত্য নয়।

২. তিনি আল্লাহর রসূল। এতে ইহুদী এবং খৃষ্টান উভয় দলেরই বক্তব্যের প্রতিবাদ রয়েছে। ইহুদীরা তাঁকে আল্লাহর রসূল মনে করত না বরং (নাঊজুবিল্লাহ) তাঁকে মিথ্যুক, যাদুকর বলে অভিহিত করত। আর খৃষ্টানরা তাঁকে খোদা এবং খোদার পুত্র বলে মনে করত। অথচ তিনি আল্লাহর বন্দা এবং তাঁর রসূল।

৩. আলোচ্য আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর 'কলেমা' বলা হয়েছে, অর্থাৎ তাঁর ব্যাপারে আল্লাহ পাক 'কুন' কলেমাটি ব্যবহার করেছেন ফলে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। এতে এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁকে কোন দুশমন হত্যা করবেনা কেননা, যে আল্লাহ পাকের কলেমা, সে উপরের দিকে যাবে, অবনমিত হবে না। যেমন কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ

অর্থাৎ– কলেমায়ে তৈয়্যেবা আল্লাহর দিকে যায়।

৪. আলোচ্য আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ)-কে রুহ বলা হয়েছে অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এক পবিত্র রুহ যা হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর ফুঁক দেয়ার মাধ্যমে আত্ম প্রকাশ করেছে। যদিও আকৃতি তার মানুষের ছিল কিন্তু তাঁর মধ্যে ফেরেশতাদের প্রকৃতি নিহিত ছিল আর হয়তো এজন্যেই তাঁকে 'কলেমাতুল্লাহ' বলা হয়েছে। যেভাবে কলেমার বাক্য এবং অক্ষরের মধ্যে একটি মর্মার্থ নিহিত রয়েছে, ঠিক তেমনি হযরত ঈসা (আঃ)-এর মানবীয় আকৃতির মধ্যে ফেরেশতাদের স্বভাব সুপ্ত থাকবে।

এতদ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তিনি ফেরেশতাদের ন্যায় ঊর্ধ্বে গমন করবেন তথা আসমানে গমন করবেন এবং জমীনে অবতরণ করবেন।

যেভাবে হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর ব্যাপারে আসমানে যাওয়া জমীনে আসা প্রমাণিত, ঠিক তেমনি হযরত ঈসা (আঃ) যিনি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বিশেষ রুহ এবং জিব্রাঈলের (আঃ) ফুঁক দেয়ার মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছেন, তাঁর পক্ষে আসমানে যাওয়া এবং দুনিয়াতে আসা সম্ভব হবে।

وَرُوحٌ مِّنْهُ

আর যেহেতু হযরত ঈসা (আঃ)-কে "আল্লাহ পাকের তরফ থেকে রুহ" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে فِيْهِ رُوْحٌ তথা তাঁর মধ্যে রুহ বলা হয়নি; এতে একথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করতে সক্ষম হয়নি। কেননা, হত্যা কর্মটি দেহের উপর কার্যকর হয়, রুহের উপর নয়। অতএব, যাকে আল্লাহ পাক রুহ বলে আখ্যা দেন, তাকে কে হত্যা করতে পারে?

আর যেহেতু আল্লাহ পাক তরফ থেকে রুহ বলেছেন, আর রুহের বৈশিষ্ট্য হলো, যে বস্তুর সাথে রুহ মেশে, সে বস্তু জীবিত হয়। এজন্যে হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক মৃতকে জীবিত করার মোজেযা দান করেছেন। তিনি "দাড়াও আল্লাহর হুকুমে" (قُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ) বললে কবর থেকে মৃত ব্যক্তি বের হয়ে আসত। আর তা আল্লাহর হুকুমেই হতো।[১]

## ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করার নির্দেশ

আলোচ্য আয়াতে যেহেতু ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করার তাগিদ করা হয়েছে, তাই স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর ব্যাপারেও বাড়াবাড়ি না করার জন্যে মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে সতর্ক করেছেন।

মসনদে আহমদে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা আমার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করোনা; যেভাবে খৃষ্টানরা ঈসা এবনে মরয়মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে, আমি তো শুধু আল্লাহ পাকের একজন বন্দা অতএব, আমাকে আল্লাহর বন্দা এবং রসূল বলবে।

এই হাদীস বোখারী শরীফেও সংকলিত হয়েছে। মসনদে আহমদে আরেকখানি হাদীস রয়েছে, কোন ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে

১। তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪২-৪৫

এভাবে কথা বলল– হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! হে আমাদের সর্দার এবং সর্দারের পুত্র! হে আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং সর্বোত্তমের পুত্র! তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের কথা খেয়াল করে বলো, শয়তান যেন তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করে ফেলে, আমি আবদুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ, আমি আল্লাহর বন্দা এবং রসূল। আল্লাহর শপথ! আমি চাই না যে, তোমরা আমার মর্তবার চেয়ে আরো কিছু বাড়িয়ে বল।

এরপর এরশাদ করেনঃ তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি অপবাদ দিয়ো না; আল্লাহ পাকের জন্যে স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততির কথা বলোনা; কেননা তিনি এসব কিছু থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি এসব কিছু থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম এবং সম্মানে কেউ শরীক নেই। তিনি ভিন্ন কোন উপাস্য নেই। তিনি ভিন্ন কোন প্রতিপালক নেই। মরয়ম পুত্র ঈসা আল্লাহর রসূল, তিনি আল্লাহর গোলামদের মধ্যে একজন গোলাম এবং আল্লাহর সৃষ্টি। যেহেতু 'কুন' বাক্যটি উচ্চারণের মাধ্যমে তিনি সৃষ্টি হয়েছেন তাই তাঁকে 'কলেমাতুল্লাহ' বলা হয়। যে কলেমা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আল্লাহ পাকের অনুমতি ক্রমে মরয়ম (আঃ)-এর মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলেন।

যেহেতু পিতা ব্যতীত শুধু কলেমায়ে 'কুন'-এর বরকতে আল্লাহ পাকের বিশেষ কুদরতে হযরত ঈসা (আঃ) পয়দা হয়েছেন, তাই বিশেষভাবে তাঁকে 'কলেমাতুল্লাহ' বলা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক তাঁর সম্পর্কে অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ

অর্থাৎ ঈসা এবনে মরয়ম তো শুধু আল্লাহর রসূল-ই, তার পূর্বেও বহু রসূল এসেছেন।

এমনিভাবে পবিত্র কোরআনে তাঁর সম্পর্কে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ مَسَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ

ঈসার দৃষ্টান্ত আল্লাহ্ পাকের নিকট আদমের ন্যায়। যাঁকে মাটি দ্বারা তৈরী করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন– 'হও' তখন তিনি হয়েছেন।

হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ

"সে তো আমার বন্দা, আমি তাকে নেয়ামত দান করেছি"।

হযরত ওবাদা (রাঃ) বর্ণিত, বোখারী শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের এক হওয়ার এবং তাঁর কোন শরীক না থাকার প্রতি ঈমান আনে এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ পাকের বন্দা এবং রসূল- একথাও বিশ্বাস করে, আর বিশ্বাস করে ঈসা (আঃ) আল্লাহর বন্দা ও রসূল এবং তিনি আল্লাহর হুকুমে পয়দা হয়েছেন, যে হুকুম আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মরয়ম (আঃ)-এর প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় আর ঈসা (আঃ) আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ফুঁকে দেয়া রুহ এবং যে ব্যক্তি জান্নাত এবং দোযখকে সত্য বলে মানে (এক কথায় উপরোক্ত সমস্ত বিষয়ের প্রতি যার পরিপূর্ণ ঈমান থাকে) তার আমলের অবস্থা যাই হোক, আল্লাহ পাক তাকে (ঐ ঈমানের বরকতে) জান্নাত নসীব করবেন।[১]

وَرُوحٌ مِّنْهُ

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-এর মর্যাদা প্রকাশ করার জন্যে রুহ শব্দটির সম্পর্ক নিজের সাথে করেছেন।

## রুহের ব্যাখ্যা

প্রকৃত অবস্থা এই যে, সমস্ত রুহই তো আল্লাহর তরফ থেকে আসে, তিনি আরো লিখেছেন, কোন কোন তফসীরকার রুহ শব্দটির এ ব্যাখ্যাও করেছেন যে, যেহেতু হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর হুকুমে মৃত মানুষকে জীবিত করতেন, অথবা মৃত অন্তর সমূহকে জীবন্ত করে তুলতেন তাই তাঁকে রুহ বলা হয়েছে, আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এখানে রুহ অর্থ সেই ফুঁক যা আল্লাহ পাকের হুকুমে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হযরত মরয়মের (আঃ)-এর প্রতি দিয়েছিলেন, যার ফলে হযরত ঈসা (আঃ) পয়দা হয়েছেন।

কোন জাগতিক ব্যবস্থায় নয়; বরং যেহেতু আল্লাহ পাকের হুকুমের বরকতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম হয়েছে, তাই রুহ শব্দটির সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহ পাকের সাথে করা হয়েছে।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-৬ খন্ড-৭ পৃষ্ঠা-২৭
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৩৬

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এখানে রুহ অর্থ আল্লাহর রহমত কেননা, আল্লাহর রহমত তার প্রতিই বর্ষিত হয় যে, তাঁর প্রতি ঈমান রাখে এবং তাঁর বিধান মেনে চলে।

আর এ সম্পর্কে কোন কোন তফসীরকার একথাও বলেছেন, এখানে রুহ অর্থ হলো ওহী অর্থাৎ মরয়ম (আঃ)-কে সন্তান লাভের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে ওহীর মাধ্যমে। আর জিব্রাঈলকে ওহী প্রদান করা হয়েছে, ফুঁক দেয়ার। আর ঈসা (আঃ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করা হয়েছে 'কুন' তথা 'হও'। তাই তিনি হয়ে গেছেন।

অন্য একটি বর্ণনায় একথাও রয়েছে যে, এখানে রুহ অর্থ স্বয়ং জিব্রাঈল (আঃ)। এমন অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে আল্লাহ পাক মরয়ম (আঃ)-কে তাঁর 'কলেমা' তথা 'কুন' প্রেরণ করেছেন এবং জিব্রাঈল (আঃ) আল্লাহর হুকুমে এ 'কলেমা' মরয়মের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক আদেশ দাতা তথা স্রষ্টা তাই বাক্যটির সম্পর্ক আল্লাহ পাকের সাথে করা হয়েছে (আল্লাহ পাকই সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী)[১]।

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ

যখন সত্য সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হলো এবং অসত্য তার প্রকৃত রূপে ধরা দিল অতএব, তোমরা এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তাঁর শান, মাহাত্ম, শ্রেষ্ঠত্ব, পবিত্রতা তথা যাবতীয় গুণাবলীর প্রতি তোমরা ঈমান আন এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রসূলগণের প্রতিও। যাঁদের মধ্যে ঈসা (আঃ)-ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। মনে রেখ! এ ঈমান আনয়নের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের যাবতীয় কল্যাণ।

وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ

আর খবরদার! তোমরা বলোনা খোদা তিন (নাঊজুবিল্লাহ), কেননা আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়। তিনি লা-শরীক। তাঁর সাথে শেরক করা সবেচেয় বড় মূর্খতা আর সবচেয়ে বড় জুলুম। আর আল্লাহ পাক জালেমদেরকে পছন্দ করেন না। পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত ধারণা হলো খোদা তিন, আল্লাহ, ঈসা, মরয়ম (নাঊজুবিল্লাহ)-এর চেয়ে অমার্জনীয় অপরাধ আর কি হতে পারে? তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

اِنْتَهُوْا

তোমরা ত্রিত্ববাদের এ অপরাধ থেকে বিরত থাক এবং তওবা কর–

خَيْرًا لَّكُمْ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৩৬

আর তাই হবে তোমাদের জন্যে কল্যাণকর।

পক্ষান্তরে, যদি তোমরা ত্রিত্ত্ববাদের এ অপরাধ থেকে বিরত না হাও, তবে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। মনে রেখো আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছে –

اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

আল্লাহ পাক এক, অদ্বিতীয় মা'বুদ।

سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ

স্ত্রী-পুত্র গ্রহণ থেকে তিনি পবিত্র, অনেক উর্দ্ধে তাঁর মহিমা, পবিত্র তাঁর শান অতএব, তোমরা তাঁর শানে ভ্রান্ত ধারণা করোনা। হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে শেরক করোনা। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করে, পবিত্র কোরআনকে অমান্য করে আল্লাহর অবাধ্য কাফের হয়োনা। বোখারী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-থেকে বর্ণিত একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন, আদম সন্তানরা আমাকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে যা তাদের জন্যে বৈধ ছিল না, তারা আমাকে গালি দিয়েছে যা তাদের জন্যে বৈধ ছিল না।

সে মিথ্যা জ্ঞান একথা দ্বারা করেছে যে, আল্লাহ পাক দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করবেন না, অথচ দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করা আমার জন্যে আদৌ কঠিন নয়; আর একথা দ্বারা গালি দিয়েছে, আল্লাহ পাক পুত্র সন্তান গ্রহণ করেছেন (নাঊজুবিল্লাহে মিন জালেক) অথচ আমি এক, অদ্বিতীয়, আমি কারো মুখাপেক্ষী নই, আমার কোন সন্তান-সন্ততি নেই, আমার কোন দৃষ্টান্ত নেই। এই হাদীস হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-ও বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় এ বাক্যটিও রয়েছে, "স্ত্রী-পুত্র গ্রহণ থেকে আমি সম্পূর্ণ পবিত্র"।

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

স্ত্রী-পুত্র গ্রহণ থেকে আল্লাহ পাক যে পবিত্র এবং অনেক উর্দ্ধে- এ সত্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ আসমান–জমীন, দ্যুলোক-ভূলোকে যা কিছু আছে সবই তো আল্লাহ পাকের অধীন। সবই তো আল্লাহর সৃষ্টি, সবই তো আল্লাহ্র গোলাম। অতএব, তাঁর সম্পর্কে এসব কথা চিন্তা করাও মারাত্মক অপরাধ। পৃথিবীর স্থলে, সামুদ্রিক ভাগে এবং অন্তরীক্ষে যা কিছু আছে সবই তো আল্লাহ পাকের আদেশক্রমে অস্তিত্ব লাভ করেছে, সমগ্র সৃষ্টি জগৎ

তাঁর আদেশ পালন করে চলেছে আর সব কিছু লয়ও হবে তাঁর-ই আদেশক্রমে। এমনি অবস্থায় কে তাঁর শরীক হতে পারবে? স্রষ্টা ও সৃষ্টি কি এক? বন্দা এবং মা'বুদ, গোলাম এবং মুনিব কোন অবস্থাতেই এক সমান হতে পারে না। বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে এমন অন্যায় কথা চিন্তা করাও সম্ভব নয়।

وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا

আর কার্য সম্পাদনে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট। অর্থাৎ যাবতীয় কাজ আল্লাহ পাকের এক ইশারাতেই হয়, কারো সাহায্যের তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। অতএব, তাঁর সন্তান-সন্ততি ও শরীক গ্রহণের কোন প্রশ্নই ওঠে না। সন্তানের প্রয়োজন তো এজন্যে হয় যেন সে তার পিতার সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে এবং পিতার মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হয়। কিন্তু আল্লাহ পাক এমন প্রয়োজন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, পবিত্র। সব কিছু থেকে তিনি উর্ধ্বে। যারা এসব কথা বলে তারা তাদের অজ্ঞতা এবং নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়, আল্লাহ পাকের মহিমা এবং মর্যাদা সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞানই নেই।[১]

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ
يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ
عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ﴿۱۷۲﴾ فَاَمَّا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَ
يَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا
فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ
اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۱۷۳﴾

## তরজমা

(১৭২) ঈসা মসীহ কোন দিনও আল্লাহ্ তায়ালার বন্দা হওয়াকে হেয় জ্ঞান করেনি আর নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাগণও তা করেনি। যে ব্যক্তিই আল্লাহর বন্দা হওয়াকে হেয় জ্ঞান করবে এবং অহংকার করবে, তবে আল্লাহ পাক সমস্ত মানুষকে তাঁর নিকট একত্রিত করবেন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৩৭

(১৭৩) অতঃপর যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ পাক তাদেরকে পূর্ণ পুরস্কার প্রদান করবেন এবং তাঁর দয়ায় তাদেরকে অধিক দান করবেন। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র বন্দেগীকে হেয় মনে করবে ও অহংকার করবে, আল্লাহ পাক তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি দেবেন। আর তারা (সে বিপদ মুহূর্তে) আল্লাহ পাক ব্যতীত তাদের জন্যে কোন অভিভাবক বা সহায়ক পাবে না।

## তফসীরুল কোরআন

### শানে নুযুল

আল্লামা বগভী লিখেছেনঃ নাজরানবাসী খৃষ্টানদের যে প্রতিনিধিদল হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়েছিল, তারা বলেছিলো হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি আমাদের পরম পূজনীয় ব্যক্তির অমর্যাদা করেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ আমি তাঁর সম্পর্কে কি বলি? তারা বলল আপনি বলেন, ঈসা (আঃ) আল্লাহর বন্দা এবং রসূল। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আল্লাহর বন্দা হওয়া তো গৌরবের বিষয়; লজ্জার বিষয় নয়। মরয়ম পুত্র ঈসাকে আল্লাহর বন্দা বললে আদৌ তাঁকে হেয় করা হয় না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

### মানবতার অবমাননা

বস্তুতঃ যারা আল্লাহ পাকের মহিমা উপলব্ধি করে, তারা এবাদত-বন্দেগীতে গৌরব বোধ করে এবং বন্দেগীর তৌফিক পাওয়ার জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আল্লাহ পাকের বন্দেগী করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করে।

পক্ষান্তরে, আল্লাহ পাকের বন্দেগী না করে কোন সৃষ্টির সম্মুখে মাথা নত করা হয় প্রকৃত অপমান এমনকি অধঃপতন, তাতেই যে মানবতার অবমাননা। কেননা, মানুষকে আল্লাহ পাক আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতকে মানুষের উপকারার্থে নিয়োজিত রেখেছেন।

এমনি অবস্থায় মানুষ যদি কোন সৃষ্টির উপাসনায় মশগুল হয় তবে এর চেয়ে বড় অবমাননাকর আর কিছুই হতে পারে না। খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৩৭
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪৭

আল্লাহর পুত্র বলে এবং ইহুদীরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে শুধু যে নিজেরা নিজেদের অপমানিত করেছে তাই নয়; বরং নিজেদের ধ্বংসও ডেকে এনেছে। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

আল্লাহর বন্দা হওয়াতে ঈসা মসীহর কোন দিন লজ্জা হয়নি। আল্লাহর বন্দা হওয়াকে সে হেয় মনে করেনি, এমনকি আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাগণও তাতে লজ্জাবোধ করেনি। যেহেতু ঈসা (আঃ) কিছু কিছু গায়বী খবর দিতেন এবং আল্লাহ পাকের কুদরতে তাঁর দ্বারা অলৌকিক ঘটনা ঘটত, আল্লাহর হুকুমে তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারতেন, তাই খৃষ্টানরা তাঁকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে দাবী করে বসে (নাঊজুবিল্লাহি মিন জালেক)। অথচ গায়বী খবর জানার ব্যাপারে ঈসার (আঃ) চেয়েও অধিকতর উত্তম অবস্থান রয়েছেন ফেরেশতারা। তাদের দ্বারাই আল্লাহ পাকের অনেক কুদরত হেকমতের বহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকে। এমনকি তারা অধিকতর শক্তির অধিকারী। আটজন ফেরেশতাই আল্লাহর আরশ বহন করে আছে। আল্লাহ্‌ পাক তাদেরকে এত শক্তি সামর্থ্য দিয়ে রেখেছেন কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা আল্লাহ্‌র বন্দেগীতে লজ্জাবোধ করে না। আল্লাহর বন্দেগীকে হেয় মনে করে না।

এমনি অবস্থায় ঈসা মসীহ যাঁকে সামান্য এবং সীমিত পর্যায়ে অলৌকিক শক্তি প্রদান করা হয়েছে তিনি কি কে আল্লাহর বন্দেগীতে লজ্জাবোধ করবেন? একথা অবাস্তব, অসম্ভব, অকল্পনীয়।[১]

অতএব, আল্লাহর বন্দেগীতে ঈসা (আঃ) এবং আল্লাহর ফেরেশতাগণ লজ্জাবোধ করেননি। দূরাত্মা ইহুদী এবং দুর্বৃত্ত মুশরেকদেরই নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতার কারণে তারা আল্লাহর বন্দেগীকে হেয় মনে করে এবং অহংকার করে, আর একথা সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত যে, যারা আল্লাহর বন্দেগীতে লজ্জাবোধ করে তাদের জানা উচিত যে, আল্লাহ পাক তাদের সকলকে কেয়ামতের কঠিন দিনে একত্রিত করবেন, যেদিন আল্লাহ পাকের প্রতি প্রকৃত ঈমান এবং তাঁর বন্দেগী ব্যতীত আর কোন কিছুই উপকারী হবে না।

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেনঃ এ আয়াত দ্বারা একটি চিরন্তন বিধান ঘোষণা করা হয়েছে আর তা এই, আল্লাহর বন্দেগীতে লজ্জাবোধ করা বা তাতে অহংকার করা কারো দ্বারা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? যখন ব্যবস্থা এই যে, অবশেষে একদিন অবশ্যই প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে এবং জীবনের যাবতীয় কার্যাবলীর হিসাব দিতে হবে।[২]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৮
২। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩৩

বস্তুতঃ পবিত্র কোরআন এ সম্পর্কে মানব জাতিকে বারে বারে সতর্ক করে দিয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ

(তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পাবে, যদিও তোমরা সুরক্ষিত ইমারতে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা কর না কেন) আরো এরশাদ হয়েছেঃ

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا

(তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ্ পাক তোমাদের সকলকে হাযির করবেন) আর অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

(কি করে তোমরা আল্লাহর নাফরমান হও? অথচ তোমাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না, আল্লাহ্ পাকই তোমাদেরকে দান করেছেন জীবন, এরপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করবেন, এরপর তিনি তোমাদেরকে পুনরায় জীবন দান করবেন, এরপর তোমাদেরকে তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে) এমনি বহু আয়াতে এ সম্পর্কে মানব জাতির উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এমনকি, পবিত্র কোরআনের সর্বশেষ আয়াতেও রয়েছে এ সম্পর্কে বিশেষ সতর্কবাণী। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

"তোমরা ভয় কর সেদিনকে, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহ্ পাকের দরবারে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, এরপর প্রত্যেককে তার আমলের বদলা পুরোপুরি দেয়া হবে, আর তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না"।

অতএব, কোন বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে আল্লাহ্র বন্দেগীকে হেয় মনে করা বা তাতে লজ্জাবোধ করা এবং অহংকার করা সম্ভবই নয়। এমনকি, পথভ্রষ্ট খৃষ্টানরা যে ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে দাবী করে (নাঊজুবিল্লাহি মিন জালেক), তিনিও আল্লাহর বন্দেগীকে কোন দিন হেয় মনে করেননি; তাতে লজ্জাবোধ করেননি এবং দিশেহারা মুশরেকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে দাবী করে (নাঊজুবিল্লাহি

মিন জালেক), সেই ফেরেশতারাও সর্বক্ষণ আল্লাহর হুকুম পালনে নিয়োজিত রয়েছে এবং কোন দিনও আল্লাহর বন্দেগীতে লজ্জাবোধ করেনি। তাই হতভাগা ব্যতীত কেউ আল্লাহর বন্দেগীতে লজ্জাবোধ করতে পারে না।

## মানুষের চেয়ে ফেরেশতাদের মর্যাদা অধিকতর নয়

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে অন্য একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য আয়াতে ঈসা (আঃ)-এর কথা এবং এরপর ফেরেশতাদের উল্লেখ রয়েছে। এতে কেউ কেউ একথা প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন যে, মানুষের চেয়ে ফেরেশতাদের ফজিলত ও মর্যাদা অধিকতর। সেজন্যে পবিত্র কোরআনের বর্ণনা-ধারার প্রথমে ঈসা (আঃ) এবং পরে ফেরেশতাদের উল্লেখ রয়েছে এবং এরশাদ হয়েছেঃ ঈসা মসীহ আল্লাহ্‌র বন্দা হতে লজ্জাবোধ করে না এবং নৈকট্যের জন্যে ফেরেশতারাও এতে লজ্জাবোধ করে না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, পবিত্র কোরআনের এ বর্ণনা শৈলী দ্বারা মানুষের চেয়ে ফেরেশতাদের ফজিলত বেশী– একথা আদৌ প্রমাণিত হয় না। কেননা, এখানে 'মালায়েকা' শব্দটির উল্লেখ তাদের ফজিলত বর্ণনার উদ্দেশ্যে করা হয়নি; বরং উদ্দেশ্য হলো উভয় বাতিল ফেরকার প্রতিবাদ। খৃষ্টানদের যে দলটি ঈসা মসীহর পূজায় লিপ্ত, তাদের যেমন প্রতিবাদ রয়েছে এ আয়াতে ঠিক তেমনি পৌত্তলিকদের মধ্যে যারা ফেরেশতাদের পূজারী তাদেরও প্রতিবাদ রয়েছে। অতএব, এতদ্বারা মানুষের চেয়ে ফেরেশতাদের অধিকতর ফজিলতের কথা প্রমাণিত হয় না।

বিখ্যাত তফসীরকার আল্লামা বয়যাভী লিখেছেনঃ যদি একথা মেনেও নেয়া যায় যে, প্রথমে যার উল্লেখ তার মর্তবা পরে যার উল্লেখ তার চাইতে কম, তবুও এতে মানব জাতির চেয়ে ফেরেশতাদের অধিকতর মর্যাদার কথা প্রমাণিত হয় না কেননা, বর্ণনা শৈলীর এ পন্থাকে গ্রহণ করলে নৈকট্য-ধন্য ফেরেশতাদের মর্যাদা ঈসা (আঃ)-এর মর্যাদা থেকে অধিকতর মনে হবে। আর নৈকট্য ধন্য ফেরেশতা হলেন যারা আল্লাহর আরশ বহন করে আছেন। কিন্তু এতদ্বারা মানব জাতির উপর ফেরেশতা জাতির প্রাধান্য বা ফজিলত প্রমাণিত হয় না।[১] এজন্যে যে, ফেরেশতাদের মধ্যে আল্লাহর নাফরমানী করার কোন শক্তিই নেই, অথচ মানুষের মধ্যে আল্লাহ পাক সে শক্তি দিয়ে রেখেছেন, এতদসত্ত্বেও মানুষ যদি আত্মসংযমের অভ্যাস করে, আল্লাহর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করতে প্রয়াসী হয় এবং আল্লাহর বন্দেগীতে মশগুল থাকে, তবে তার মর্যাদা নিঃসন্দেহে ফেরেশতাদের বন্দেগীর চাইতে অধিকতর। এজন্যেই সাধক কবি বলেছেনঃ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-

"হে মানব জাতি! তোমার মাঝে যেমন চতুঃষ্পদ জন্তুর চরিত্র রয়েছে, তেমনি রয়েছে ফেরেশতাদের চরিত্র। তুমি চতুঃষ্পদ জন্তুর চরিত্র বর্জন কর, তাহলে ফেলেশতাদের চেয়ে অধিকতর হবে তোমার মর্যাদা"।

## আয়াতের মর্মকথা

মানুষ তার অস্তিত্ব লাভ করেছে এক আল্লাহ পাকের দানে–

"এ পৃথিবীতে আমরা ছিলাম না, এখানে আগমনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের ছিল না, করুণাময় হে আল্লাহ! তোমার অনন্ত অসীম দয়া আমাদের অব্যক্ত কথাও শ্রবণ করে"।

যাহোক, মানুষের জীবন ও জীবনের যথাসর্বস্ব এক আল্লাহ পাকের দান ব্যতীত আর কিছুই নয়। দ্বিতীয়ত, এখানে অবস্থানকাল এবং এখান থেকে গমন তথা মৃত্যুবরণের ব্যাপারেও মানুষের কোন ইচ্ছা কার্যকর হয় না।

এক আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই সর্বত্র কার্যকর, পৃথিবীতে মানুষের আগমন- এখান থেকে তার গমন ও এখানে তার অবস্থান এসব কিছুই এক আল্লাহ্ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন। তৃতীয়ত, মানুষ তার পানাহার সহ অন্যান্য অনেক প্রয়োজনের বাঁধনে আবদ্ধ, আল্লাহর দান ও রহমত ব্যতীত তার গত্যন্তর নেই।

এতদ্ব্যতীত, মানুষ রোগ-শোক এবং বালা-মছিবত থেকে মুক্ত নয়। যে কোন সময় সে রুগ্ন, অসুস্থ এবং বিপদগ্রস্ত হয়ে অসহায় হয়ে পড়ে। আর এমন মুহূর্তে আল্লাহ পাকের অপার রহমতই তার একমাত্র আশা, আর এক আল্লাহ পাকের প্রতিই তার ভরসা।

এমনি অবস্থায় আল্লাহ্র বন্দেগীতে অনীহা প্রকাশ করা, আল্লাহ্র বন্দেগীকে হেয় মনে করা এবং অহংকার করা মানুষের পক্ষে কিভাবে সম্ভব হতে পারে?

পথভ্রষ্ট খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে যে বাড়াবাড়ি করেছে এবং তাঁকে আল্লাহর বন্দা না বলে স্রষ্টার আসন দিয়েছে, কেউ আল্লাহর পুত্র বলে প্রচার করেছে আর কেউ ত্রিত্ত্ববাদ আবিষ্কার করেছে– এ সমস্ত বিভ্রান্তির কারণ শুধু এই যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ পাকের কুদরতে পিতা ব্যতীত জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং তিনি জন্মান্ধকে চক্ষুষ্মান করে দিতেন, কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করতেন। এমনকি মৃতদেরকে জীবিত করতেন এবং মানুষ রাতে কি আহার করেছে এবং বাড়ীতে কি রেখে এসেছে সবই বলে দিতেন। এসবই তিনি আল্লাহ পাকের প্রদত্ত ক্ষমতা বলেই করতেন। নিজের শক্তিতে নয়; বরং আল্লাহ পাকের শক্তিতেই করতেন। কিন্তু এ

সত্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে পথভ্রষ্ট খৃষ্টানরা। তাই তারা ঈসা (আঃ)-এর মর্যাদার ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করেছে এবং ঈসা (আঃ) আল্লাহর সৃষ্টি, তাঁর বন্দা এবং রসূল, একথা না বলে অনেক ভিত্তিহীন কথা বলেছে। খৃষ্টানরা যদি এ সত্য উপলব্ধি করত যে, ঈসা (আঃ)-এর এসব গুণাবলী ফেরেশতাদের মধ্যে অধিক পরিমাণে রয়েছে, এতদসত্ত্বেও ফেরেশতারা সর্বদা আল্লাহর বন্দেগীতে মশগুল থাকে, কোন দিন আল্লাহ্‌র বন্দেগীকে হেয় মনে করেনা, এমন অবস্থায় ঈসা (আঃ) কি করে আল্লাহর বন্দেগীকে হেয় মনে করবেন?

এতদ্ব্যতীত যেহেতু খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে এবং তাঁকে এমন মর্যাদায় আসীন করেছে যা তাঁর জন্যে নয়, তাই আলোচ্য আয়াতে ঈসা (আঃ)-এর উপর ফেরেশতাদের ফজিলতের প্রতি অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছে। যদিও সেই ফজিলত নিতান্ত আংশিক কিন্তু ইঙ্গিত যে হয়েছে একথা সত্য।

এতদ্বারা হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে খৃষ্টানদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করা হয়েছে।[১]

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

পূর্ববর্তী আয়াতে খৃষ্টানদের আকীদার বাতুলতা ঘোষণার পর সাধারণভাবে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়ন ও নেক আমল করার আহ্বান জানিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং সে ঈমানের দাবী মোতাবেক নেক আমল করে, আল্লাহ পাক তাদের সওয়াব পুরোপুরি দান করবেন। শুধু তাই নয়; বরং তিনি তাঁর দানে তাদেরকে ধন্য করবেন এবং তাদের যা প্রাপ্য তার চেয়ে অনেক বেশী দান করবেন যা কেউ কোনদিন দেখেনি, যে সম্পর্কে কেউ কোন দিন কিছুই শ্রবণ করেনি এমনকি যা কোনদিন কেউ চিন্তাও করেনি।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ্‌র বন্দেগীকে হেয় মনে করবে এবং আল্লাহর এবাদতকে তুচ্ছ মনে করে তাতে অনীহা প্রকাশ করবে ও অহংকার করবে, আল্লাহ পাক তাদেরকে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।

وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ

আর আল্লাহ পাক ব্যতীত তারা অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৩৮-৩৯

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ
مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ﴿١٧٤﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ
مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿١٧٥﴾

يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ
لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ
اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا
تَرَكَ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْاُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٧٦﴾

তরজমা

(১৭৪) হে মানবমন্ডলী! নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক অকাট্য প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নূর নাযিল করেছি।

(১৭৫) অতঃপর যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছে তাদেরকে আল্লাহ পাক অদূর ভবিষ্যতে স্বীয় রহমত ও দয়ার মধ্যে প্রবেশ করাবেন এবং এ সমস্ত লোককে তাঁর তরফ থেকে সরল–সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন।

(১৭৬) (হে রসূল!) লোকেরা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করে 'কালালাহ' সম্পর্কে অর্থাৎ যে ব্যক্তির ওয়ারিশের মধ্যে পিতা ও পুত্র নেই, তার মৃতুর পর কে তার পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তির মালিক হবে এ সম্পর্কে মানুষ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি এর জবাবে বলে দিন যে, আল্লাহ তায়ালা কালালাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে ব্যবস্থা দিচ্ছেন, যদি এমন কোন ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তার কোন সন্তান নেই এবং শুধু তার এক ভগ্নি থাকে, তবে সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক হবে ভগ্নির জন্যে, আর এ ভগ্নির সম্পত্তির (অনুরূপ) অংশীদার হবে যদি তারও কোন সন্তান না থাকে, আর যদি তার দু' ভগ্নি থাকে তবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির দু' তৃতীয়াংশ তারা পাবে, আর যদি ওয়ারিশের একাধিক ভাই বোন থাকে, নর এবং নারী তবে একজন

পুরুষ দু'জন নারীর সমান পাবে। আল্লাহ পাক সুস্পষ্টভাবে তাঁর বিধি-নিষেধ তোমাদের জন্যে বর্ণনা করেন যেন তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং আল্লাহ তায়ালা সব কিছু ভালভাবেই জানেন।

## তফসীরুল কোরআন

আল্লাহ পাক পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে সমস্ত বাতিল ফেরকার তথা মুনাফেক, কাফের, ইহুদী এবং খৃষ্টানদের সকল বাতিল আকীদার প্রতিবাদ এবং তাদের সকল সন্দেহের সুস্পষ্ট এবং সন্তোষজনক জবাব দিয়েছেন।

### ঈমান আনয়নের আহ্বান

এরপর এ আয়াতে সমগ্র মানব জাতিকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের প্রতি ঈমান আনয়নের আহ্বান জানিয়ে এরশাদ করেছেনঃ

يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

(হে মানব জাতি! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে অকাট্য প্রমাণ পৌঁছে গেছে) এ আয়াতে 'বোরহান' শব্দ দ্বারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, তাঁর কাজই হলো সত্যের উপর দলিল–প্রমাণ উপস্থাপন করা, সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং বাতিলের বাতুলতা ঘোষণা করা, আর এ আয়াতে পবিত্র কোরআনকে "নূর" বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে (কেননা, মানব মনে ঈমানের নূর সৃষ্টি হয় পবিত্র কোরআন দ্বারা)। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের জ্বলন্ত প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, অন্যদিকে পবিত্র কোরআনের উজ্জ্বল আলোক উদ্ভাসিত হয়েছে, ইহুদী–খৃষ্টানদের বিভ্রান্তির অমানিশা কেটে গেছে।

অতএব, হে বিশ্ববাসী! তোমরা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্ব গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের আলোকে নিজেদের অন্তরকে আলোকিত কর ও হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শরীয়তকে আঁকড়ে ধর তথা জীবনের সর্ব স্তরে তা মেনে চল।[১]

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ

অতঃপর যারা আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর দ্বীনকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং তার উপর সর্বদা সুদৃঢ় থাকবে, আল্লাহ পাক তাদেরকে তাঁর অশেষ রহমত ও অনন্ত অসীম দানে ধন্য করবেন।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১১৯-২০

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে "রহমত" শব্দ দ্বারা জান্নাতকে বোঝানো হয়েছে, আর এতে যে সওয়াব আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান ও নেক আমলের জন্যে রয়েছে আল্লাহ পাক তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এতদ্ব্যতীত, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তারা লাভ করবে অনন্ত অসীম নেয়ামত। আর আলোচ্য আয়াতে 'ফজল' শব্দটির অর্থ হলো নির্দিষ্ট সওয়াবের চেয়ে বাড়তি যে সওয়াব এবং নেয়ামত আল্লাহ পাক বন্দাকে দান করবেন, যেমন আল্লাহ পাকের দীদার নসীব হওয়া এবং তাঁর নৈকট্য লাভে ধন্য হওয়া।[১]

يَسْتَفْتُوْنَكَ ۖ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ

## পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

সূরা নেছার শুরুতে উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় বিবরণ স্থান পেয়েছে। এ সূরার মাঝে ছিল, দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে যারা কাজ করে তাদের আলোচনা। এ সূরার শেষ পর্যায়ে এ আয়াত থেকে পুনরায় উত্তরাধিকার সম্পর্কে বিধান পেশ করা হয়েছে।

## শানে নুযুল

এবনে মরদবিয়া বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে কালালাহ'র মিরাছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেন। এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) লোকেরা আপনার নিকট কালালাহ'র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলুন, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে হুকুম দিচ্ছেন (কালালাহ'র ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে)।[২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যা নেসায়ী শরীফে সংকলিত হয়েছে।

হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি অসুস্থ হয়েছিলাম তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করেন। আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমি কি আমার ভগ্নিদের জন্যে আমার মূল সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের ওসীয়ত করতে পারি? তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ তাদের সঙ্গে তুমি ভাল ব্যবহার কর, তাদের কল্যাণ সাধন কর। আমি আরজ করলাম, আমি কি আমার সম্পত্তির অর্ধেকের ব্যাপারে ওসীয়ত করতে পারি? তিনি

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৪১
তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১২০
২। কালালাহ'র ব্যাখ্যায় তফসীরে নূরুল কোরআন ৪র্থ খন্ডের ৩৪৮ পৃষ্ঠা দ্রঃ

এরশাদ করলেন, তুমি তাদের কল্যাণ সাধন কর। এরপর তিনি তশরীফ নিয়ে গেলেন। একটু পরে পুনরায় আগমন করলেন এবং এরশাদ করলেনঃ আমার মনে হয়, এ রোগে তোমার মৃত্যু হবে না। আল্লাহ পাক তোমার এবং তোমার ভগ্নিদের ব্যাপারে হুকুম নাযিল করেছেন, আর তা হলো তোমার সম্পত্তির দু' তৃতীয়াংশ সম্পর্কে (তুমি ওসীয়ত করতে পার)।

হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন এ আয়াত আমার সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ)-এর বিবরণ বোখারী এবং মুসলিম শরীফেও সংকলিত হয়েছে তিনি বলেন, আমি একবার অসুস্থ হই, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) আমাকে দেখতে আসেন। আমার তখন চেতনা ছিল না, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অজু করলেন এবং তাঁর অজুর পাত্রে যে পানি অবশিষ্ট রইল, তা তিনি আমার উপর ছিটিয়ে দিলেন, ফলে আমার সংজ্ঞা ফিরে এলো। তখন আমি দেখতে পেলাম, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শুভাগমন হয়েছে, আমি তখন আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমি কালালাহ, আমার উত্তরাধিকার কিভাবে বিতরণ হবে? তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

হাফেজ এবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) লিখেছেন যে, এ সূরার শুরুতে যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত যাবের (রাঃ)-এর এ ঘটনা তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।[২]

এখানে উল্লেখ্য, এ সূরার শুরুতে "কালালাহ" সম্পর্কে একখানি আয়াত রয়েছে যা নাযিল হয়েছে শীতকালে। আর আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে গ্রীস্মকালে। তাই তফসীরকারগণ বলেন যে, কালালাহ সম্পর্কে দু'খানি আয়াত নাযিল হয়েছে, একটি "আয়াতুশ শেতা" অর্থাৎ শীতকালে অবতীর্ণ আয়াত অপরটি "আয়াতুশ শায়েফ" অর্থাৎ গ্রীস্মকালে অবতীর্ণ আয়াত।[৩]

তত্ত্বজ্ঞানী আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এ আয়াত সহোদর বোনদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে যদি সহোদর বোন না থাকে, তবে আল্লাতী ভাই বোনের (বাপ এক, মা ভিন্ন) হুকুম সহোদর ভাই বোনের অনুরূপ হুকুম হবে।

اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ

যদি কোন মানুষের মৃত্যু হয় এবং তার কোন সন্তান-সন্ততি না থাকে এবং শুধু সহোদর বোন থাকে, তবে বোন ভাইয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে অর্ধেক পাবে।

১। তফসীরে মাআ'রেফুল কোরআন কৃত–আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬৮
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৪২
৩। তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১২০

وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ

কিন্তু যদি বোনের মৃত্যু হয়, আর তার কোন সন্তান-সন্ততি না থাকে, তবে ভাই সহোদর বোনের সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে, কিন্তু শর্ত হলো– মৃতের পিতা-পিতামহ কেউ যদি না থাকে, এ শর্ত 'কালালাহ' শব্দ থেকেই বোঝা যায়।

فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ

যদি দু' বোন বা তার চেয়ে বেশী থাকে (আর কোন ভাই না থাকে) তবে ভাইয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে দু' তৃতীয়াংশ বোনদের হবে।

وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

আর যদি ভাই বোনদের একদল থাকে, কিছু পুরুষ কিছু নারী, যদি দু' ভাই বোন হয় তবে একজন পুরুষের অংশ হবে দু'জন স্ত্রীলোকের সমান। অর্থাৎ বোনের সঙ্গে যদি এক ভাই থাকে অথবা তার চেয়ে বেশী সংখ্যক থাকে, তবে প্রত্যেক ভাইকে বোনের অংশের সমান দেয়া হবে, আর যদি এক বা একাধিক ভাই থাকে আর বোন থাকে একজন, তবে বোনকে এক ভাইয়ের অংশের অর্ধেক দেয়া হবে। মোট কথা– পুরুষের দু' অংশ এবং স্ত্রীলোকের এক অংশ হবে।

বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) এবং হযরত সোলায়মান এবনে রবীয়া (রাঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে বলে যে, এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে, তার ওয়ারিশানদের মধ্যে রয়েছে এক মেয়ে, এক নাতনী এবং একজন সহোদর বোন, এখন তার সম্পত্তি কিভাবে বন্টন করা হবে? তাঁরা উভয়ে বললেন, মৃত ব্যক্তির কন্যা পাবে অর্ধেক, আর বোন পাবে অর্ধেক (অর্থাৎ নাতনী মাহরুম হবে)। তাঁরা বললেন, তুমি এবার হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট যাও, তিনিও আমাদের মত সমর্থন করবেন। ঐ ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট গমন করল। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বললেনঃ যদি আমি তাদের মত সমর্থন করি তাহলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাব, আমি সে হুকুমই দেব যা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। এক্ষেত্রে মৃত পিতার মেয়ে পাবে অর্ধেক সম্পত্তি, আর নাতনী পাবে সম্পূর্ণ সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ। এভাবে দু' তৃতীয়াংশ মেয়ে এবং নাতনি পাবে, আর অবশিষ্টাংশ (অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ) বোনের হবে।[১] –(বোখারী শরীফ)

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৪৩

يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্যে যাবতীয় বিধি-নিষেধ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন, যদি তোমাদেরকে এসব কথা বিস্তারিত ভাবে না বোঝানো হয় এবং তোমাদেরকে তোমাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়, তবে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। এজন্যে আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করছেন যাতে করে তোমরা নিজেদের ইচ্ছা মাফিক জীবন যাপন বর্জন কর এবং আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা ও মর্জি মোতাবেক জীবন যাপন কর।

এ আয়াতের আরেকটি অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক হক্ব কথা সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করছেন কেননা, তোমাদের পথভ্রষ্ট হওয়া তাঁর নিকট একান্ত অপছন্দীয়।

কুফাবাসী ভাষাবিদগণের মতে, تَضِلُّوْا শব্দটির পূর্বে একটি 'লা' যুক্ত আছে, এমন অবস্থায় আয়াতের তৃতীয় অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক তাঁর বিধি-নিষেধ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করছেন, যাতে করে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও।

তিনটি অর্থই প্রায় কাছাকাছি। অতএব, এর সবই গ্রহণ করা যেতে পারে।[১]

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

"আর আল্লাহ্ পাক সব বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল"।

মানুষের জীবন ও মৃত্যু এবং তার সকল রহস্য এবং মানুষের যাবতীয় কল্যাণ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত। অতএব, কাকে কত অংশ দিতে হবে, কে কতখানি অংশের উত্তরাধিকারী হবে, এর নির্ভুল সিদ্ধান্ত দিতে পারেন একমাত্র আল্লাহ্ পাক।

সুতরাং মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত বিধি-নিষেধ সমূহ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা, তাঁর বিধি-নিষেধ পালনে অবহেলা না করা।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ সূরা শুরু করা হয়েছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের বিবরণের মাধ্যমে। আল্লাহ্ পাক যে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একথা ঘোষণা করা হয়েছে আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ

অর্থাৎ– হে মানব জাতি! ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সকলকে একই ব্যক্তি থেকে। আর এ সূরার সর্বশেষ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে আল্লাহ্ পাকের পরিপূর্ণ জ্ঞানের কথা–

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১২১
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৪৪

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

"এবং আল্লাহ পাক সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল"।

অতএব, সূরার প্রারম্ভে আল্লাহ পাকের পরিপূর্ণ ক্ষমতার এবং পরিসমাপ্তিতে পরিপূর্ণ জ্ঞানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং বন্দা মাত্রেরই কর্তব্য হলো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী প্রতিপালকের বিধান বিনা দ্বিধায় মেনে চলা। তাঁর যাবতীয় বিধি-নিষেধ পালনের মধ্যেই মানব জীবনের সাফল্য রয়েছে নিহিত।[১]

হযরত বরা এবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, সর্বশেষ য়ে সূরাটি পবিত্র কোরআনে নাযিল হয়েছে তা হলো সূরা বরাত, আর সর্বশেষ যে আয়াতখানি নাযিল হয়েছে তা হলো সূরা নেছার সর্বশেষ আয়াত। অবশ্য হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, সর্বশেষে নাযিল হয়েছে সুদ সম্পর্কীয় আয়াত, আর সর্বশেষ যে সূরা নাযিল হয়েছে তা হলো সূরা নসর।

আর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, পবিত্র কোরআনের সর্বশেষ যে আয়াত খানি নাযিল হয়েছে তা হলো–

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ

আর এ-ও বর্ণিত আছে যে, সূরা নসর নাযিল হওয়ার পর হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ৬ মাস জীবিত ছিলেন. এরপর বিদায় হজ্বের উদ্দেশ্যে গমনের পথে নাযিল হয় আলোচ্য আয়াত।

يَسْتَفْتُوْنَكَ ط قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ

আর আরাফার ময়দানে অবস্থান কালে নাযিল হয়েছিলো ঃ

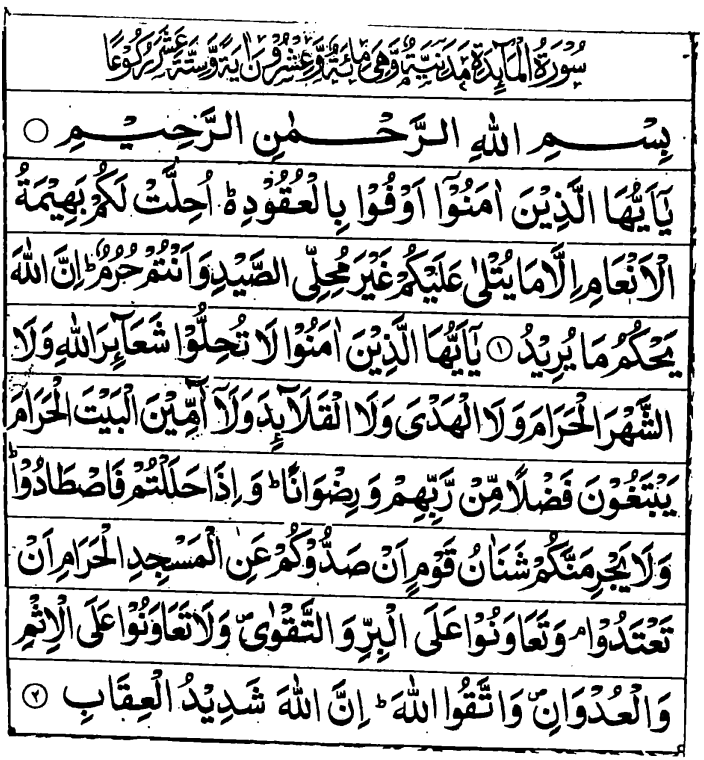
اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ.....الاية

এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মাত্র ৮১ দিন জীবিত ছিলেন, পরে নাযিল হয় সুদ সম্পর্কীয় আয়াত। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মাত্র ২১ দিন পৃথিবীতে ছিলেন।[২]

আলহামদুলিল্লাহ্! অদ্য ১২ শাওয়াল ১৪০৯ হিজরী মোতাবেক ১৮-৫-৮৯ রাত ১০-১৫ মিনিটে সূরা নেছার তফসীর সমাপ্ত হলো।

*হে আল্লাহ! তফসীরে নূরুল কোরআন সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর। আমাদের এ সাধনাকে কবুল কর এবং দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানের সাফল্য দান কর। তোমার সন্তুষ্টি লাভের তওফিক দান কর। আমীন।*

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১২৩
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৪৯


سُوْرَةُ الْمَآئِدَةِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ مِائَةٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً وَّسِتَّ عَشَرَ رُكُوْعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۚ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ
الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ① يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا
الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ
يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ
تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۚ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ②

# সূরা মায়েদা

**পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের নামে (আরম্ভ করছি)।**

(১) হে ঈমানদারগণ! অঙ্গীকার সমূহ পূর্ণ কর। যে সমস্ত চতুঃষ্পদ জন্তু সম্পর্কে পরে বর্ণনা আসছে, তা ছাড়া আর সমস্ত গৃহপালিত জন্তু তোমাদের জন্যে হালাল হয়েছে, তবে এহরাম অবস্থায় যে শিকার করা হয়, তা হালাল নয়। নিশ্চয় আল্লাহ পাক স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী আদেশ করেন।

(২) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তায়ালার নিদর্শন সমূহের, সম্মানিত মাসের, কা'বা শরীফে কোরবানী করার জন্যে নির্দিষ্ট জন্তুর এবং সে সব জন্তু যার গলায় কণ্ঠাবরণ পরিয়ে কা'বা শরীফে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সে সব লোকের যারা কা'বা শরীফের দিকে যাত্রা করেছে, যারা স্বীয় পালনকর্তার দান এবং সন্তুষ্টি চায়, তোমরা উল্লেখিত বস্তু সমূহের অপমান করোনা। আর যখন (তোমরা) হজ্বের কাজ সম্পূর্ণ করার পর মুক্ত হও তখন তোমরা শিকার কর এবং যারা তোমাদেরকে মসজিদে

হারাম থেকে বিরত রেখেছে, তাদের শত্রুতা যেন তোমাদের সীমা অতিক্রম করার কারণ না হয়, আর তোমরা নেক কাজে ও পরহেযগারীতে একে অন্যের সহায়ক হও এবং গুনাহ ও সীমা অতিক্রমের ব্যাপারে একে অন্যের সাহায্য করোনা এবং আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কঠিন শাস্তিদানকারী।

## সূরা মায়েদা প্রসঙ্গে

এ সূরা মদীনা তৈয়্যেবায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতে ১৬ রুকু এবং ১২০ আয়াত রয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ পবিত্র কোরআনের সূরা সমূহ নাযিল হওয়ার দিক থেকে বিচার করলে সূরা মায়েদা সর্বশেষে নাযিল হয়েছে, এজন্যে এতে যা কিছু হালাল পাও তাকে হালাল মনে কর, আর যা কিছু হারাম পাও তাকে হারাম মনে কর। অর্থাৎ সূরা মায়েদায় বর্ণিত কোন আদেশ বাতিল হয়নি। (আহমদ, নেছায়ী)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ সূরা আল মায়েদাহ এবং সূরা আল-ফাতহ সর্বশেষ নাযিল হয়েছে। (আহমদ, তিরমিজী, হাকেম)

আবু আবদুহু মোহাম্মদ এবনে কা'ব কারাফীর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মক্কা শরীফ এবং মদীনা শরীফের মধ্যে সূরা মায়েদা নাযিল হয়েছে। তখন হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উষ্ট্রীর ওপর আরোহী অবস্থায় ছিলেন। ওহী নাযিল হওয়ার ভারে উষ্ট্রীর কাঁধে যখন ব্যথা অনুভূত হলো তখন তিনি অবতরণ করলেন। এবনে জরীর রবী এবনে আনাস এবং আতিয়্যা এবনে কায়েসের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ নাযিল হওয়ার দিক থেকে সূরা মায়েদাহ পবিত্র কোরআনের শেষে হয়েছে । অতএব, তোমরা তার হালালকে হালাল হিসেবে গ্রহণ কর এবং হারামকে হারাম হিসেবে গ্রহণ কর।[১]

হযরত আসমা বিনতে ইয়াজীদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রীর রজ্জু ধরে রেখেছিলাম। তখন তাঁর প্রতি সূরা মায়েদা নাযিল হয়। নাযিল হওয়ার ভারে উষ্ট্রীর কাঁধ যেন ভেঙে যাবার উপক্রম হয়েছিল।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৫৬
তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৪৭
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৬ খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৪

## তফসীরুল কোরআন

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

অর্থাৎ– হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার সমূহ পূর্ণ কর, এ আয়াতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন বিশেষ ভাবে ঈমানদারগণকে সম্বোধন করেছেন।

এবনে আবি হাতেমে রয়েছে, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট বললঃ আপনি আমাকে কোন বিশেষ নছিহত করুন। তখন তিনি বললেন– যখন তুমি দেখ পবিত্র কোরআনের কোন আয়াত–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

বাক্য দ্বারা শুরু করা হয় অর্থাৎ– যখন কোন আয়াতে ঈমানদারদেরকে সম্বোধন করা হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে খুব মনযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর, কেননা এ সম্বোধনের পর হয়তো কোন কল্যাণকর কাজের নির্দেশ থাকবে অথবা কোন মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ থাকবে।

### অঙ্গীকার রক্ষা করার তাগিদ

এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার সমূহ পূর্ণ কর। এ অঙ্গীকার দু' প্রকার (১) আল্লাহ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার (২) অথবা বন্দার সাথে কৃত অঙ্গীকার।

### আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার

সৃষ্টির প্রথম দিনে-যখন আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষের পদচারণা হবে, তাদের রুহ সমূহকে একত্রিত করেছিলেন এবং সেখানে সমগ্র মানব জাতির নিকট থেকে একটি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমি কি তোমাদের প্রভু নই"? এর জবাবে সমগ্র মানব জাতি বলেছিলো হ্যাঁ, তুমিই আমাদের প্রতিপালক। এটিই ছিল আল্লাহ পাকের সাথে মানুষের প্রথম অঙ্গীকার। মানুষের একথা স্বীকার করে নেয়া যে, আল্লাহ পাকই আমাদের প্রভূ, আমরা তাঁর প্রতি একাগ্রচিত্তে আত্মসমর্পণ করি, তাঁর

প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করি। আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধি-নিষেধ সঠিকভাবে পালনের সুদৃঢ় অঙ্গীকার করি।

মানব জাতিকে পৃথিবীতে প্রেরণের প্রাক্কালে আল্লাহ পাক তাই এরশাদ করেছিলেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞

"অতঃপর আমার তরফ থেকে যদি তোমাদের নিকট কোন হেদায়েত পৌঁছে, তবে যারা আমার সেই হেদায়েত মেনে চলবে তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না। আর যারা হবে অবাধ্য, তারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে, এরাই হবে দোযখবাসী, তাতে তারা চিরদিন থাকবে"।

বস্তুতঃ সে হেদায়েতই হলো পবিত্র কোরআন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ। আল্লাহ পাকের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারের বিবরণই রয়েছে পবিত্র কোরআনে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শে।

অতএব, আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করার মাধ্যমেই মানব জাতিকে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করতে হবে। এতদ্ব্যতীত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় জেহাদ বা অন্য কোন বিষয়ে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন, তা এ আয়াতের মর্মের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সুতরাং যাবতীয় পাপাচার থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার নিখুঁত ভাবে রক্ষা করতে প্রয়াসী হতে হবে।

পক্ষান্তরে, পাপাচারে লিপ্ত হওয়া তথা আল্লাহর নাফরমান হওয়া, আল্লাহ পাকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাঁর সাথে কৃত অঙ্গীকার বিনষ্ট করার শামিল।

## সৃষ্টির সাথে অঙ্গীকার

দৈনন্দিন জীবনে মানুষের প্রয়োজনের আয়োজনে পরস্পরের মধ্যে যে অঙ্গীকার করা হয়, তা রক্ষা করার তাগিদও রয়েছে এ আয়াতে। এমনকি, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অঙ্গীকার ভঙ্গ করাকে মুনাফেকীর অন্যতম নিদর্শন বলে এ পর্যায়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

বায়হাকী মোকাতেল এবনে হাব্বানের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতে যে অঙ্গীকার সম্পর্কে তাগিদ করা হয়েছে তা হল পবিত্র কোরআনে বর্ণিত বিধি-বিষেধ এবং সেই অঙ্গীকার সমূহ যা মুসলিম জাতি ও কাফেরদের মধ্যে হয়। আর সে অঙ্গীকার সমূহ যা মানুষের পরস্পরের মধ্যে হয়।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণ করা হয় যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যখন উভয় পক্ষ দেয়া-নেয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে, এরপর ঐ ব্যবসা সংক্রান্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হলে তাও এ আয়াতে অঙ্গীকার ভঙ্গের যে তাগিদ রয়েছে তার অন্তর্ভুক্ত হবে।[১]

মূলতঃ "আক্‌দ" বলা হয় সুদৃঢ় অঙ্গীকারকে। এতে আল্লাহ্ পাকের সাথে কৃত যাবতীয় অঙ্গীকার এবং আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত যাবতীয় বিধান পালন করা, এমনিভাবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর যে সব গুণাবলী প্রকাশ করার জন্যে আহলে কিতাবদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে তা এবং মানুষের পরস্পরের যাবতীয় অঙ্গীকার সমূহ এ আয়াতে প্রদত্ত তাগিদের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

اَىْ اَتِمُّوا الْعُقُوْدَ الَّتِىْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَبَيْنَ النَّاسِ

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মধ্যে এবং আল্লাহ্ পাকের মধ্যে যত অঙ্গীকার হয়েছে তা পালন কর এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যে অঙ্গীকার হয়েছে তাও পালন কর।[২]

এখানে এ-ও উল্লেখ্য, মানুষের সাথে মানুষের যে অঙ্গীকার হয় তা ব্যক্তিগত, সামাজিক অথবা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের হোক–সকল অঙ্গীকারই এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এবনে জরীর এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এতে সর্বপ্রকার অঙ্গীকার রক্ষা করার তাগিদ রয়েছে। সে অঙ্গীকার শপথ গ্রহণের মাধ্যমে হোক অথবা শপথ ব্যতীত হোক তথা সর্বপ্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করাই ফরজ বা একান্ত কর্তব্য।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ হলো কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা, আল্লাহ্ পাক যে বস্তুকে হালাল করেছেন তা হালাল জানা এবং যে বস্তুকে হারাম করেছেন তাকে হারাম জানা এবং তাঁর তরফ থেকে যে সব কাজ ফরজ করা হয়েছে তা আদায় করা, আল্লাহ্ পাকের নির্দিষ্ট সীমা সমূহের হেফাজত করা, আল্লাহ্ পাকের কোন কথার বরখেলাফ না করা, কোন প্রকার সীমা লঙ্ঘন না করা এবং কোন হারাম কাজে লিপ্ত না হওয়া। এসবের ব্যাপারেই এ আয়াতে তাগিদ রয়েছে। এতদ্ব্যতীত পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতেও এ সম্পর্কে তাগিদ রয়েছে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৪৬-৪৭
২। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস (রাঃ) খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৮৭

হযরত যাহ্যাক (রঃ) বর্ণনা করেন, এ আয়াতের অর্থ হলো আল্লাহ পাক যে বিষয়কে হালাল করেছেন বা হারাম করেছেন তাকে হালাল এবং হারাম জানা এবং আল্লাহ পাকের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার সমূহ যা ঈমান আনার পর পূর্ণ করা প্রত্যেক মোমেনের উপর ফরজ হয়ে যায়, সে ফরজ সমূহ যথাযথভাবে পালন করা।

হযরত যায়েদ এবনে আসলাম (রঃ) বর্ণনা করেনঃ আলোচ্য আয়াতে যে অঙ্গীকারের কথা রয়েছে তা হলো ছয়টি ঃ (১) আল্লাহ পাকের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার (২) মানুষের পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধনের ব্যাপারে যে অঙ্গীকার করা হয় (৩) পরস্পরের অংশীদারিত্বের অঙ্গীকার (৪) ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যে অঙ্গীকার করা হয় (৫) বিয়ে-শাদীর যে অঙ্গীকার হয় এবং (৬) শপথের মাধ্যমে যে অঙ্গীকার করা হয়।

মোহাম্মদ এবনে কা'ব বর্ণনা করেন, যে অঙ্গীকার সমূহ রক্ষা করার তাগিদ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে তা হলো পাঁচটি। তন্মধ্যে প্রাক-ইসলামী যুগের শপথ সমূহ এবং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের অঙ্গীকার তার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যারা একথা বলে যে, কোন বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত হওয়ার পর ক্রেতা বিক্রেতা একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করার অধিকার নেই তারা এ আয়াতকে দলিল হিসেবে পেশ করেন।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এবং ইমাম মালেক (রঃ) এ মতই পোষণ করতেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রঃ) এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁরা হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করেন। এই হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়সাল্লাম এরশাদ করেনঃ ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পর পৃথক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিক্রীত বস্তু ফেরত নেয়ার এবং দেয়ার অধিকার রাখে।

বোখারী শরীফে একখানি হাদীস সংকলিত আছে যার মর্ম হলো, দু' ব্যক্তি কোন বস্তু ক্রয় বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এরপর তারা একে অন্যের কাছ থেকে পৃথক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে ব্যবসায় বাতিল করার অধিকার থাকে।

যাহোক, এ আয়াতে একথার তাগিদ করা হয়েছে যে, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যে অঙ্গীকার করা হয় তা তোমরা রক্ষা কর। এমনিভাবে নৈতিক এবং রাজনৈতিক তথা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের এক কথায় সর্বপ্রকার অঙ্গীকার এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।[১]

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩৫

পূর্ববর্তী আয়াতে সংক্ষিপ্ত ভাবে অঙ্গীকার রক্ষার বিশেষ তাগিদ রয়েছে। এ আয়াত থেকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শুরু হয়েছে। সর্বপ্রথম হালাল এবং হারাম সম্পর্কে যে বিধান রয়েছে তা পালনের বিশেষ তাগিদ রয়েছে।

সূরা নেছার একখানি আয়াতে (فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا) এবং সূরা আনআমে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ইহুদীদের পাপাচারের কারণে কোন কোন হালাল বস্তু তাদের জন্যে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু এ আয়াতে উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে অঙ্গীকার রক্ষা করার এবং ইহুদীদের জন্যে নিষিদ্ধ ঘোষিত বস্তু সমূহ হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন উট, গরু, মেষ, ছাগল এবং যাবতীয় গৃহপালিত পশু এমনকি হরিণের মত বন্য পশুও মুসলমানদের জন্যে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। তবে যেসব জন্তুর দ্বারা মানুষের দৈহিক ও আত্মিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে সেগুলো পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে অথবা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়সাল্লামের আদর্শের আলোকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে–

غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ

অর্থাৎ– এহরাম অবস্থায় শিকার করা বৈধ নয়। হজ্জ বা ওমরার নিয়তে যখন এহরাম বাধা হয়, এমন অবস্থায় শিকার করা জায়েয নয়। এহরামের অবস্থায় যখন শিকার করা জায়েয নয় ঘোষণা করা হয়েছে, এমন অবস্থায় হরম শরীফে অথবা হরম শরীফের সীমানায় শিকার করা যে অবৈধ তা সহজেই অনুমেয়।

অতএব, পূর্ববর্তী বাক্যে যে সব জন্তু সম্পর্কে হালাল বলে ঘোষণা করা হয়েছে, এহরাম অবস্থায় সেগুলো শিকার করা হারাম করা হয়েছে।

এখানে এ-ও উল্লেখ্য, আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ আবু জেবিয়ান হযরত আবু আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, "বাহিমাতুল আনআম" এর অর্থ হলো জীব-জন্তুর পেট থেকে বের হওয়া বাচ্চা। যেমন গরুর বাছুর বা ছাগল ছানা, অর্থাৎ কোন মাদী জন্তুকে যদি জবেহ করা হয়, তার পেট থেকে কোন মৃত বাচ্চা বের হয়, যার দেহ পরিপূর্ণভাবে তৈরী হয়েছে তবে এমন বাচ্চা জবেহ করা ব্যতীত তার গোশ্‌ত হালাল।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ), ইমাম আহমদ (রঃ), ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এবং ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) এ মতই পোষণ করতেন। ইমাম মালেক (রঃ) অবশ্য এ শর্তারোপ করেছেন যে, কোন জন্তুর পেট থেকে বের হওয়া বাচ্চা তখন হালাল হবে যখন তার দেহ থেকে লোম বের হবে।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যদি জন্তুর পেট থেকে বাচ্চা বের হয়, আর তাকে জবেহ্ করার প্রয়োজন এজন্যে নেই যে, তার মাকে জবেহ্ করাই তাকে জবেহ্ করা। অবশ্য শর্ত হলো– তার দেহ সম্পূর্ণ তৈরী হবে এবং দেহে লোম উঠবে। হযরত সাঈদ এবনে মুসায়্যেব (রঃ) এ মতই পোষণ করতেন।

কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তিনি বলেছেনঃ কোন জন্তুর পেট থেকে বের হওয়া বাচ্চাকে স্বতন্ত্র ভাবে জবেহ্ না করলে তার গোশ্ত খাওয়া জায়েয নয়। তার দেহে লোক উঠুক বা না উঠুক। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) তাঁর মতের পক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি আরজ করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা উষ্ট্রী, গাভী এবং বকরী জবেহ্ করি এবং তার পেট থেকে বাচ্চা বের হয়, আমরা কি বাচ্চা ফেলে দেব না, তার গোশ্ত খাব? তিনি এরশাদ করলেনঃ তোমাদের ইচ্ছা, খেতেও পার, তার মাকে জবেহ্ করাই তাকে জবেহ্ করা।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) তাঁর মতের স্বপক্ষে এ যুক্তি পেশ করেছেন যে, পেটের বাচ্চা বাস্তবিক পক্ষে তার মায়েরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এমনকি কেচি দ্বারা কর্তন না করলে মায়ের দেহ থেকে তা বিচ্ছিন্ন হয় না। মায়ের খাদ্য থেকেই সে খাদ্য লাভ করে এবং মায়ের নিঃশ্বাসই তার নিঃশ্বাস। অতএব, মাকে জবাই করাই তাকে জবেহ্ করা।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেনঃ পেটের বাচ্চা স্বতন্ত্র জীবনের অধিকারী। মায়ের মৃত্যুর পরও তার বাচ্চার জীবনের সম্ভাবনা থাকে, বাচ্চার দেহে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাতে থাকে প্রাণ, আর একথা সর্বজনবিদিত যে, জবেহ্ করার উদ্দেশ্যই হলো রক্ত থেকে গোশ্তকে পৃথক করা আর এ উদ্দেশ্য শুধু মাকে জবাই করলেই অর্জিত হয় না। কেননা, মাকে জবেহ্ করার কারণে বাচ্চার দেহ থেকে রক্ত বের হয় না। এ বিষয়টিকে কোন শিকারকে জখমী করার সাথে তুলনা করা ঠিক হবে না। কেননা, জখমী করার কারণে কিছু রক্ত বের হয়ে যায়, কিন্তু মাকে জবেহ্ করলে বাচ্চার দেহ থেকে রক্ত বের হয় না। যখন বাচ্চার গোশ্ত রক্ত থেকে আলাদা হলোনা তখন তাকে মৃত জীব বলেই ধরে নেয়া হবে। আর মৃত জন্তুর গোশ্ত যে হারাম তা পবিত্র কোরআনেই রয়েছে।[১]

إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৪৮-৪৯

পূর্ববর্তী বাক্যে বলা হয়েছে তোমাদের জন্যে চতুঃষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে। আর এ বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ যে সব চতুঃষ্পদ জন্তু সম্পর্কে পরে বর্ণনা আসছে সেগুলো ছাড়া অর্থাৎ যেসব জন্তু হারাম সেগুলোর বিবরণ পরে আসবে, তাছাড়া অন্য চতুঃষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্যে হালাল ঘোষণা করা হলো। আর যেসব জন্তু হালাল বলে ঘোষিত হয়নি; সেগুলো হলো মৃত জন্তু, আর যে জন্তুকে জবেহ করার সময় আল্লাহ পাকের নাম ব্যতীত অন্য নাম উচ্চারিত হয়েছে, যে জন্তুকে দেবতার নামে বলি দেয়া হয়েছে, যে জন্তুকে গলা টিপে মারা হয়, যে জন্তু কোন আঘাতের কারণে মারা যায়, যে জন্তু উপর থেকে নীচে পড়ে মারা যায়, আর যে জন্তুর কিছু অংশ অন্য কোন চতুঃষ্পদ জন্তু খেয়ে ফেলে, এ সমস্ত জন্তু 'বাহিমাতুল আনআমের' অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু হালাল জানোয়ারের তালিকা থেকে এগুলোকে বাদ দেয়া হয়েছে।

غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

তবে এহরাম অবস্থায় শিকার করা হালাল মনে করোনা।

চতুঃষ্পদ জন্তুর মধ্যে যেগুলো মৃত এবং যেগুলো নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে তা ব্যতীত সবই তোমাদের জন্যে হালাল করা হলো কিন্তু তোমরা এহরাম অবস্থায় শিকার করাকে হালাল মনে করোনা।

إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

নিশ্চয় আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা আদেশ দান করেন। কেননা, সবই তাঁর সৃষ্টি, সবই তাঁর কর্তৃত্বাধীন, যিনি দান করেছেন প্রত্যেকটি বস্তুকে তার আকৃতি এবং প্রকৃতি, তিনিই জানেন কোন্ বস্তু হালাল হওয়া উচিত এবং কোন্ বস্তু হারাম হওয়া জরুরী। অতএব, যে কোন বস্তুকে এবং যে কোন জন্তুকে হারাম বা হালাল ঘোষণা করার একমাত্র অধিকার তাঁরই। তাই পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

তাঁর কাজের জন্যে কারো কাছে জবাবদেহী করার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু সৃষ্টি মাত্রকে তার কর্মকান্ডের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে অবশ্যই জবাবদেহী করতে হবে।

যেহেতু আল্লাহ পাকের যাবতীয় কর্ম হয় হেকমতপূর্ণ, তিনি প্রত্যেকটি জন্তুর মধ্যে বিশেষ গুণ এবং বৈশিষ্ট্য রেখেছেন, সেদিক থেকে বিচার করে আল্লাহ পাক যে জন্তুকে তাঁর বন্দাদের জন্যে উপকারী মনে করেছেন তাকে তিনি তাঁর রহমতে হালাল ঘোষণা করেছেন। আর যে জন্তুকে বন্দাদের জন্যে ক্ষতিকর মনে করেছেন, সেগুলোকে হারাম ঘোষণা করেছেন।

অতএব, আল্লাহ পাক তাঁর এলম এবং হেকমতের আলোকে বন্দাদের প্রতি রহমতের নিদর্শন স্বরূপ যে আদেশ দান করেছেন তা মেনে চলাই মানুষের প্রধানত কর্তব্য।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ

## শানে নুযুল

এবনে জরীর একরামা এবং সুদ্দীর সূত্রে লিখেছেনঃ হাতাম এবনে হিন্দ বকরী নামক এক ব্যক্তি কিছু উট এবং মালপত্র নিয়ে মদীনা শরীফে উপস্থিত হল, তার মালপত্র বিক্রি করার পর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলো, বয়আত করল এবং মুসলমান হলো। যখন সে প্রত্যাবর্তন করার জন্যে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে বের হতে লাগল তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং যারা তখন তাঁর দরবারে উপস্থিত ছিলেন তাদেরকে বললেন, এ ব্যক্তি আমার নিকট কাফের চেহারা নিয়ে এসেছিল এবং ধোকাবাজ হিসেবে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে প্রত্যাবর্তন করছে। অবশেষে তাই হয়েছিলো। হাকাম ইয়ামামা পৌঁছে মুরতাদ হয়েছিলো। এভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছিলো।

এরপর জিলক্বদ মাসে উষ্ট্রের ওপর মালপত্রের বোঝা রেখে সে মক্কা শরীফ গমনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কিছু লোক সংবাদ পেয়ে তার উপর হামলা করার ইচ্ছা করলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হলো।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ এ আয়াত নাযিল হয়েছে হাতাম সম্পর্কে যার পূর্ণ নাম ছিল শোরায়েহ এবনে সাবিয়াহ বকরী। এ ব্যক্তি মদীনা শরীফে আসে এবং সঙ্গীদেরকে পেছনে রেখে একাকী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয় এবং আরজ করে, আপনি মানুষকে কোন্ বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানান? তিনি এরশাদ করলেনঃ আমি আহ্বান জানাই একথা বিশ্বাস করতে যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল, আর সঠিকভাবে নামায কায়েম করার এবং যাকাত আদায় করার। তখন লোকটি বলল, আমার সঙ্গে আরো কয়েক জন সর্দার রয়েছেন, যাদের মত ব্যতীত আমি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারিনা, আমি আশা করি যে আমি মুসলমান হয়ে যাব এবং তাদেরকেও আমি নিয়ে আসবো। শোরায়েহ নামক এ ব্যক্তি হাযির হওয়ার পূর্বেই হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বলেছিলেন, তোমাদের নিকট রবীয়া গোত্রের এক ব্যক্তি আসবে, যে শয়তানের ভাষায় কথা বলবে।

যাহোক, শোরায়েহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে বেরিয়ে গেল। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ সে কাফেরের চেহারা নিয়ে এসেছিলো এখন অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর পৃষ্ঠ নিয়ে চলে গেল। শোরায়েহ মদীনা শরীফ থেকে বের হয়ে জঙ্গলে মদীনাবাসীর যে উষ্ট্র ছিল সেগুলো নিয়ে পলায়ন করল, লোকেরা চেষ্টা করেও তাকে ধরতে পারেনি। পরবর্তী বছর সে বনী বকর গোত্রের হাজীদের সঙ্গী হয়ে হজ্ব করার জন্যে ইয়ামামা থেকে রওয়ানা হলো, সে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে অনেক মাল পত্রও সঙ্গে নিয়েছিলো। সে উষ্ট্রের ঘাড়ে 'কলাদাহ' (কণ্ঠাবরণ) পরিয়ে রেখেছিল। মুসলমানগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলেনঃ হুজুর হাতাম নামক এ ব্যক্তি হজ্বের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে (যে গত বছর মদীনাবাসীর উট চুরি করে নিয়েছিলো)। আপনি যদি অনুমতি দান করেন তবে আমরা তার প্রতি আক্রমণ করি। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ সে তো কোরবানীর জন্তুদেরকে কণ্ঠাবরণ পরিয়ে রেখেছে। তখন মুসলমানগণ আরজ করলেন ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমরা প্রাক-ইসলামী যুগে এমন কাজ করতাম। কিন্তু হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অনুমতি দানে অস্বীকৃতি জানান। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

ওয়াহেদী বর্ণনা করেছেন, হাতাম নামক এ ব্যক্তি ইয়ামামা থেকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে মদীনা শরীফে হাযির হয়। তিনি তাকে ইসলাম কবুল করার জন্যে আহ্বান জানান কিন্তু সে এ আহ্বানে সাড়া দেয়নি। সে মদীনা শরীফ থেকে বের হয়ে মদীনাবাসীর উট নিয়ে পলায়ন করে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন ওমরার কাযা আদায়ের জন্যে মদীনা শরীফ থেকে রওনা হন, তখন পথিমধ্যে ইয়ামামার হাজীদের লাব্বায়েক পাঠের শব্দ শ্রবণ করেন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! ইয়ামামার এ কাফেলার মধ্যে হাতাম নামক সে ব্যক্তিও রয়েছে যে গত বছর আমাদের উট চুরি করেছিলো। হাতাম যে উটগুলো লুণ্ঠন করেছিলো সেগুলোকে কণ্ঠাবরণ (কোরবানীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত জন্তুর গলায় ব্যবহৃত বিশেষ নিদর্শন) পরিয়ে রেখেছিলো। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৫০-৫১

## পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে এহরাম অবস্থায় শিকার করা অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে, কেননা তা হলো এহরাম এবং হরম শরীফের সম্মান বিরোধী কাজ। আর এ আয়াতে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব, মহিমা বিঘোষক, পরিচায়ক নিদর্শন সমূহের সম্মান করার তাগিদ করা হয়েছে।

## আয়াতের মর্মকথা

হে মোমেনগণ! তোমরা যখন ঈমান এনেছ তখন ঈমানের দাবী পূরণ কর, আর তা হলো যা কিছু আল্লাহ পাকের পরিচায়ক রয়েছে, সেগুলোর আদব রক্ষা কর। আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহের অবমাননা করোনা অর্থাৎ যে সব বস্তুকে আল্লাহ পাক তাঁর দ্বীনের নিদর্শন হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন, সেগুলোর মর্যাদা হানি করোনা। যেমন কা'বা শরীফ, ছাফা মারওয়া, মিনা মুজদালেফা, কোরবানীর জন্তু প্রভৃতি। এর কোনটিরই অবমাননা করোনা।

আলোচ্য আয়াতে شَعَآئِرَ اللّٰهِ বলতে কোরবানীর সে জন্তুকে বোঝানো হয়েছে যা হজ্বযাত্রী কাবা শরীফের দিকে প্রেরণ করে।

যেহেতু মুসলমানদের থেকে লুণ্ঠিত উষ্ট্র নিয়ে হাতামা নামক ঐ ব্যক্তি ইয়ামামা থেকে রওয়ানা হয়েছিল, তাই মুসলমানগণ তার প্রতি হামলা করার ইচ্ছা করেছিলেন কিন্তু আল্লাহ পাক এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।

এমনিভাবে সম্মানিত মাস সমূহে যুদ্ধ করা হালাল মনে করোনা। মহররম, রযব, জ্বিলকদ, জিলহজ্ব–এ চারটি মাসকে 'শাহরুল হারাম' বা সম্মানিত মাস বলা হয়। এ সময় নেক আমলের চেষ্টা-সাধনা অধিকতর সওয়াবের কারণ হয়। বিশেষ করে পাপাচার পরিহার করার মাধ্যমে এ মাস সমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হয়।

হজ্বযাত্রীদের প্রতি কোন রকম অত্যাচার না করা, হজ্ব পর্ব সম্পাদনে কোন বাঁধা সৃষ্টি না করা একান্ত কর্তব্য। যদিও একথাও সত্য যে, অন্যায়-অনাচার সর্বাবস্থায়ই বর্জন করতে হবে। কিন্তু স্থান এবং কালের পার্থক্যে এ বর্জনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। যেমন সম্মানিত এ চার মাসে পাপাচার পরিহারের গুরুত্ব সমধিক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ সময় কোন প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ বৈধ মনে করা হতো না। অবশ্য যদি শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণ করতে হয়, তবে তার অনুমতি রয়েছে।[১]

১। সূরা তওবায় ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে আলোচনা হবে।

وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا

এমনিভাবে কোরবানীর উদ্দেশ্যে যে জন্তু কা'বা শরীফের দিকে প্রেরিত হয়, তার অপমান করোনা, অর্থাৎ তা লুণ্ঠন করে নিয়ে যেও না, তাকে আত্মসাত করোনা। 'কালায়েদ' শব্দটি 'কালাদা' শব্দের বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ হলো কণ্ঠহার বা কণ্ঠাবরণ। তদানীন্তন কালে এ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, হজ্ব যাত্রীরা হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ রওয়ানা হবার সময় কোরবানীর জন্তু সঙ্গে নিয়ে নিত এবং গলায় এক প্রকার পট্টি পরিয়ে দিত এবং তা নিদর্শন হতো কোরবানীর জন্তুর। ঐ নিদর্শন দেখলে আর কেউ সে জন্তুর উপর হামলা করতো না।

অতএব, সকলেই ঐ জন্তুটির সম্মান করত। এমনিভাবে যেসব লোক হজ্ব বা ওমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, যারা এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য হজ্ব বা ওমরাহর কর্মসূচী গ্রহণ করত তাদের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন কর, তাদেরকে কোন অবস্থাতেই অপমানিত করোনা।

উল্লেখ্য, কাবা শরীফের বিশেষ মর্যাদা এবং আদবের কারণে কোরবানীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত জানোয়ারের পর্যন্ত সম্মান করার আদেশ রয়েছে। এমনি অবস্থায় যে মানুষ শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কা'বা শরীফে রওয়ানা হবে, তার অবমাননা কি করে সম্ভব হবে?

এখানে এ-ও উল্লেখ্য, বর্তমান আয়াতটির আভিধাণিক অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক, এতে মুসলমান ও অমুসলমান সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পরবর্তীতে কাফেরদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা নাযিল হয়েছে–

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

অর্থাৎ– মুশরেকরা নাপাক, অতঃপর তাদের যে এ সম্মান নেই, তা বলার আর অপেক্ষা রাখে না।

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

এবং যখন (তোমরা হজ্বের কাজ সম্পূর্ণ করার পর) মুক্ত হও, তখন তোমরা শিকার কর।

পূর্ববর্তী আয়াতে এহরামের অবস্থায় শিকার করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, এহরাম খোলার পর তোমাদের জন্যে শিকার করা বৈধ ঘোষণা করা হলো।

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ

এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে মোমেনগণ! কোন সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সীমা লঙ্ঘনে উদ্বুদ্ধ না করে, যারা তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দিয়েছিলো, তাদের প্রতিশোধের ব্যাপারে তোমরা কোন অবস্থাতেই সীমা লঙ্ঘন করোনা।

মূলতঃ আল্লাহর দ্বীনের নিদর্শন সমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সকলেরই একান্ত কর্তব্য। কাফের মুশরেকরা একথা জানা সত্ত্বেও এ বিধান অমান্য করে। ষষ্ঠ হিজরীতে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ১৪০০ সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে ওমরাহর উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ রওয়ানা হন, তখন মক্কার পৌত্তলিকরা তাঁকে হোদায়বিয়া নামাক স্থানে বাধা দেয়। মক্কা শরীফ প্রবেশে এবং ওমরাহ পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, এহরামের সম্মান, পবিত্র কা'বা শরীফের সম্মান, সম্মানিত মাসের সম্মান, কোরবানীর উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা জন্তুসমূহ কোন কিছুরই মর্যাদা তারা রক্ষা করেনি। আল্লাহর নিদর্শন সমূহের এ অপমানের কারণে মুসলমানদের অন্তরে কাফেরদের প্রতি বিদ্বেষ ও প্রতিশোধ গ্রহণের উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু যে কথাটি এখানে বিশেষভাবে লক্ষনীয় তাহলো ইসলাম ধর্মে সব কিছুই আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন, প্রেম-প্রীতিই হোক অথবা বিদ্বেষ ও শত্রুতা বা ভক্তি কোন কিছুই সীমার বাইরে যেতে দেয়া হয় না। সব কিছুর জন্যেই ইসলাম একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এ সীমা লঙ্ঘন করার অধিকার কারোই নেই। এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন যে, কাফেরদের প্রতি নিজেদের শত্রুতা এবং প্রতিশোধ প্রবৃত্তিকে সংযত রাখ। কোন অবস্থাতেই বাড়াবাড়ি করোনা।

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

কিন্তু তবুও যদি কেউ বাড়াবাড়ি করে বসে তথা সীমা লঙ্ঘন করতে চায় তবে তার সঙ্গে সহযোগিতা না করা হবে মুসলমানদের কর্তব্য। কেননা, আল্লাহ পাক এ আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ তোমরা কল্যাণকর কাজে এবং পরহেযগারীতে সহায়তা কর, আর অন্যায় ও পাপাচারের ব্যাপারে সহযোগিতা করোনা।

এবনে আবি হাতেম যায়েদ এবনে আসলামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যখন কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামকে মক্কা শরীফে প্রবেশে বাধা দেয় তখন তিনি হোদায়বিয়া নামক স্থানে অবস্থান করেন। মুসলমানদের প্রতি কাফেরদের এ অন্যায় আচরণ ছিল একান্ত অসহনীয়। ঘটনাক্রমে ঐ সময় কিছু কাফের ওমরাহ করার উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করছিলো। মুসলমানগণ বললেন, মক্কার কাফেররা যেভাবে আমাদেরকে মক্কা শরীফে প্রবেশে বাধা দিয়েছে, ঠিক তেমনি আমরাও এদেরকে বাধা দেব যেন এরাও ওমরাহ করতে মক্কায় প্রবেশ

করতে না পারে। তখন এ আয়াত নাযিল হয় এ মর্মে যে, কাফেররা অন্যায় করেছে বলে তোমরাও অন্যায় করবেনা; কাফেররা ওমরার ন্যায় নেক কাজে বাঁধা দিয়েছে সত্য কিন্তু তোমরা সৎ কাজে সহযোগিতা করবে, বাধা দেবেনা। তোমরা মন্দ কাজে বাধা দেবে। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন, মানবতার উৎকর্ষ সাধন হলো মুসলিম জাতির বৈশিষ্ট্য। তাই অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

"তোমরা হলে উত্তম জাতি, বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধনের জন্যেই তোমাদের আবির্ভাব। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দেবে, মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করবে"। অতএব, সৎ কাজে বাধা দেয়া তোমাদের শানের খেলাফ।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, কেননা আল্লাহর ভয়ই ন্যায়পরায়ণতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও সকল নেক আমলের মূল উৎস এবং মন্দ আচরণ থেকে আত্মরক্ষা করার মূল উপকরণ। আল্লাহর ভয় থাকলেই মানুষ পাপাচার পরিহার করতে পারে, নেক আমল ও সদ্‌গুণাবলী অর্জন করতে পারে। পক্ষান্তরে, আল্লাহর ভয় না থাকলে মানুষের জীবন সাধনা ব্যর্থ হয়। তাই আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ
اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا
أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

## তরজমা

(৩) তোমাদের উপর মৃত জন্তু এবং রক্ত হারাম করা হয়েছে। আর শুকরের গোশ্ত ও সেই জন্তু যা আল্লাহ পাক ভিন্ন অন্য কারো নামে জবেহ করা হয়েছে এবং যা দমবন্ধ করে মারা হয়, আর যা আঘাতে মারা যায় এবং যা উচ্চস্থান থেকে নিম্নে পড়ার দরুন মারা যায়, আর যা অন্য জন্তুর সাথে সংঘর্ষে মৃত্যুর কবলে পতিত হয়, আর যা হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করতে আরম্ভ করে। (এসব হারাম) তবে যা তোমরা (শরীয়ত মোতাবেক) জবেহ কর তা ব্যতীত, আর যা মূর্তি পূজার স্থানে বলি দেয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা হয়, এসব পাপকার্য। আজকের দিনে কাফেররা তোমাদের ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে নিরাশ হয়েছে, অতএব তাদেরকে ভয় করোনা। শুধু আমাকে ভয় কর। আজ তোমাদের জীবন ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান রূপে পছন্দ করলাম। অতঃপর যে ব্যক্তি ক্ষুধায় অস্থির হয়ে পড়ে অথচ গুনাহর প্রতি আকৃষ্ট না হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

সূরার শুরুতে এরশাদ হয়েছেঃ

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ

(তোমাদের জন্যে চতুঃষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে) এরপর এরশাদ হয়েছেঃ

إِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ– সেসব জন্তু ব্যতীত যেগুলোর আলোচনা পরে আসছে। আলোচ্য আয়াতে যেসব বস্তুকে হারাম করা হয়েছে সেগুলোর উল্লেখ রয়েছে। যেসব জন্তুকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলো বিভিন্ন অবস্থায় হারামও হয়ে যায়। সেদিক থেকে সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। যে সব বস্তুকে আলোচ্য আয়াতে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলোর সংখ্যা ১১।[১]

১. মৃত জীব জন্তু অর্থাৎ যে সমস্ত জন্তুকে জবেহ করে খেতে হয় তার যদি স্বাভাবিক মৃত্যু হয় তবে এমন মৃত জন্তু খাওয়া হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা, ঐ জন্তু যখন জবেহ করা হয়নি তখন তার রক্ত তার দেহেই জমাট হয়ে গেছে, তাই এ জন্তু বিষাক্ত এবং অত্যন্ত ক্ষতিকর।

২. আর তোমাদের প্রতি যা কিছু হারাম করা হয়েছে তন্মধ্যে রয়েছে রক্ত তথা প্রবহমান রক্ত যা জবেহ করার সময় প্রবাহিত হয়ে থাকে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ যে রক্ত প্রবাহিত হয় তা হারাম। আরবের পৌত্তলিকরা রক্তকে তেলের সঙ্গে মিশিয়ে গরম করে পান করত। আর তা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যে হতো অত্যন্ত ক্ষতিকর তাই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

৩. শুকরের গোশ্তঃ শুকর ময়লা ভক্ষণ করে, তার নির্লজ্জতা এবং অশ্লীলতা বর্ণনাতীত। পৃথিবীতে যে সব সম্প্রদায় শুকরের গোশ্ত ভক্ষণ করে তাদের নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা সর্বজনবিদিত। এজন্যে শরীয়তে শুকরের গোশ্তকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। যাতে করে মুসলিম জাতি নির্লজ্জতা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৩২
তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন- কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৭৫

৪. আর যে জন্তু আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জবেহ করা হয়, এটি শেরক। এ শেরকের কারণেই এ বস্তুটি নাপাক হয়ে যায় এবং তা খাওয়া হারাম হয়। তফসীরকারগণ বলেছেন, যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে এবং অন্য কিছুর সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে আল্লাহর নামও লওয়া হয়, তবুও তা হালাল হবে না যে পর্যন্ত ঐ শেরেকী নিয়ত থেকে তওবা না করা হয়। কেননা, হাদীস শরীফে আছে–

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

অর্থাৎ– আমলের পরিণতি নির্ণয় করা হয় নিয়ত অনুসারে।[১] আর যে সব জন্তুর উপর আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়, সেগুলোতো হারাম আছেই।

আবু তোফায়েল বর্ণনা করেনঃ হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আপনাকে বিশেষভাবে কোন জিনিস দান করেছেন কি? যেমন কোন ওসিয়ত বা কোন বিশেষ নির্দেশ, তিনি বললেন, যা সাধারণ মানুষকে দেয়া হয়নি বিশেষভাবে এমন কিছু আমাকে দেয়া হয়নি তবে যা কিছু আমার তরবারির খাপে রয়েছে, আল্লাহ্‌র লা'নত সে ব্যক্তির প্রতি, যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্যে জবেহ করে অর্থাৎ জবেহ করার সময় আল্লাহ পাকের সাথে অন্যের নামও শরীক করে অথবা শুধু অন্যের নামই উচ্চারণ করে।

৫. আর ঐ হাদীসে একথাও ছিল, আল্লাহ্‌র লা'নত সে ব্যক্তির প্রতি যে তার পিতার প্রতি লা'নত করে। আর আল্লাহর লা'নত সে ব্যক্তির প্রতি যে দ্বীন ইসলামে নিজের তরফ থেকে নতুন কথা সংযোজনকারীকে (বেদআতীকে) আশ্রয় দেয়। (মুসলিম শরীফ)

وَالْمُنْخَنِقَةُ

যে সব জন্তুকে গলা টিপে মারা হয়, সেগুলোও হারাম। প্রাক-ইসলামী যুগে জীব-জন্তুকে গলা টিপে মেরে খাওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিলো। ইসলামী শরীয়ত এমন জন্তুকে মৃত জন্তুর মত হারাম ঘোষণা করেছে।

وَالْمَوْقُوْذَةُ

৬. আর যে সব জন্তুকে আঘাত করে মারা হয় সেগুলো হারাম। বর্বরতার যুগে জন্তুকে লাঠি বা পাথর দ্বারা আঘাত করে মারা এবং খাওয়া হতো। পবিত্র কোরআন সে সব জন্তুকে হারাম ঘোষণা করেছে।

১। তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন কৃত–আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৭৫

وَالْمُتَرَدِّيَةُ

৭. অর্থাৎ যা উপর থেকে নীচে পড়ার কারণে মারা যায় যেমন পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে পড়ে মারা গেল, অথবা ওপর থেকে ফেলে দেয়ার কারণে মারা গেল বা কূপে নিক্ষিপ্ত হয়ে মারা গেল– এসব জন্তুও হারাম।

وَالنَّطِيحَةُ

৮. যে সব জন্তু পরস্পর লড়াই করে মারা যায়। যেমন– এক জন্তু শিং দ্বারা অন্য জন্তুকে আঘাত করে এবং এর ফলে ঐ জন্তু মারা যায়, তা–ও হারাম ঘোষিত হয়েছে।

وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ

৯. যে জন্তুর কিছু অংশ কোন চতুঃষ্পদ জন্তু খেয়ে ফেলে, তার অবশিষ্টাংশ হারাম।

এতে একথা প্রমাণিত হয়, কোন শিকারী জন্তু যদি শিকারের কিছু অংশ খেয়ে ফেলে, আর তা জবেহ করার পূর্বে মরে যায় তবে তা খাওয়া হারাম হয়ে যায়।

তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ যদি এসব জন্তুকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং শরীয়ত মোতাবেক তাকে জবেহ করা হয় তবে তা হালাল হবে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

অর্থাৎ– "কিন্তু সেই জন্তু হালাল যাকে তোমরা তার মৃত্যুর পূর্বে জবেহ করে নাও"।

এখানে উল্লেখ্য, কোন জন্তুর কিছু অংশ যদি কোন চতুঃষ্পদ জন্তু খেয়ে ফেলে, তা শুধু এমন অবস্থায় হালাল হয় যদি তার মৃত্যু আসার পূর্বে তাকে জবেহ করা সম্ভব হয়, কিন্তু যদি জবেহ করার পূর্বে ঐ জন্তু মৃতপ্রায় হয়ে যায় তবে তার গোশ্ত খাওয়া হারাম হবে। যদিও মৃত্যুর পূর্বেই তাকে জবেহ করা হয়।

হযরত রাফে এবনে খোদায়েজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ আমি আরজ করলাম হে আল্লাহর রসূল! আগামীকাল দুশমনের সঙ্গে আমাদের মোকাবলা হবে। জন্তু জবেহ করার জন্যে আমাদের নিকট ছুরি নেই, এমন অবস্থায়

আমরা কি অন্য কিছু দ্বারা জবেহ করতে পারি? তিনি এরশাদ করলেনঃ যে বস্তুর (ধারে কাটা হয়) রক্ত প্রবাহিত হয় এবং (জবেহ করার সময়) আল্লাহ পাকের নাম লওয়া হয়, তোমরা এমন জন্তু খেতে পার (কিন্তু জবেহ করার অস্ত্র যেন দাঁত এবং নখ না হয়)।

হযরত কা'ব এবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমাদের বকরীগুলো "ছেলা" নামক স্থানে বিচরণ করত, এক দিন বাঁদী লক্ষ্য করল যে একটি বকরী তার অন্তিম অবস্থায় রয়েছে তখন সে একটি পাথর ভেঙে তার ধারে বকরীটিকে জবেহ করে ফেলল, আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি এরশাদ করলেনঃ খেতে পার। (বোখারী)

হযরত আদী এবনে হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি আরজ করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি কোন শিকার পাওয়া যায় তখন সঙ্গে ছুরি না থাকে, এমন অবস্থায় কোন ধার বিশিষ্ট পাথর বা অন্য কিছু দিয়ে জবেহ করা যাবে? তিনি এরশাদ করলেনঃ রক্ত প্রবাহিত কর যে কোন হাতিয়ার দ্বারাই হোক, আর জবেহ করার সময় আল্লাহ পাকের নাম উচ্চারণ কর। (আবু দাউদ, নেসায়ী)

## মাছআলা

জবেহ করার পূর্বে ছুরিকে ধার দিয়ে সতেজ করে নেয়া মোস্তাহাব। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ প্রত্যেক কাজই সুন্দর ভাবে করা কর্তব্য, যদি জবেহ করতে হয় তবে তা-ও মন্দ পন্থায় করোনা। উত্তম ভাবে জবেহ করার পন্থা হলো ছুরিকে পূর্বেই সতেজ করে নেয়া, যেন যে জন্তুকে জবেহ করা হয় তার কষ্ট লাঘব হয়।[১]

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

১০. আর তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে সে জন্তু যা আল্লাহর ঘর ব্যতীত অন্য কোন স্থানকে বরকতময় মনে করে সে স্থানের সম্মানে জবেহ করা হয়েছে।

বর্বরতার যুগে কাফেররা খানায়ে কাবার চারপাশে ৩৬০টি পাথর স্থাপন করেছিলো এবং সেগুলোকে তাদের দেব-দেবীর নামে স্থাপন করা হয়েছিলো, তারা তাদের দেবতার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এ পাথর গুলোর সামনে জন্তু জবেহ করত এবং কিছু রক্ত এ পাথর গুলোতে নিক্ষেপ করত। তাদের ধারণা ছিল যে এভাবে তাদের দেবতা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৬০

ঈমান রাগেব (রঃ) তাঁর বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ 'মুফরাদাতে' লিখেছেনঃ (নুসুব) সে পাথরকে বলা হয় যেগুলোকে আরবের পৌত্তলিকরা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের এবাদতের জন্যে স্থাপন করেছিলো এবং জন্তুগুলোকে সেখানে নিয়ে জবেহ করত।[১]

কাফেরদের এসব নির্দিষ্ট স্থানে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে সব জন্তু জবেহ করা হত, সেগুলোর গোশ্ত হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এমনকি এসব জন্তু

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

বলে জবেহ করলেও হারাম হবে কেননা, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর সন্তুষ্টির নিয়তে জবেহ করা হয়েছে।

এতদ্বারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে এবং অন্যের নৈকট্য লাভের যে ইচ্ছা করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে শেরক। আল্লাহ পাক শেরকের কারণেই এমন জন্তুর গোশ্ত হারাম করে দিয়েছেন।

এখানে এ বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী আয়াতে অর্থাৎ যে সব জন্তু আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয় সেগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদেশ রয়েছে।

পক্ষান্তরে, আলোচ্য আয়াতে যে সব জন্তু আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অথবা অন্যের নামে বা অন্যের সম্মানে জবেহ করা হয় সেগুলোকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।[২]

وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ

১১. প্রাক-ইসলামী যুগে আরবে পৌত্তলিকদের এ নিয়ম ছিল কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার সময় আসলে তারা তাদের মূর্তি বা দেব-দেবীর সেবকদের নিকট হাযির হতো এবং তাদের কাজের ভাল মন্দ জিজ্ঞাসা করত। বিয়ে–শাদী, ব্যবসা-বাণিজ্য, ভ্রমণ প্রভৃতি কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে তারা তাদের মূর্তি সেবকদের নিকট হাযির হলে তারা তাদের থলেতে সংরক্ষিত তীর বের করত এবং সে তীরে লিপিবদ্ধ থাকত- আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ দিয়েছেন, আর কোনটিতে লিপিবদ্ধ থাকত- আমার প্রতিপালক আমাকে নিষেধ করেছেন, আর কোন কোন তীরে কিছুই লেখা থাকত না। যখন কোন কাজে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হতো না তখন তারা

১। মুফরাদাত, পৃষ্ঠা-৫১৩
২। তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন কৃত–আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৭৮

মূর্তি পূজক ও মূর্তি সেবকদের নিকট হাযির হতো এবং তাদের কর্মের ভাল-মন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত। তারা তখন থলে থেকে ঐ তীর বের করত এবং তীরে যা লিপিবদ্ধ থাকত, সে মোতাবেকই তারা আমল করত। যেহেতু এ কাজটি একান্তই শেরক, তাই আল্লাহ পাক তাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। শুধু তাই নয়; বরং মৃত এবং শুকরের মত হারাম ঘোষণা করেছেন। নিতান্ত মূর্খতা এবং কুসংস্কার ব্যতীত এটি আর কিছুই নয়।

শরীয়তে ইসলাম কোন কাজের ভাল-মন্দ বিচার করার জন্যে এস্তেখারার নামাজের বিধান পেশ করেছে। কোন ব্যাপারে ভাল-মন্দ জানতে হলে এস্তেখারার মাধ্যমে তা জানা যেতে পারে। কাফেররা যেভাবে কোন কাজের ভাল-মন্দ বোঝার জন্যে তীরের সাহায্য নিত, তা হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে।[১]

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন যে, পবিত্র কোরআন দ্বারাও এস্তেখারা করা যেতে পারে। তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেছেনঃ যে আল্লাহর কিতাব দ্বারা ফাল দেখতে চায় তার কর্তব্য হলো ৭ বার সূরা এখলাছ পাঠ করা এবং ৩ বার নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করা–

اَللّٰهُمَّ بِكِتَابِكَ تَفَاءَلْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اَللّٰهُمَّ اَرِنِىْ فِىْ كِتَابِكَ مَا هُوَ الْمَكْتُوْمُ فِىْ غَيْبِكَ

অতঃপর পবিত্র কোরআন খুলে দেখবে।[২]

ذٰلِكُمْ فِسْقٌ

অর্থাৎ এসবই পাপকার্য। অতএব, অবশ্যই বর্জনীয়।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্ত গণকের নিকট তার ভাগ্য সম্পর্কে জানতে চাইল অথবা তার সফরের ভাল-মন্দ সম্পর্কে গণকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, সে কেয়ামতের দিন জান্নাতের উঁচু স্তরের দিকে দেখতেও সক্ষম হবে না। অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন পাখীর নামের দ্বারা, আওয়াজের দ্বারা এবং তার যাতায়াতের দ্বারা কোন প্রকার ভাল-মন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অথবা কঙ্কর নিক্ষেপ করে জয় পরাজয়ের কথা জানার চেষ্টা করা-সবই কুফরের অন্তর্ভুক্ত। (আবু দাউদ শরীফ)

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৩৫
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৮৫
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৬১
২। তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২ পৃষ্ঠা-২৭৮

## মোমেনদের জন্যে বিশেষ সুসংবাদ

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ

হালাল এবং হারাম সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে ঘোষণা দেয়ার পর এ আয়াতে মোমেনদের উদ্দেশ্যে বিশেষ সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে, তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ হয়েছে, ইসলামের দুশমনরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েছে, ইতিপূর্বে তারা মনে করত যে, ইসলামের এ আহ্বান, ইসলামের এ সংগ্রাম, ইসলামের এ সাধনা নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, ইসলাম কয়েক দিনের মেহমান মাত্র, যারা ইসলাম কবুল করেছেন তাঁরা হয়তো অচিরেই ইসলাম ছেড়েও দেবেন কিন্তু এখন কাফেররা এ সত্য উপলব্ধি করেছে, ইসলাম চিরন্তন সত্য যত দিন পৃথিবী আছে, ততদিন ইসলাম থাকবে। মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করা সম্ভব নয়। ইসলামের এ প্রদীপকে নিষ্প্রভ করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

বর্তমানে কাফেররা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব, তোমরা তাদেরকে ভয় করোনা, ভয় কর শুধু আমাকে।

## সুসংবাদের নেপথ্য ঘটনা

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রথমে মক্কা শরীফে তের বছর এবং মদীনা শরীফে দশ বছর অতিবাহিত করার পর যখন বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক মুহূর্তে আরফার ময়দানে তশরীফ এনেছেন তখন এ সু-সংবাদ প্রদান করা হয়।

যারা ছিল পৌত্তলিক, যারা আল্লাহ ব্যতীত আর সব কিছুর সম্মুখেই মাথা নত করত, তারা প্রিয়নবী সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেদায়েতের বরকতে এক আল্লাহর খাঁটি বন্দা হয়েছেন। মানুষের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত–প্রতিটি অধ্যায়ের জন্যে সকল নিয়ম-নীতি বিস্তারিত ভাবে তিনি পেশ করেছেন। আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হয়েছে, তাঁর অনুসারী সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা লক্ষাধিক হবার পর, মানব জাতির ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের যাবতীয় বিধি-বিধান সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপন করার পর সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ

অর্থাৎ– আজকের দিনে কাফেররা তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েছে। এতদিন কাফেরদের ভয়ের কারণে তোমরা আল্লাহ্ পাকের বিধান যথাযথ ভাবে পালন করতে পারনি, এখন সে ভয় আর নেই, এখন আর তাদেরকে ভয় করোনা, তোমাদেরকে পরাজিত করার ব্যাপারে কাফেররা সম্পূর্ণ নিরাশ, এমনি অবস্থায় তোমরা শুধু এক আল্লাহকে ভয় কর, শুধু তাঁর প্রতিই আনুগত্য প্রকাশ কর।

আরব দেশে শয়তানের পূজা হতে পারে এমন সম্ভাবনা আর নেই, শয়তানের আশা দূরাশায় পরিণতি হয়েছে, কাফেররা তোমাদের সম্পর্কে নিরাশ হয়েছে, সকল কুসংস্কারের অন্ধকার চিরতরে কেটে গেছে। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

"এখন আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে জীবন বিধান রূপে পছন্দ করলাম"।

বিদায় হজ্বের অবিস্মরণীয় দিনে, আরাফাতের ঐতিহাসিক ময়দানে জুমআর দিন আসরের নামাজের পর এ আয়াত নাযিল হয়, যখন ১ লক্ষ ২৪ হাজার সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ঐতিহাসিক ভাষণ শ্রবণের জন্যে অপেক্ষমান ছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি উষ্ট্রীর উপর দন্ডায়মান ছিলেন, ওহীর ভারে উষ্ট্রীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চুরমার হবার উপক্রম হয়েছিলো।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে রয়েছে, এক ইহুদী হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট আরজ করলঃ হে আমীরুল মোমেনীন! আপনাদের কিতাবে একখানি আয়াত রয়েছে যা আপনারা পাঠ করে থাকেন, যদি এ আয়াত আমাদের নিকট নাযিল হতো, তবে আমরা এ আয়াত নাযিল হবার দিনকে ঈদের দিন হিসেবে পালন করতাম। হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ সে কোন্ আয়াত? তখন ইহুদী আলোচ্য আয়াত পাঠ করল। হযরত ওমর (রাঃ) তখন বললেন, আমি জানি যে কোন্ দিন কোন্ স্থানে প্রিয়নবী সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এ আয়াত নাযিল হয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) এ বাক্য দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ আয়াত নাযিল হবার দিন আমাদের ঈদ হয়েছে। কেননা, তা ছিল জুমআর দিন এবং আরফার ময়দানে অবস্থান করার দিন।

## দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ

আলোচ্য আয়াতে দ্বীনকে পরিপূর্ণ করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর অর্থ হলো আকীদা ও বিশ্বাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা হয়েছে। ফরজ, ওয়াজিব,

সুন্নত, মোস্তাহাব বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। হালাল হারামের বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে, যা আল্লাহর অপছন্দনীয়, মানুষের জন্যে একান্ত ক্ষতিকর সে সব আমলের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত শরীয়তের যাবতীয় বিধান, এবাদত বন্দেগীর নিয়ম-কানুন, নামাজ, রোযা, হজ্ব, যাকাতের বিস্তারিত বিবরণ, সমাজ জীবনের বিভিন্ন দায়িত্ব, এতিম-মিসকীন, অনাথ বিপদগ্রস্তদের প্রতি কর্তব্য, যে কোন মূল্যে সুবিচার কায়েম করার, পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, মুসলমনাদের জাতীয় জীবনের কর্তব্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, দুনিয়ার জিন্দেগীর রূপরেখা, আখেরাতের জিন্দেগীর অবস্থা, জান্নাত ও দোযখের জিন্দেগীর অবস্থা, জান্নাত ও দোযখের বিবরণ বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আরো রয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সব জাতি আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে তাদের ইতিহাস এবং শোচনীয় পরিণামের বিবরণ, মানব জাতির চির মুক্তির পথ তৌহিদ ও রেসালতে বিশ্বাস, আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস ও প্রিয়নবী সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের তাগিদ করা হয়েছে। নারী অধিকার সংরক্ষণের, মানবীয় সমতা রক্ষার, পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালনের বিশেষ তাগিদ করা হয়েছে। পবিত্র কোরআন প্রসঙ্গও আলোচিত হয়েছে। এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রসঙ্গ বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। তিনি রহমাতুল্লিল আলামীন, তিনি খাতেমুন নবীয়্যিন, তিনি সিরাজাম মুনীরা, তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করা, তাঁর প্রতি আদব রক্ষা করা প্রভৃতি বিষয়ের বিবরণের পর তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণের তাগিদ করা হয়েছে।

এছাড়া পবিত্র কোরআনে আম্বিয়ায়ে কেরামের বিবরণ স্থান পেয়েছে। হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত বিশিষ্ট আম্বিয়ায়ে কেরামের বিবরণ চিত্তাকর্ষক ভাষায় বিশ্ব গ্রন্থ পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। এক কথায় মানব জাতির অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে যাবতীয় প্রয়োজনীয় কথা পবিত্র কোরআনে রয়েছে। মানুষের এমন কোন কল্যাণ নেই যার বিবরণ পবিত্র কোরআনে নেই, মানুষের এমন কোন অকল্যাণ নেই যে সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়নি।

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআনে রয়েছে মানব মনের সকল জিজ্ঞাসার জবাব, রয়েছে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান। তাই আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

## পরিপূর্ণ জীবন বিধান

অর্থাৎ তোমাদের জীবন বিধানকে আমি পরিপূর্ণ করে দিলাম। এ মহান গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি। তাঁর পরে আর কোন নবীর আগমন হবে না। এর কোন প্রয়োজনও হবে না। এ পৃথিবীতে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষের প্রদচারণা হবে, সকলের জন্যেই মনোনীত ধর্ম ইসলাম। ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম আল্লাহ পাকের মহান দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামই পূর্ণ পরিণত জীবন বিধান, বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণ এতে রয়েছে নিহিত। বাস্তবের অগ্নি পরীক্ষায় বারে বারে পরীক্ষিত। এ বিধান মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে বিশ্ব মানবের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সাফল্য।

তফসীরকারগণ বলেছেন, দ্বীনকে পরিপূর্ণ করার আরো একটি ব্যাখ্যা হতে পারে এই, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাকের সর্বাধিক নৈকট্য পৌঁছে দেয়া। এমনকি, তাঁকে আল্লাহ পাকের মাহবুব এবং সর্বাধিক প্রিয় হওয়ার সর্বোচ্চ মর্তবায় পৌঁছানো, যে মর্তবায় কোন মানুষ পৌঁছেনি এবং কারো পক্ষে পৌঁছা সম্ভবও নয়। আর এ কারণেই আল্লাহ পাক উম্মতে মোহাম্মদীয়ার গুনাহ মাফ করার খোশ খবরী দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط
اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

(হে রসূল!) আপনি আল্লাহর এই বাণী প্রচার করুন "হে আমার বন্দাগণ! তোমরা যারা পাপাচারের কারণে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়"।

হযরত আব্বাস এবনে মারদাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আরফার দিন বিকাল বেলা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উম্মতের গুনাহ মাফীর জন্যে বিশেষভাবে দোয়া করেন। এ দোয়া কবুল করা হয়। আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ মানুষের পরস্পরের জুলুমের গুনাহ ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ মাফ করা হবে কিন্তু জালেম থেকে মজলুমের বদলা অবশ্যই নেব।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরজ করলেনঃ হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করলে মজলুমকে তার প্রতি যে জুলুম হয়েছে তার বদলে জান্নাত নছীব করতে পার এবং জালেমকেও মাফ করতে পার। আরফার দিন সন্ধ্যায় এ দোয়া কবুল হয়নি। পরদিন সকালে মোজদালেফা নামক স্থানে পুনরায় এ দোয়া

পেশ করেন, তখন ঐ দোয়া কবুল হয়। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার এ হাসি আল্লাহ পাক অব্যাহত রাখুন, তবে সাধারণতঃ এমন সময়তো আপনি হাসেন না, এ হাসির কারণ কি? তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ আল্লাহর দুশমন ইবলিস যখন জানতে পারে যে, আল্লাহ পাক আমার দোয়া কবুল করেছেন, আর আমার উম্মতকে মাফ করে দিয়েছেন, তখন সে তার মাথায় মাটি ফেলতে লাগল এবং ক্রন্দন করতে লাগল, তার এ দুরবস্থা দেখে আমার হাসি এসে গেছে।[১]

وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى

"আর আমি তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করেছি", এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِى

"আমি যেন তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করি"।

এ বাক্যে যে অঙ্গীকার করা হয়েছিলো তা পূর্ণ করা হয়েছে বলে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ পাক নেয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এভাবে যে, সমগ্র মানব জাতির হেদায়তের ব্যবস্থা করেছেন, ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান রূপে দান করেছেন, যে মক্কা শরীফ থেকে রাতের অন্ধকারে অসহায় অবস্থায় হিজরত করতে হয়েছে সে মক্কা বিজয় দান করেছেন। বর্বরতার যুগের সকল চিহ্নকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন এবং দুশমনের উপর মুসলমানদের প্রাধান্য বিস্তার করে দিয়েছেন। মুসলমানগণ নিঃশঙ্ক চিত্তে হজ্ব করেছেন, আর এ হজ্বে কোন মুশরেক শরীক হতে পারেনি।[১]

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"আর ইসলামকে তোমাদের জন্যে জীবন বিধান রূপে পছন্দ করেছি"।

ইসলাম দ্বীনে কামেল, পূর্ণাঙ্গ, কেয়ামত পর্যন্ত এতে বিন্দুমাত্র রদবদলের তথা পরিবর্তন পরিবর্ধনের কোন প্রকার অবকাশ নেই। যেহেতু ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম, তাই ইসলামই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র পথ।

আল্লামা বগভী লিখেছেনঃ হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি শ্রবণ করেছি যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৬২-৬৩
তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৩৮

জিব্রাঈল আমার নিকট আল্লাহ্ পাকের একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ হলো সেই দ্বীন যাকে আমি মনোনীত করেছি আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে, দানশীলতা এবং মধুর ব্যবহার হলো এ দ্বীনকে সঠিক রাখার উপকরণ। অতএব, যদি তোমরা এ দ্বীনের বন্ধু হও তবে দানশীলতা এবং মধুর ব্যবহার দ্বারা এর মর্যাদা রক্ষা কর।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে দ্বীনকে পরিপূর্ণ করার যে ঘোষণা রয়েছে, তা দু'দিক থেকে (১) শক্তির দিক থেকে (২) নিয়ম-কানুনের দিক থেকে। আর আল্লাহর নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করার তাৎপর্য হলো, মুসলমানদের জন্যে দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। দ্বীনকে পরিপূর্ণ করার এবং নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করার পর দ্বীন-ইসলামে কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধনের অবকাশ রয়নি। সর্বশেষ নবীর আগমন হয়েছে এবং নবুওয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, তাই কোন নবীর আর কোন প্রয়োজন রইল না।

এমনিভাবে বাতিল ফেরকা শিয়ারা যে ইমামতের দাবী করে তা যে বাতিল দাবী-এ আয়াত দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয়।[১]

বস্তুতঃ ইসলাম হলো বিশ্বজনীন ধর্ম। সাদা-কালো সবার জন্যে এ ধর্ম, সার্বজনীন তার আহ্বান। বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য এবং বিশ্ব নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুকরণই হলো এর মহান শিক্ষা।

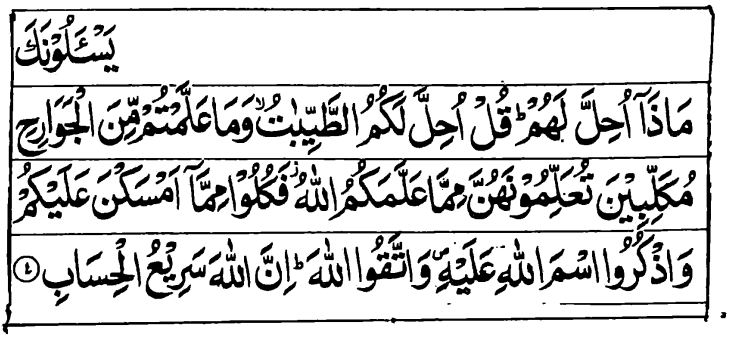
فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ

ইতিপূর্বে হালাল-হারাম বা বৈধ-অবৈধ সংক্রান্ত বিধান বিস্তারিত ভাবে পেশ করা হয়েছে। এতে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু যদি কেউ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বাধ্য হয়ে নিতান্ত প্রাণ রক্ষার প্রয়োজন পরিমাণ নিষিদ্ধ খাবার গ্রহণ করে, ভোগের জন্যে নয়, প্রাণ রক্ষাই হয় তার একমাত্র উদ্দেশ্য, তবে আল্লাহ্ পাক দয়া করে হারাম ভক্ষণজনিত এ অপরাধ মাফ করবেন। কেননা, আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়। আর দয়ার কারণেই আল্লাহ্ পাক এমন গুনাহগারকে মাফ করবেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করল ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা কখনো কখনো এমন স্থানে অবস্থান করি যেখানে খাদ্য বস্তু বলতে কিছুই থাকে না এবং আমরা

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩৭

ক্ষুধার্ত হই, এ পরিস্থিতিতে মৃত জন্তু আমাদের জন্যে কখন হালাল হবে? তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ যখন সকালে তুমি কিছু খেতে না পাও, তার আগের দিনও পানাহার করনি, এমনকি জমীন থেকে কোন প্রকার খাদ্য সংগ্রহ করতে তোমরা সক্ষম হওনি, এমন সময় নিষিদ্ধ খাবার তোমাদের জন্যে হালাল হতে পারে।[১]


يَسْـَٔلُونَكَ
مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ
مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
وَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٤﴾

## তরজমা

(৪) (হে রসূল!) তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তাদের জন্যে কি কি হালাল করা হয়েছে। আপনি বলে দিন, তোমাদের জন্যে সমস্ত উত্তম বস্তুই হালাল করা হয়েছে আর যে সমস্ত শিকারী জন্তুকে তোমরা শিক্ষা দিয়েছ এবং তাদেরকে শিকারের জন্যে ছেড়ে দাও, এদেরকে ঠিক সেভাবেই শিক্ষা দান কর যেভাবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে শিক্ষা দান করেছেন যেন সমস্ত শিকারী জন্তু শিকার করে তোমাদের জন্যে রেখে দেয়। তা তোমরা খাও এবং তৎপ্রতি আল্লাহর নাম স্মরণ কর। আর আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে আর পরিপূর্ণ জীবন বিধান তাই, যাতে হালাল–হারামের বিস্তারিত বিবরণ থাকে। পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হারাম বস্তু সমূহের তালিকা ছিল আর এ আয়াতে হালাল বস্তু সমূহের বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৬৪
তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩৭
তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৪০

## শানে নুযুল

তেবরানী, হাকেম এবং বায়হাকী হযরত আবু রাফে (রাঃ)-এর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন যে, একবার হযরত জিব্রাঈল (আঃ) প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু তিনি কক্ষে প্রবেশ করতে বিলম্ব করেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম চাদর গায়ে দিয়ে বাইরে তশরিফ এনে দেখেন, জিব্রাঈল (আঃ) অপেক্ষমান রয়েছেন, তখন তিনি জিব্রাঈল (আঃ)-কে (লক্ষ্য করে) এরশাদ করলেন, আমিতো আপনাকে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছি। জীব্রাঈল (আঃ) বললেন, নিশ্চয় আপনি অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু আমরা এমন ঘরে প্রবেশ করিনা যেখানে প্রাণীর ছবি অথবা কুকুর থাকে, তখন লোকেরা দেখল ঘরে একটি কুকুরের বাচ্চা রয়েছে, এরপর হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু রাফে (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন, মদীনা শরীফে কোন কুকুর যেন জীবিত না রাখা হয়, সব কুকুর যেন মেরে ফেলা হয়।[১]

এবনে জরীর একরামার সূত্রে লিখেছেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন আবু রাফে (রাঃ)-কে কুকুর হত্যার আদেশ দিলেন, তিনি এ আদেশ পালন করে কুকুর হত্যা করতে করতে মদীনা শরীফের উপকণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন, তখন হযরত আসেম এবনে আদী (রাঃ), সা'দ এবনে হাতেম (রাঃ) এবং উয়াইমের এবনে ছায়েদাহ (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের জন্যে কি-কি বস্তু হালাল করা হয়েছে? তখন এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

এবনে জরীর শা'বীর সূত্রে হযরত আদি এবনে হাতেমের (রাঃ) বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরজ করলঃ কুকর দ্বারা শিকার করলে তা খাওয়া যাবে কি–না। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি জবাব দেবেন ভাবছিলেন, ঠিক এমন সময় আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

এবনে আবি হাতেম সাঈদ এবনে যোবায়েরের সূত্রে লিখেছেনঃ হযরত আদি এবনে হাতেম তাই (রাঃ) এবং হযরত যায়েদ এবনে মুহালহাল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমরা কুকুর এবং বাজপাখী দ্বারা শিকার করি, আর আল্লাহ পাক মৃত জন্তু হারাম করেছেন, এমনি অবস্থায় আমাদের জন্যে কোন্‌টি হালাল? তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[২]

---

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু) পারা-৬ খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৫০

২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৬৫
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৬ খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৫০

## আয়াতের মর্মকথা

قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ

(হে রসূল!) আপনি বলে দিন, পৃথিবীর সকল পবিত্র উত্তম বস্তুই তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে।

যেহেতু শিকারী জন্তুর শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তাই এ জিজ্ঞাসার জবাবে এরশাদ হয়েছেঃ

## শিকারী জন্তুর শিকার কয়েকটি শর্তে হালাল হতে পারে–

১. শিকারী জন্তু অবশ্যই পরীক্ষিত হতে হবে।

২. শিকারের উদ্দেশ্যেই তাকে ছাড়তে হবে।

৩. শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী তাকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

অর্থাৎ কুকুরকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যে, কুকুর যেন শিকার ধরার পর শিকারীর জন্যে রেখে দেয়, নিজে খেয়ে না ফেলে।

এমনিভাবে বাজ পাখীকে এমন প্রশিক্ষণ দিতে হবে যে শিকারের পেছনে ধাওয়া করার পর তাকে ডাকলে সে শিকার ফেলে দিয়ে চলে আসে। যদি কুকুর শিকার ধরে নিজেই খেতে শুরু করে অথবা বাজকে ফিরে আসার জন্যে ডাকলে সে শিকার ছেড়ে না আসে তবে একথা প্রমাণিত হবে যে বাজ পাখী বা কুকুর শিকারীর অনুগত নয় সে শিকার ঠিকই করছে কিন্তু নিজের জন্যে, শিকারীর জন্যে নয়।

তফসীরকারগণ বলেছেন, শিকারী জন্তু যদি এ সম্পর্কে মানুষের স্বভাব গ্রহণ করে, তবে উক্ত শিকারও মানুষের জবাইকৃত জন্তুর মত হয়ে যায় তাই তা হালাল বিবেচিত হয়।

৪. এ পর্যায়ে সর্বশেষ শর্ত হলো শিকারী জন্তুকে শিকারের উদ্দেশ্যে বের করার সময় "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর" পাঠ করতে হবে। আমাদের ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর সঙ্গে আরো একটি শর্ত সংযোজন করেছেন তা হলো– শিকারী জন্তু শিকারকে এমনভাবে ঘায়েল করবে যেন শিকার করা জন্তুর রক্ত প্রবাহিত হয়।

আলোচ্য আয়াতে جَوَارِحْ শব্দটি একথারই যে ইঙ্গিত বহন করে তা সুস্পষ্ট এবং দেদীপ্যমান।

এখানে একথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, উপরোক্ত শর্ত সমূহের মধ্যে যদি একটি শর্তও বাদ পড়ে, তাহলে শিকারী জন্তুর শিকার হালাল হবে না।[১]

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১৩৮

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ

অর্থাৎ যেভাবে তোমাদের জন্যে পৃথিবীর উত্তম বস্তু সমূহ হালাল ঘোষণা করা হয়েছে ঠিক তেমনি তোমাদের জন্যে সে সব জন্তুও হালাল যেগুলো তোমাদের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিকারী জন্তু দ্বারা তোমরা শিকার কর।

## কোন্ জন্তুর দ্বারা শিকার করা বৈধ

এখন প্রশ্ন হলো কোন্ জন্তু দ্বারা শিকার করা বৈধ হবে? সকল শিকারী জন্তু দ্বারাই শিকার করা বৈধ, তবে বাঘ এবং সিংহ সম্পর্কে ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) বলেছেন, যেহেতু এ দু'টি জন্তু শিকারীর জন্যে শিকার করেনা তাই এ জন্তুগুলো দ্বারা শিকার করে খাওয়া বৈধ হবে না। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী চিল পাখীকেও বাঘ এবং সিংহের মত বাদ দিয়েছেন আর শুকর যেহেতু সম্পূর্ণ অপবিত্র তাই তার দ্বারা শিকার করা বৈধ হবে না।

ইমাম আহমদ (রঃ) বলেছেন, কালো কুকুর দ্বারা শিকার করা হালাল নয়।

## প্রশিক্ষণের নিয়ম-কানুন

تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যেভাবে তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবে তোমরা শিকারী জন্তুকে প্রশিক্ষণ দেবে। যখন শিকারের পেছনে তাকে ছাড়বে তখন যদি বিরত থাকার আদেশ দাও তবে সে বিরত থাকবে, ফিরে আসার হুকুম দিলে ফেরত আসবে। শিকারকে ধরে রাখবে, নিজে তা থেকে কিছু খাবেনা এসব বিষয়ে তাকে প্রশিক্ষণ দাও। এ প্রশিক্ষণের পর তিনবার তাকে ব্যবহার কর। যদি এ তিনবারেই সে প্রশিক্ষণ মোতাবেক কাজ করে, তবে তাকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বলে মনে করা হবে।

فَكُلُوا مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জন্তু যদি শিকার করে আনে এবং জন্তুটিকে ধরার পর শিকারী জন্তু তা থেকে কিছু না খায়, তবে সে শিকার তোমরা খেতে পার।

## বিসমিল্লাহ অবশ্যই পাঠ করতে হবে

হযরত আদী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, "বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবর" পাঠ করে তুমি কুকুরকে

ছেড়ে দাও, কুকুর যদি শিকার ধরে নেয় এবং শিকারকে তুমি জীবিত অবস্থায় পাও তবে তাকে জবেহ করে নাও। যদি কুকুর তাকে হত্যা করে ফেলে আর নিজে তা থেকে কিছু না খায় তবে তার গোশ্‌ত খেতে পার। আর যদি কুকুর তার কিছু অংশ খেয়ে ফেলে তবে তা তোমরা খেয়োনা কেননা, সে নিজের জন্যেই তা শিকার করেছে।[১]

وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ

## শিকারী জন্তু ছেড়ে দেয়ার সময় বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর

অতএব, শিকারী জন্তু কুকুর বা বাজপাখী বা যাই হোক তাকে ছেড়ে দেয়ার সময় অবশ্যই দোয়া পাঠ করতে হবে।

এখানে একথা মনে রাখতে হবে যে, শিকারী জন্তু প্রেরণের সময় অথবা তীর নিক্ষেপের সময় দোয়া পাঠ করা হলো কিন্তু জীবিত অবস্থায় সে শিকার ধরা পড়লো, এখন জবেহ করার সময় পুনরায় পড়া ওয়াজিব হবে। পূর্বের পাঠ করা যথেষ্ট হবে না।

যদি তীর নিক্ষেপ করার সময় ইচ্ছা করেই দোয়া পাঠ করা পরিত্যাগ করা হলো অথবা জবেহ করার সময় পাঠ করল না, এমনিভাবে শিকারী কুকুর ছাড়ার সময় দোয়া পড়ল না, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এমন কুকুরও শরীক হলো এমনি অবস্থায় শিকার করা জন্তুর গোশ্‌ত হালাল হবে না। কেননা, অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

অর্থাৎ– যে জন্তুর উপর আল্লাহ পাকের নাম পাঠ করা হয়নি; তা তোমরা ভক্ষণ করোনা।

### মাছআলা

যদি কেউ "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর" পাঠ করা ভুলে যায়, তবে ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মতে তা হালাল নয়। আর ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে তা হালাল। ইমাম মালেক (রঃ)–ও এ মত পোষণ করেন।

যদি শিকারী জন্তু প্রেরণের সময় অথবা তীর নিক্ষেপের সময় দোয়া পাঠ করা কেউ ভুলে যায়, তবে সে শিকার হারাম। যদি কুকুর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত না হয় অথবা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের সঙ্গে কোন অগ্নিপূজকের কুকুর শরীক থাকে তবে সে শিকার হারাম।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৬৮

আল্লাহকে ভয় করতে থাক– وَاتَّقُوا اللّٰهَ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক যেসব কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, আর যেসব কাজকে তোমাদের জন্যে হারাম ঘোষণা করেছেন, সেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে থাক আর মনে রেখো–

اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অতি সত্বর হিসেব গ্রহণকারী, তিনি অবশ্যই তোমাদের ভাল-মন্দ কাজের হিসেবে গ্রহণ করবেন, অতএব, তোমরা আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে হারাম ঘোষিত বস্তু গ্রহণ করোনা এবং হালাল হওয়ার জন্যে যে সব শর্তারোপ করা হয়েছে সে শর্ত সমূহের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখ। অচিরেই তোমাদেরকে মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে এবং তোমাদের জীবনের যাবতীয় কার্যাবলীর হিসাব দিতে হবে আর সে হিসাব হবে অতি সত্বর। অতএব, সাবধান হও।

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۫ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ
مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ
مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ
بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۫ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝٥

**তরজমা**

(৫) আজ তোমাদের জন্যে পবিত্র বস্তু সমূহ হালাল করা হয়েছে, আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল এবং তোমাদের খাদ্যও তাদের জন্যে হালাল। এবং মোমেনদের মধ্য হতে পরহেযগার নারীগণ এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে তাদের মধ্য হতে পরহেযগার নারীগণ তোমাদের জন্যে বৈধ, যখন তোমরা তাদের মোহর দান কর এভাবে যে, তোমরা

তাদেরকে পত্নী করে লও, এভাবে নয় যে তোমরা তাদের সাথে কুকার্যে লিপ্ত হও, অথবা গোপন সম্পর্ক স্থাপন কর, আর যে ব্যক্তি নাফরমান হবে তার জীবন সাধনা ব্যর্থ হবে, আর সে আখেরাতে হবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত।

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে শিকার সম্পর্কে শরীয়তের বিধান পেশ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টানদের জবেহ করা জন্তু মুসলমানদের জন্যে হালাল হবে কি–না তার বিবরণ রয়েছে। এর পাশাপাশি আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টান নারীদের সঙ্গে বিবাহ সংক্রান্ত বিধি-নিষেধও বর্ণিত হয়েছে।[১]

### সকল উত্তম বস্তু মুসলমানদের জন্যে হালাল

আল্লাহ পাক এ আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ হে মোমেনগণ! সকল উত্তম বস্তু তোমাদের জন্যে হালাল ঘোষণা কর হলো, আর এ ঘোষণা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, এতে কোন পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কেননা, পূর্বেই দ্বীনের পরিপূর্ণতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে অথচ ইহুদীদের অবাধ্যতার কারণে অনেক হালাল বস্তুও তাদের জন্যে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে যা তোমাদের জন্যে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে আর এ আদেশ কখনো বাতিল হবে না।

এ বাক্যটি বিষয়টির ওপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করার জন্যেই পুনঃ উচ্চারিত হয়েছে–

أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ

অর্থাৎ– তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে উত্তম বস্তু সমূহ।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াতে দ্বীনের পরিপূর্ণতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে আর এ আয়াতে উত্তম বস্তু হালাল হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে তাহলে এভাবে বলা যেতে পারে যে, হে মোমেনগণ! যেভাবে তোমাদেরকে পূর্ণ পরিণত জীবন বিধান প্রদান করা হয়েছে, ঠিক তেমনি পৃথিবীর যাবতীয় পবিত্র বস্তু সমূহ তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে। এ বিধান চিরন্তন, চির অপরিবর্তনীয়, কেয়ামত পর্যন্ত এতে কোন পরিবর্তন হবে না।

---

১। তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন কৃত–আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮৭

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক الطيبٰت। শব্দটি ব্যবহার করেছেন, এর একবচন হলো طيب অর্থাৎ– উত্তম পবিত্র, আর এর বিপরীত শব্দ হলো আরবী ভাষায় خبايث এর বহুবচন হলো خبيثة

প্রশ্ন হলো কোন্‌টি তাইয়্যেব আর কোন্‌টি খাবীস তা কিভাবে বুঝব? এর জবাব এই, যা কিছু পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে তা-ই তাইয়্যেব বা উৎকৃষ্ট আর যা কিছু পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে তা হলো খাবীস বা নিকৃষ্ট। আর যে সব জন্তুকে হত্যা করার হুকুম দেয়া হয়েছে সেগুলোও খাবীস হারাম। যেমন হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, পাঁচ প্রকার জন্তু এমন যাদেরকে হরম শরীফ এলাকায় এহরাম অবস্থায় হত্যা করলেও গুনাহ হয় না। সেগুলো হলো ইঁদুর, চিল, বিচ্ছু এবং যে কুকুর মানুষকে কাঁমড় দেয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ পাঁচটি জন্তু ফাসেক তথা মানুষের জন্যে কষ্টদায়ক; হরম শরীফ এলাকায় এ জন্তুগুলোকে হত্যা করা যায়।

(১) সর্প (২) কাক (৩) ইঁদুর (৪) যে কুকুর মানুষকে কাঁমড়ায় এবং (৫) চিল।

সর্প সম্পর্কে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে এরশাদ হয়েছেঃ যখন থেকে সর্পের সাথে আমাদের যুদ্ধ হয়েছে, আমরা কোন সময়ই তার সাথে মীমাংসা করিনি। যে ব্যক্তি ভয়ে সর্পকে হত্যা না করে ছেড়ে দেবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (আবু দাউদ)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সকল সাপকে হত্যা কর যে তার থেকে প্রতিশোধ নিতে ভয় করবে সে আমার হবে না, অর্থাৎ তার সম্পর্ক আমার সাথে থাকবেনা। –(আবু দাউদ, নেসায়ী)

আর যে সব বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফে কোন উল্লেখ নেই তথা সে বস্তুকে তাইয়্যেব অথবা খাবীসই বলা হয়নি, সেক্ষেত্রে কেয়াস দ্বারা কাজ নেয়া হবে।

সাহাবায়ে কেরাম মৃত জন্তু ভক্ষণ করাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন। এবনে আবি শায়বা ইমাম নখয়ীর সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যে চতুঃষ্পদ জন্তু মৃত জন্তুর গোশ্‌ত খায়, তা-ও হারাম।

## মাসআলা

যে জন্তু দাঁত দিয়ে চিরে খায় যেমন– বাঘ, সিংহ, কুকুর, বিড়াল এসব ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মতে হারাম। আর ইমাম মালেক (রঃ)-এর নিকট মাকরূহ। এমনিভাবে যে সব পাখী তাদের নখ দ্বারা শিকার করে যেমন বাজপাখী, চিল এগুলো উপরোক্ত তিন জন ইমাম সাহেবের মতে হারাম, আর ইমাম মালেক (রঃ)-এর মতে মাকরূহ।

এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীস বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে চতুঃষ্পদ জন্তু দাঁত দ্বারা শিকার করে আর যে পাখী নখ দ্বারা শিকার করে সেগুলো হারাম।

এ মর্মে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এরও একখানি হাদীস রয়েছে যা মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে।

হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিড়াল এবং তার মূল্য খাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। হযরত আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুরগীর গোশ্ত খেয়েছেন।

وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ

অর্থাৎ– আহলে কিতাবদের জবেহ করা জন্তু তোমাদের জন্যে হালাল। যদিও "তায়াম" শব্দের আভিধাণিক অর্থ খাদ্য কিন্তু এ স্থলে জবাইকৃত জন্তুর গোশত-ই হলো উদ্দেশ্য।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ আহলে কিতাবের জবেহ করা জন্তু তিনটি শর্তে মুসলমানদের জন্যে হালাল।

১. যে জন্তু জবেহ করা হয়েছে তা যেন এমন না হয় যা মুসলমানদের জন্যে কোরআন ও হাদীসে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

২. জবেহ করার সময় সে জন্তুর উপর আল্লাহ পাকের নাম উচ্চারিত হয়েছে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নাম উচ্চারিত হয়নি।

এখানে উল্লেখ্য, আহলে কিতাবদের মূল আকীদা হলো জবেহ করার সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নাম উচ্চারণ না করা। এ আকীদার কারণেই আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে আহলে কিতাবদের জবেহ করা জন্তুর গোশ্ত খাওয়ার অনুমতি দান করেছেন। তাই আহলে কিতাবদের জবেহ করা জন্তু মুসলমানদের জন্যে হালাল।

কিন্তু শর্ত হলো জবেহর সময় যেন তারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্য না থাকে। আর আহলে কিতাব ব্যতীত অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর জবেহ করা জন্তুর গোশ্‌ত মুসলমানদের জন্যে হালাল নয়। এমনকি যদি তারা জবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তবুও।

হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের মতে, আহলে কিতাবদের সে জন্তু হালাল যার উপর আল্লাহ পাকের নাম উচ্চারিত হয়েছে, আর সে জন্তু হালাল নয় যার উপর জবেহ করার সময় হযরত ঈসা (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ

(যে জন্তুর উপর আল্লাহ পাকের নাম উচ্চারিত হয়নি, তোমরা তা ভক্ষণ করোনা, আর তা হলো অত্যন্ত গুনাহ্‌র কাজ।) অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ

অর্থাৎ– আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর উদ্দেশ্যে যা জবেহ করা হয় তা মুসলমানদের জন্যে হালাল নয়। অতএব, আহলে কিতাবদের জবেহ করা সে জন্তুই মুসলমানদের জন্যে হালাল যা তারা তাদের খাঁটি শরীয়ত মোতাবেক জবেহ করেছে।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ), ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) এবং ইমাম জাফর (রঃ) প্রমুখ ইমামগণের মতে, আহলে কিতাবদের জবেহ করা সে জন্তু মুসলমানদের জন্যে হালাল, যার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, যদি অন্য কারো নাম উচ্চারণ করা হয় তবে হালাল নয়।[১]

৩. ইসলাম গ্রহণের পর ইসলাম পরিত্যাগ করে যদি কেউ মুরতাদ হয়ে যায় এবং ইহুদী বা খৃষ্টানদের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তাদের জবেহ করা জন্তু হালাল নয়। কেননা, যে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী তার জবেহ করা জন্তু কোন অবস্থাতেই মুসলমানদের জন্যে হালাল নয়।[২]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে আহলে কিতাব দ্বারা ইহুদী ও নাসারাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ)

১। আহকামুল কোরআন খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩২২
২। তফসীরে মারেফুল কোরআন কৃত–আল্লামা ইদ্রীস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮৮

লিখেছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরবের খৃষ্টানদের জবেহ করা জন্তু খাওয়ার ব্যপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।

এবনে জওযী হযরত আলীর (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, বনি তাগাল্লবের জবেহ করা জন্তু তোমরা ভক্ষণ করোনা, কেননা তারা মদ্য পান ব্যতীত আর কোন কিছু গ্রহণ করেনা।

## মাসআলা

যদি কোন ইহুদী হযরত ওজায়ের (আঃ)-এর নামে বা কোন খৃষ্টান হযরত ঈসা (আঃ)-এর নামে কোন জন্তু জবেহ করে তবে সে জন্তু মুসলমানদের জন্যে হালাল নয়। আহলে কিতাবদের জবেহ করা জন্তু তখন হালাল হবে যখন তারা হযরত ওজায়ের (আঃ) অথবা হযরত ঈসা (আঃ)-এর নামে তা না করবে। যেমন কোন মুসলমান যদি আল্লাহ পাকের নাম ব্যতীত জবেহ করে তাও হালাল নয়।

وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

অর্থাৎ– তোমাদের খাবার তাদের জন্যে হালাল, তোমরা তাদেরকে তোমাদের জবেহ করা জন্তু খাওয়াতে পার যেভাবে তাদের জবেহ করা জন্তু তোমরা খেতে পার।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুনাফেক সর্দার আব্দুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুলের কাফনের জন্যে তাঁর ব্যবহৃত জামা দান করেছিলেন। এর কারণ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে তার জামা দিয়েছিলো, যখন তিনি মদীনা শরীফে আগমন করেছিলেন তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার সে এহসানের বদলা দিয়েছেন।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, হাদীস শরীফে আছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

لا ياكل طعامك الا تقى

অর্থাৎ পরহেযগার লোক ব্যতীত যেন তোমার খাবার কেউ না খায়। এর তাৎপর্য হচ্ছেঃ নেককার লোককে খাওয়ানেই উত্তম কাজ কিন্তু অসাধু লোককে খাওয়ানো নাজায়েয বলা হয়নি। এমনকি আহলে কিতাব কাফেরকেও খাওয়ানোর

অনুমতি দেয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এমন অবস্থায় অসাধু ব্যক্তিকে খাওয়ানো অবশ্যই জায়েয হবে, তবে নেককার লোককে খাওয়ানোই উত্তম কাজ।[১]

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ

পূর্ববর্তী আয়াতে আহলে কিতাবদের জবেহ করা জন্তু হালাল হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে আহলে কিতাব মহিলাদের সাথে মুসলমানদের বিবাহ হালাল হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, সাধারণ কাফেরের চেয়ে আহলে কিতাবরা দু'টি ব্যাপারে সম্পূর্ণ আলাদা। একটি হলো আহলে কিতাবদের জবেহ করা জন্তু মুসলমানদের জন্যে হালাল। পক্ষান্তরে, অগ্নি পূজকদের জবেহ করা জন্তু মুসলমানদের জন্যে হালাল নয়। এমনকি, যদি তারা জবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তবুও। কেননা, তারা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করেনা। পক্ষান্তরে, আহলে কিতাব তৌহিদ তথা আল্লাহর একত্ববাদদে বিশ্বাসী এবং আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ করে। দ্বিতীয়টি হলো আহলে কিতাব নারীদের সঙ্গে মুসলমানদের বিবাহ বৈধ কিন্তু মুশরেক ও অগ্নিপূজক নারীদের সঙ্গে বিবাহ বৈধ নয়।

এ দু'টি বিষয়ে সাধারণ কাফের এবং আহলে কিতাবের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) এ পার্থক্যের কারণ সম্পর্কে বলেছেন যে, হয়তো এর কারণ হলো হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে আহলে কিতাবদের সম্পর্ক। তাঁদের কারণেই আহলে কিতাবকে এ বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। তবে এ বৈশিষ্ট্য এবং মর্যাদা শুধু দুনিয়ার এ জীবনেই, আখেরাতে সকল কাফেরই শাস্তি যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এর প্রমাণ এই, আলোচ্য আয়াতে আহলে কিতাবদের জবেহ করা জন্তু এবং তাদের নারীদের সাথে বিবাহ হালাল বলে ঘোষণার পর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেঃ

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

অর্থাৎ– আর যে ঈমানকে অস্বীকার করল তার সমস্ত সাধনা ব্যর্থ হলো আর আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

এতে একথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, আখেরাতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে ঈমান ও কুফরের ভিত্তিতে, আখেরাতে সমস্ত কাফেরকে সমান দৃষ্টিতে দেখা হবে। দুনিয়াতে আহলে কিতাবদের জবেহ করা জন্তু এবং আহলে কিতাব নারীদের সাথে বিবাহ হালাল ঘোষিত হবার কারণে কেউ যেন এ ভুল ধারণা না করে যে, আহলে কিতাবরা আখেরাতেও কোন বিশেষ সুযোগ লাভ করবে

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৬ খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৫৪-৫৫

কেননা পবিত্র কোরআন সুস্পষ্ট ভাষায় এমন সম্ভাবনার কথা নাকচ করে দিয়েছে।[১]

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আহলে কিতাব নারীদের সঙ্গে মুসলমান পুরুষের বিবাহ জায়েয। কিন্তু আহলে কিতাব পুরুষের সঙ্গে মুসলমান নারীর বিবাহ জায়েয নয়।

এছাড়া ইসলামী শরীয়ত বিশারদগণ এ সম্পর্কে বলেছেনঃ যদিও অনুমতি আছে কিন্তু অপ্রয়োজনে এমন বিবাহ থেকে আত্মরক্ষা করাই উচিত, যেমন বলা হয়েছেঃ

يَجُوْزُ تَزَوُّجُ اَلْكِتَابِيَّاتِ وَالْاَوْلٰى اَنْ لَا يَفْعَلَ

অর্থাৎ আহলে কিতাব মহিলাদের সাথে বিবাহ জায়েয তবে উত্তম হলো এমন বিবাহ না করা।[২]

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে আহলে কিতাব মহিলার সঙ্গে মুসলমানদের বিবাহ জায়েয বলা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগের ইহুদী খৃষ্টানরা সত্যিকার আহলে কিতাব নয়, যাদের সম্পর্কে এ অনুমতি দেয়া হয়েছে কেননা, বর্তমান ইহুদী খৃষ্টানদের অনেকে আসমানী কিতাবকেই বিশ্বাস করে না। এমনকি, এদের অনেকে কোন ধর্মেও বিশ্বাস করে না। আল্লাহর একত্ববাদ তো দূরের কথা, তাঁর অস্তিত্বও স্বীকার করে না। এমনি অবস্থায় এদেরকে আদৌ আহলে কিতাব বলা যায় না।

অতএব, তাদের জবেহকৃত জন্তু মুসলমানদের জন্যে হালাল নয়, আর তাদের নারীদের সঙ্গে বিবাহও বৈধ নয়।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য, কোন বিষয়কে হালাল বা বৈধ ঘোষণা করা হলে এর এই অর্থ হবে না যে, তাতে কোন দোষ মাত্রই নেই বা তাকে কোন দোষ স্পর্শও করতে পারবে না; বরং কোন বৈধ কাজ করতে ইচ্ছা করলে যদি দশটি হারাম কাজ করতে হয় তবে কোন বুদ্ধিমান মানুষই এমন হালাল কাজ করার অনুমতি দেবেনা। ঠিক এ অবস্থাই এ যুগের আহলে কিতাবদের সম্পর্কে বিরাজমান। প্রকৃত অবস্থা এই, যদি বর্তমান যুগের ইহুদী খৃষ্টানদের সাথে অবাধে মেলা-মেশা করা হয়, ওঠা-বসা, খানা-পিনা একত্রিত হয়ে যায়, তাদের নারীদের ফাঁদে কেউ পড়ে, তবে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যে কত ভয়াবহ তা ভাবতেও ভয় হয়। তাই এমন মন্দ উপকরণ থেকে আত্মরক্ষা করা শুধু যে যুক্তিসঙ্গত তাই নয়; বরং একান্ত কর্তব্যও বটে।[৩]

১। তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন- কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮৯
২। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩৮
৩। ফাওয়ায়েদে ওসমানী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩৯

إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

অর্থাৎ সতী-সাধ্বী নারীদের সঙ্গে তোমাদের বিবাহ হালাল। তারা মোমেন হোক অথবা আহলে কিতাব। তবে শর্ত হলো তোমরা যেন তাদের মোহরানার হক্ব আদায় কর।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, এ বাক্য দ্বারা দু'টি কথা প্রকাশ করা হয়েছে–

১. মোহরানা আদায় করা যে অবশ্য কর্তব্য একথা প্রকাশ করা হয়েছে।

২. মোহরানা আদায় করার প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, মোহরানা আদায়ের তাৎপর্য হলো মোহরানা আদায় করার অঙ্গীকার করা এবং মোহরানা আদায়কে নিজের কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করা।[১]

## ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যন্ত বেশী। এর সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক– এক কথায় সব দিকই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এর উপকারীতা সমাজ ও জাতির জন্যে অগণিত। এতদ্বারা মানব জাতির সৃষ্টির ধারা অব্যাহত থাকে, মানুষের জীবন সুসংহত, সুশৃংখল এবং সুসংযত হয়। বলতে গেলে বিবাহের মাধ্যমেই ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবনে রূপান্তরিত হয় এবং সত্যিকার অর্থে জীবন-সাধনা শুরু হয়। এটিই আল্লাহ পাকের আমোঘ বিধান, আর এ বিধান চিরন্তন। সভ্যতার ক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে অতি স্বাভাবিক ভাবেই এ বিধান মেনে চলতে হয়েছে। বর্বরতার ঘন অন্ধকার দূর করে মানুষ যখন ইসলামের পূর্ণ পরিণত জীবনের দিকে এগিয়ে এসেছে এবং সভ্যতার পাঠ গ্রহণ করেছে তখন থেকে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার প্রতি সভ্য মানুষের ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে। এজন্যেই পবিত্র কোরআনের এ আয়াতের পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

مُحْصِنِينَ

অর্থাৎ– ইতিপূর্বে বিবাহের যে অনুমতি দান করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য যেন শুধু মাত্র যৌন সম্ভোগ না হয়; বরং কোন নারীকে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে জীবন-সঙ্গীনী রূপে গ্রহণ করাই যেন উদ্দেশ্য হয়। পশুর মত যৌন সম্ভোগের স্বাধীনতা ইসলাম কোন অবস্থাতেই দেয় না। ইসলাম যথা নিয়মে বিবাহ বন্ধনের আহ্বান জানায়।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৮৮

غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ

অর্থাৎ– যেন তোমরা প্রকাশ্যে ব্যাভিচারে লিপ্ত না হও।

وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ

অর্থাৎ– গোপন প্রীতি যেন উদ্দেশ্য না হয়। এতদ্ব্যতীত, শুধু নারীকেই সতী সাধ্বী হতে হবে এমন নয়; বরং পুরুষকেও সৎ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। বস্তুতঃ সৎ পুরুষের সাথে সতী নারীর বিবাহই যুক্তি যুক্ত। অতএব, নর-নারীর সতীত্ব এবং চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করা বিবাহ বন্ধনের উদ্দেশ্য। যৌন সম্ভোগ বিবাহের একমাত্র লক্ষ্য নয়; বরং উপলক্ষ মাত্র।

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ

অর্থাৎ এসব হলো ইসলামের চিরন্তন বিধান, এ বিধান যারা অমান্য করবে তাদের জীবন-সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবশিত হবে।

বস্তুতঃ মুসলমানদের সান্নিধ্যে আহলে কিতাব নারীদের অন্তরে ইসলামের প্রভাব বিস্তার লাভ করবে। এ কারণেই আহলে কিতাব নারীদের বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আহলে কিতাব নারীদের প্রেমে পড়ে দ্বীন ইসলাম বর্জন করার জন্যে এ অনুমতি দেয়া হয়নি। অতএব, যারা এ অনুমতির সুযোগে এ যুগের ইহুদী ও খৃষ্টান নারীদের বিবাহ করে এবং ইসলামী আদর্শ বর্জন করে তারা আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্টা-৩৮৮

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا
وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ
وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ
وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ
الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا
صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ؕ مَا
يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝٦ وَاذْكُرُوْا
نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ
قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ
بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٧

**তরজমা**

(৬) হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাজের জন্যে দাঁড়াতে ইচ্ছা কর, তখন নিজেদের মুখ এবং কনুই পর্যন্ত তোমাদের হাত ধৌত কর, তোমাদের মাথা মসেহ কর এবং তোমাদের পা ধৌত কর গোড়ালি পর্যন্ত এবং যদি তোমরা নাপাক থাক তবে উত্তম রূপে পবিত্রতা অর্জন কর, আর যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা ভ্রমণরত থাক বা তোমাদের মধ্যে কেউ মল-মূত্র ত্যাগ করে অথবা তোমরা স্ত্রী-সহবাস করে থাক পরে পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তয়ম্মুম করে নেবে অর্থাৎ তোমাদের চেহারা ও হস্ত সমূহকে উক্ত মাটি দ্বারা মসেহ করে নেবে। আল্লাহ তায়ালার আদৌ ইচ্ছা নয় যে, তিনি তোমাদেরকে কষ্ট দেবেন। তবে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে ইচ্ছা করেন এবং যেন তোমাদের উপর তাঁর নেয়ামতকে তিনি সম্পূর্ণ করে দেন, হয়তো তোমরা তাঁর শোকর গুজার হবে।

(৭) আর তোমরা স্মরণ কর আল্লাহ তায়ালার সেই নেয়ামত সমূহকে যা তোমাদের প্রতি রয়েছে, আর তোমাদের নিকট থেকে তাঁর গৃহীত অঙ্গীকারও স্মরণ কর, যখন তোমরা বলেছিলে আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি এবং আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ পাক মনের নিভৃত কোণের কথাও খুব ভালভাবেই জানেন।

## তফসীরুল কোরআন

### পটভূমি

উম্মতে মোহাম্মদীয়ার প্রতি আল্লাহ পাক যে অনন্ত অসীম নেয়ামত দান করেছেন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে মোমেন মাত্রেরই অন্তরে করুণাময় আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। মর্দে মোমেনের অন্তরের এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্যে তথা আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হয়ে তাঁর সান্নিধ্য-ধন্য হতে যে আদব এবং রীতি-নীতি মেনে চলতে হবে, তারই বিবরণ রয়েছে আলোচ্য আয়াত সমূহে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ যখন আমার দরবারে হাযির হওয়ার তথা নামাজে দন্ডায়মান হওয়ার ইচ্ছা কর, তখন পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন হয়ে আসবে। হালাল এবং পবিত্র বস্তু সমূহ আহার করবে। দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে তোমাদের জন্যে যে ভোগ ও সম্পদের ব্যবস্থা রয়েছে তাতে মশগুল হওয়ার কারণে আল্লাহর দরবার থেকে তোমাদের দূরে থাকতে হয়, এ দূরত্ব কাটিয়ে ওঠার উদ্দেশ্যে তথা দেহ ও মনকে সম্পূর্ণ পবিত্র করার প্রয়োজনে অজু-গোসলের পন্থা অবলম্বন করতে হয়, তাই আলোচ্য আয়াতে অজু-গোসলের নির্দেশ রয়েছে। যদি অজু-গোসলের জন্যে পানি না পাওয়া যায়, তবে তয়ম্মুমের ব্যবস্থা রয়েছে।[১]

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

এ সূরার শুরুতে অঙ্গীকার রক্ষা করার তাগিদ ছিল, এরপর হালাল খাদ্য বস্তুর কথা উল্লেখিত হয়। এরপর যে সব নারীদের সাথে বিবাহ বৈধ বা হালাল, তাদের সম্পর্কে আলোচনা হয়। এসব কথার পর এখন আল্লাহ পাকের বন্দেগী সম্পর্কীয় রীতি-নীতি-পদ্ধতির বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

বন্দেগীর মধ্যে সর্বপ্রথম কথা আসে নামাজের, আর নামাজের জন্যে পবিত্রতা অর্জন পূর্বশর্ত। তাই আলোচ্য আয়াত সমূহে অজু-গোসল এবং তয়ম্মুমের ব্যাপারে আলোচনা রয়েছে।

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১৩৮

এরশাদ হয়েছেঃ হে মোমেনগণ! যখন তোমরা নামাজে দন্ডায়মান হবার ইচ্ছা কর তখন নিজেদের মুখ এবং কুনই পর্যন্ত তোমাদের হাত ধৌত কর তথা অজু কর, অবশ্য যদি পূর্ব থেকে অজু না থাকে তাহলে অজু জরুরী হয়।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন যে, ইসলামের সূচনায় প্রত্যেক নামাজের জন্যে নতুন অজু করার আদেশ ছিল। মসনদে আহমদের একট বর্ণনায় রয়েছেঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাজের জন্যে নতুন অজু করতেন, মক্কা-বিজয়ের দিন তিনি অজু করলেন এবং মোজার ওপর মসেহ করলেন আর এক অজু দ্বারা কয়েকটি নামাজ আদায় করলেন। এ অবস্থা দেখে হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি আজ এমন কাজ করেছেন যা ইতিপূর্বে করেননি। তিনি এরশাদ করলেনঃ আমি ভুলক্রমে এমন করিনি; বরং ইচ্ছা করেই করেছি।

এবনে মাযা শরীফে রয়েছে, হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) এক অজু দ্বারা কয়েকটি নামাজ আদায় করতেন, অবশ্য যদি প্রস্রাবের প্রয়োজন হতো অথবা অন্য কোন কারণে অজু বিনষ্ট হতো তখন নতুন করে অজু করতেন এবং অজুর অবশিষ্ট পানি দ্বারা মৌজার ওপর (চামড়া) মসেহ করে নিতেন। এ দৃশ্য দেখে হযরত ফজল এবনে মোবাশ্যের (রাঃ) প্রশ্ন করলেন, আপনি কি এ কাজ নিজের ইচ্ছায় করলেন? তিনি বললেনঃ না, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এমনটি করতে দেখেছি।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) প্রত্যেক নামাজের জন্যে নূতন ভাবে অজু করতেন, অজু যাক বা থাক, এ অবস্থায় তাঁর পুত্র হযরত ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়-এর দলিল কি? তখন তিনি বলেনঃ তাঁকে হযরত আসমা বিনতে এজিদ বলেছেন, তাঁকে আবদুল্লাহ এবনে হানজালা (রাঃ) বলেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রত্যেক নামাজের জন্যে নতুন অজু করার আদেশ দেয়া হয়েছে।[১]

এ পর্যায়ে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, ইমাম মালেক (রঃ) নাফের সূত্রে একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মদীনা শরীফের বাজারে হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) অজু করছেন, এমন সময় জানাযার নামাজের জন্যে তাঁকে আহ্বান করা হয়, তখন তিনি সে সময় জানাযার জন্যে যারা অপেক্ষা করছিলেন তাদের নিকট চলে আসলেন এবং দু' পায়ের মোজার ওমর মসেহ করলেন (কেননা, জানাযার জন্যে যখন তাঁকে আহ্বান জানান হয় তখন তাঁর দু' পা ধোয়া বাকি ছিল)।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৬ খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৫৬-৫৭

## মাসআলা

আমাদের ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর নিকট অজুর জন্যে নিয়ত জরুরী নয় কিন্তু ইমাম মালেক (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রঃ)-এর নিকট অজুতে নিয়ত জরুরী।

এ পর্যায়ে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, অজুর দু'টি অবস্থান রয়েছে। প্রথমোক্তটি হলো অজু একটি স্বতন্ত্র এবাদত, এর দ্বারা গুনাহ মাফ হয়, এমন অবস্থায় অজুর জন্যে নিয়ত জরুরী কেননা, প্রত্যেক এবাদতের জন্যে নিয়ত শর্ত। আর অজুর দ্বিতীয় অবস্থান এই যে, অজু হলো নামাজের চাবি, নামাজের অন্যান্য শর্তের মধ্যে একটি শর্ত, এদিক থেকে অজুর নিয়ত জরুরী নয়।[১]

অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের নিকট অজুর জন্যে "বিস্‌মিল্লাহ" পাঠ করা শর্ত নয়, কিন্তু ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মতে অজু করার জন্যে "বিস্‌মিল্লাহ" পাঠ করা ওয়াজিব।

আয়াতের বর্ণনা-শৈলী দ্বারা একথা বোঝা যায় যে, প্রত্যেক নামাজের সময় নতুন অজুর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, তবে শরীয়তের বিধান হলো, অজু না থাকলে নামাজের জন্যে অজু করা ফরজ আর যদি অজু থাকে, তবে নতুন করে অজু করা মোস্তাহাব।

وَامْسَحُوْا

অর্থাৎ- মাথা মসেহ কর, ভেজা হাত দ্বারা মাথা মুছে নাও, মাথার সম্মুখ ভাগ তথা প্রায় এক চতুর্থাংশ মাথার সমান মসেহ করার নিয়ম রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে, এ পরিমাণ মসেহ করা ফরজ।

وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ

অর্থাৎ- পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত কর, আর এটি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মতে ফরজ। আর যদি কারো পায়ে চামড়ার মোজা থাকে, তবে তার নির্দিষ্ট শর্ত মোতাবেক মুকীম ব্যক্তি এক রাত একদিন এবং মুসাফির ব্যক্তি তিন রাত তিন দিন পর্যন্ত মোজার ওপর মসেহ করতে পারে। মোজার ওপর মসেহ করার অন্যান্য শর্ত ফেকাহর কিতাবে দ্রষ্টব্য।

এখানে এ-ও উল্লেখ্য, কয়েকটি কাজ অজুর ব্যাপারে সুন্নত বলে পরিগণিত।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪০২-০৩

(১) নিয়ত (২) কব্জি পর্যন্ত তিনবার হাত ধৌত করা (৩) কুলি করা (৪) নাকে পানি দেয়া (৫) নাক পরিচ্ছন্ন করা (৬) প্রত্যেকটি অঙ্গ তিনবার করে ধোয়া (৭) একবার পূর্ণ মাথা মসেহ করা (৮) অঙ্গ-প্রতঙ্গ ধোয়ার ব্যাপারে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

অর্থাৎ– যদি তোমরা জানাবাতের কারণে তথা সহবাস ও স্বপ্নদোষ হওয়ার কারণে নাপাক হও তবে খুব ভালভাবে দেহকে পবিত্র কর। দেহের যে সব ক্ষেত্রে পানি পৌঁছানো সম্ভব, সেখানে অবশ্যই পানি পৌঁছাও। মুখের ভেতর এবং নাকের ভেতর পানি পৌঁছানো তথা ভাল করে কুলি করা এবং ভালভাবে নাকের অভ্যন্তরে পানি পৌঁছিয়ে তাকে পবিত্র করা একান্ত কর্তব্য এবং দেহের প্রতিটি অঙ্গে তথা সর্বত্র পানি পৌঁছানো জরুরী। সামান্যতম স্থানও যদি বাদ পড়ে তবে ফরজ গোসল সঠিক হয় না তথা মানুষ পবিত্র হয় না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ পর্যায়ে হযরত আলী (রাঃ)-এর একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি নিজে শুনেছি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি ফরজ গোসলের সময় একটি চুল পরিমাণ জায়গাও ছেড়ে দিল যেখানে পানি পৌঁছল না, আল্লাহ পাক তাকে দোযখের শাস্তি দেবেন।

এবনে আবি শায়বা হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আমরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির ছিলাম। এক ব্যক্তি আসলেন। তিনি অত্যন্ত সুপুরুষ, উত্তম পোষাকে সুসজ্জিত, পবিত্র এবং খুশবুদার। তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! ইসলাম কি?

তিনি এরশাদ করলেনঃ নামাজ কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, রমজানের রোজা রাখ, হজ্ব কর এবং জানাবাতের তথা ফরজ গোসল আদায় কর।

সে ব্যক্তি বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন।

জবুর কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে, যে ব্যক্তি জানাবাতের গোসল তথা ফরজ গোসল সঠিকভাবে করলো সে নিশ্চয় আমার বন্দা, আর যে ফরজ গোসল সঠিকভাবে করে না সে নিশ্চয় আমার দুশমন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জানাবাতের গোসল হাত দিয়ে শুরু করতেন (অর্থাৎ সর্ব প্রথম হাত ধৌত করতেন) এরপর নামাজের জন্যে যেভাবে অজু করতে হয় সেভাবে অজু করতেন

(শুধু পা ধোয়া বাকী রাখতেন) এরপর ভেজা আঙ্গুল দ্বারা আঙুলের গোড়ায় খেলাল করে পানি পৌঁছাতেন। এরপর সারা দেহে পানি পৌঁছাতেন।[১]

وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْعَلٰى سَفَرٍ اَوْجَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ

যদি তোমরা অসুস্থ থাক, অসুস্থতার কারণে পানি ব্যবহার ক্ষতিকর হয় অথবা তোমরা প্রবাসে থাকার কারণে প্রয়োজনীয় পানির অভাব হয় অথবা তোমরা প্রস্রাব-পায়খানা সেরে ফিরে এসেছ, অজুর প্রয়োজন হয় অথবা জানাবাতের কারণে তোমাদের উপর গোসল ফরজ হয় কিন্তু পানি না পাওয়ার কারণে পবিত্রতা অর্জন করতে পার না, এমনি অবস্থায় তোমরা অজু এবং গোসলের পরিবর্তে পবিত্র মাটি দ্বারা তৈয়ম্মুম কর এভাবে যে, জমিনের উপর হাত মেরে সেই মাটি মিশ্রিত হাত দ্বারা নিজের চেহারা এবং হাতকে মসেহ করে দাও তথা তৈয়ম্মুম কর।[২]

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ

অর্থাৎ– আল্লাহ পাক মানুষকে কষ্ট দিতে চান না; বরং অপবিত্রতা এবং পাপাচার থেকে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান।

হযরত আমর এবনে আম্বাসা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি অজু করার সময় কুলি করে এবং নাকে পানি পৌঁছায় এতদ্বারা তার মুখ এবং নাকের গুনাহ দূরীভূত হয়।

## অজুর ফজিলত

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত ওসমান (রাঃ) তিনবার করে প্রত্যেকটি অঙ্গ ধৌত করার পর বলেছেনঃ আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট শ্রবণ করেছি, যে ব্যক্তি আমার অজুর ন্যায় অজু করবে তার চেহারা, দু' হাত এবং দু' পা থেকে গুনাহ দূরীভূত হবে।

وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ– যেভাবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না এবং তোমাদেরকে নাপাকী থেকে পবিত্র করতে চান ঠিক তেমনি তিনি তাঁর নেয়ামতকে তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করতে চান। অর্থাৎ তোমাদের জন্যে এমন পন্থা

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪১০-১২
২। তৈয়ম্মুম সম্পর্কে তফসীরে নূরুল কোরআনের ৫ম খন্ডে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যা তোমাদের দেহ সমূহকে অপবিত্রতা থেকে এবং তোমাদের সত্ত্বাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করে দেবে। আর সেই নামাজ যা তোমাদের জন্যে মে'রাজ তার জন্য অজু করার এ পন্থা হলো চাবি।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীসে রয়েছেঃ নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করার তাৎপর্য হলো জান্নাতে প্রবেশ করা এবং দোযখ থেকে নাজাত লাভ করা। (আহমদ, এবনে আবি শায়বা, তিরমিজী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে আমি নিজে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ কেয়ামতের দিন আমার উম্মতকে ডাকা হবে যাদের চেহারা এবং হাত পা অজুর কারণে অত্যন্ত চমৎকার হবে। অতএব তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা, যত ইচ্ছা নিজের সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করার চেষ্টা কর। –(বোখারী)

তফসীরে বয়যাভীতে এ আয়াতের অর্থ এভাবে করা হয়েছে– আল্লাহ পাক চান না পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে তোমাদেরকে কষ্ট দেন; বরং তিনি পবিত্রতা অর্জনের আদেশ এজন্যে করেছেন যেন তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দেন।

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাকের অনন্য-সাধারণ নেয়ামত সমূহের বর্ণনার পর বন্দার অন্তরে আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যে আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল এবং সে আকাঙ্ক্ষার কারণে বন্দা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়। এ কারণেই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে বান্দাকে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হওয়ার আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছেন এবং পবিত্রতা অর্জনের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিয়েছেন। এটি আল্লাহ পাকের দয়া এবং মেহেরবানী ব্যতীত আর কিছুই নয়। তদুপরি দেহের বহির্ভাগে পানি অথবা মাটি ব্যবহার করলে পবিত্রতা লাভের যে সুযোগ আল্লাহ পাক দান করেছেন তা-ও আল্লাহর মহান দান ব্যতীত আর কিছুই নয়। বন্দা এখনও আল্লাহ পাকের পূর্ববর্তী নেয়ামতের শোকর আদায় করতে সক্ষম হয়নি, এমনি অবস্থায় পুনরায় তিনি নেয়ামত দান করলেন। দানের উপর দান শুধু আল্লাহ পাকই করতে পারেন। এজন্যে আলোচ্য বাক্যটিতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হয়তো তোমরা শোকর গুজার হবে।

বর্তমান নেয়ামতের শোকরিয়া আদায়ে অনুপ্রাণিত করার পর পূর্বে বর্ণিত নেয়ামত সমূহের শোকর আদায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ পাক পরবর্তী বাক্যে এরশাদ করেছেনঃ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ– আল্লাহ পাক তোমাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছেন তা স্মরণ কর। তোমাদের নিকট তিনি তাঁর রসূল প্রেরণ করেছেন, কিতাব নাযিল করেছেন আর তোমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তৌফিক দান করেছেন এবং আরো অগণিত নেয়ামত দান করেছেন তার জন্যে তোমরা আল্লাহ পাকের শোকর আদায় কর। তাঁর নেয়ামত সমূহকে স্মরণ কর, আর আল্লাহ পাকের সাথে কৃত তোমাদের অঙ্গীকারকে স্মরণ কর, যে অঙ্গীকার তোমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে করেছিলে যখন তোমরা বলেছিলে আমরা শ্রবণ করেছি এবং মেনে নিয়েছি।

## 'মিসাক' শব্দের ব্যাখ্যা

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'মিসাক' (অঙ্গীকার) শব্দটির অর্থ হলো সে অঙ্গীকার যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাতে বয়আত করার সময় তিনি মানুষের নিকট থেকে গ্রহণ করতেন। সে অঙ্গীকার ছিল যে কোন অবস্থায় আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা মেনে চলবো।

হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ মিসাক সে অঙ্গীকার, যা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কার অদূরে হিজরতের পূর্বে মদীনাবাসী সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়েছিলেন, যার বিবরণ বোখারী শরীফে সংকলিত হয়েছে।

অথবা, এ মিসাক বা অঙ্গীকারের অর্থ হলো সে অঙ্গীকার যা হোদায়বিয়া নামক স্থানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়েছিলেন।

মিসাকের ব্যাখ্যায় মুজাহেদ (রঃ) এবং মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এটি হলো সে অঙ্গীকার যা সৃষ্টির প্রথম দিন আল্লাহ পাক সমগ্র মানব জাতি থেকে নিয়েছিলেন।

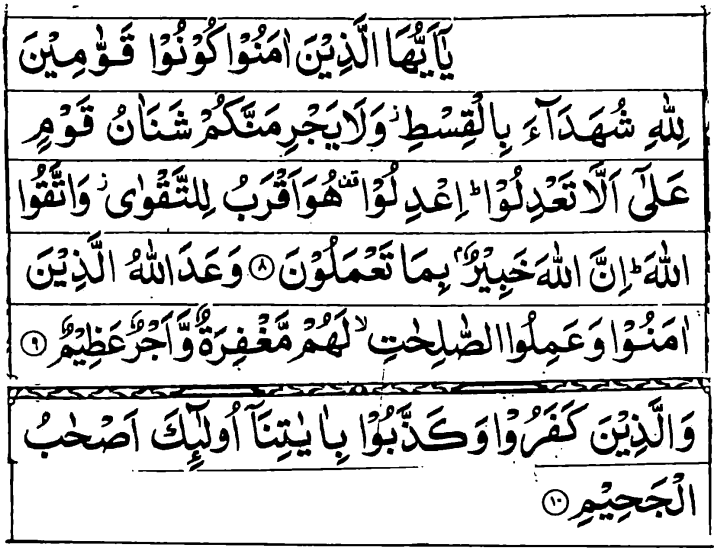
وَاتَّقُوا اللّٰهَ

অর্থাৎ– তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক তথা আল্লাহ পাকের নেয়ামতের কথা বিস্মৃত হয়োনা এবং তাঁর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করোনা।

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

নিশ্চয় আল্লাহ পাক মানুষের অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠের যাবতীয় কথা-বার্তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪১৩-১৫


يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ
لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۡ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۡ اِعْدِلُوْا ۡ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۡ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ ۡ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ ۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝٨ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝٩
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ
الْجَحِيْمِ ۝١٠

## তরজমা

(৮) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ পাকের উদ্দেশ্যে ন্যায় নীতি অনুসারে সাক্ষ্য দানে তোমরা অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কায়েম করতে থাক, এটি পরহেযগারীর অধিকতর নিকটবর্তী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

(৯) যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনে ও নেক কাজ করে, আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

(১০) এবং যারা নাফরমানী করে, আর আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করে তারাই হবে দোযখবাসী।

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে এবাদত বন্দেগীর জন্যে পবিত্রতা অর্জনের বিধান বর্ণিত হয়েছে, যা ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সম্পর্কীয় ছিল। আর আলোচ্য আয়াতে ন্যায়বিচার সুপ্রতিষ্ঠিত করার এবং সত্য সাক্ষ্য প্রদানের নির্দেশ রয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতের বিধি-নিষেধ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয়, আর এ আয়াতের বিধি-নিষেধ সমাজ ও জাতীর জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে প্রযোজ্য।

## সুবিচার কায়েমের নির্দেশ

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যে ন্যায়-নীতি অনুসারে সাক্ষ্য দানে তোমরা অবিচল থাকবে।

ইসলামী শরীয়তের যাবতীয় বিধানের লক্ষ্য দু'টি ঃ (১) আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধি-নিষেধের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য। (২) আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া।

আলোচ্য আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহ পাকের বিধানের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যে কোন অবস্থায় আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে নির্দেশ আসবে তা সঠিকভাবে পালনের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকার হুকুম রয়েছে। কেননা, মানুষ আল্লাহর বন্দা, আল্লাহর সৃষ্টি। অতএব, স্রষ্টা ও পালনকর্তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করাই মানুষের একান্ত কর্তব্য। এ পবিত্র কর্তব্য পালনে অবহেলা বা অনীহা বিশ্বমানবের জন্যে ধ্বংসের কারণ হয়। সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার যে হক্ব রয়েছে তথা মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের যে হক্ব বা অধিকার রয়েছে তা সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমেই মানবতার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হয়। মানুষকে মানুষ হিসেবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ এনে দেয়, তাই যে বা যারা সুবিচারের স্থলে অবিচার করে এবং করুণাময় আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম করুণা লাভ করা সত্ত্বেও তাঁকে অস্বীকার করে বা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করে, তারা সর্বশ্রেষ্ঠ জালেম, সবচেয়ে বড় অত্যাচারী।

ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় লক্ষ্যটি হলো সৃষ্টির প্রতি দয়া, আর এ দয়ার সূচনা হয় সুবিচার কায়েমের মাধ্যমে। তাই আলোচ্য আয়াতে এ নির্দেশ রয়েছে যে, যে কোন মূল্যে তোমরা সুবিচার কায়েম কর। যদি ন্যায় বিচার বা সুবিচারের প্রয়োজনে নিজের বা আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দিতে হয় বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় তবে তা-ও কর। আল্লাহ পাকের কালামের এ অংশে আল্লাহ পাকের হক্ব এবং বন্দার হক্ব যথাক্রমে উভয়ের হক্ব আদায়ের প্রতি তাগিদ রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে لقسط। শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ হলো, কোন কিছুতে কণা মাত্র এদিকে সেদিক না করা তথা বাড়াবাড়ি না করে সবার প্রতি যথাযথ ব্যবহার করাই হলো قسط, বাংলায় এর অর্থ করা যায় ইনসাফ বা সুবিচার। কারো সঙ্গে যত বিদ্বেষ এবং শত্রুতা থাকুক না কেন অথবা কারো প্রতি গভীর প্রেম ভালবাসা মুগ্ধ করে রাখুক না কেন, যে কোন অবস্থায় কোন প্রকার বাড়াবাড়ি না করা এবং ইনসাফের পাল্লা সমান করে রাখার তাগিদ রয়েছে এ আয়াতে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا

অর্থাৎ– হে মোমেনগণ! কোন সম্প্রদায়ের প্রতি তোমাদের শত্রুতা থাকলেও সুবিচার করতে হবে, অবিচার করা যাবে না। শত্রুর প্রতিও জুলুম করা যাবে না। ন্যায় বিচারের সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না। কোন নিহত মুশরেকের নাক-কান কর্তন করা যাবে না। মুশরেক নারীদের হত্যা করা যাবে না। পৌত্তলিক নারীদের প্রতি কোন প্রকার প্রমাণ ব্যতীত ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া যাবে না। তাদের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করা যাবে না।

اِعْدِلُوْا

পুনরায় তাগিদ করে এরশাদ হয়েছেঃ তোমরা সুবিচার কায়েম করতে থাক। জুলুম অত্যাচারের বাঁকা পথ পরিহার কর।

هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

অর্থাৎ ন্যায় বিচার তাকওয়া পরহেযগারীর সর্বাধিক নিকটবর্তী।

## তাকওয়া পরহেযগারী

অতএব, ন্যায় বিচার পেতে হলে বিচার প্রার্থী, সাক্ষী, বিচারক এক কথায় সবার তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করা পূর্বশর্ত। পবিত্র কোরআনে তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এমনকি, পবিত্র কোরআন থেকে হেদায়েত লাভের জন্যেও তাকওয়া পরহেযগারীকে পূর্বশর্ত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন সূরা বাকারার শুরুতেই এরশাদ হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

"এই কিতাব, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। এ কিতাব পথ প্রদর্শনকারী সেসব লোকদের জন্যে যারা তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করে"।

এমনিভাবে ঈমান লাভের পর তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করা একান্ত জরুরী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। একাধিক আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ

যে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যখন ঈমানের নেয়ামত নসীব হয়েছে তখন তাকওয়া পরহেযগারীও অবলম্বন কর কেননা, ঈমানের পরবর্তী পর্যায় হলো তাকওয়া পরহেযগারী অর্থাৎ যখন কোন মানুষ আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে তখন তার অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়, আর পরকালীন চিরস্থায়ী

জিন্দেগীর সাফল্য পরহেযগারী অবলম্বনকারীদের জন্যে সুনিশ্চিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ

(সূরা যুখরুফ)

অর্থাৎ– আখেরাত তোমার প্রতিপালকের নিকট পরহেযগার লোকদের জন্যেই। এমনকি, পবিত্র কোরআনে আল্লাহর ওলীদের যে পরিচয় বর্ণিত হয়েছে তাতেও বলা হয়েছে ঃ "তারা হবে সেসব লোক যারা সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে থাকে"। এরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ

"সাবধান! যারা আল্লাহর ওলী তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না। (কারা আল্লাহ্‌র ওলী?) সে সব লোক যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে এবং সর্বদা আল্লাহকে ভয় করতে থাকে তথা তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করতে থাকে"। এমনিভাবে পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছেঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

(সূরা আলে-এমরান)

"হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যতখানি ভয় করা উচিত আর প্রকৃত মুসলমান হওয়া ব্যতীত তোমরা মৃত্যুবরণ করোনা"।

কেননা, পরজীবনে ঈমান ও তাকওয়া পরহেযগারীই হবে একমাত্র সম্পদ, যা কল্যাণকর হবে।

আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ

(সূরা বাকারাহ)

"তোমরা সেই কঠিন দিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারো উপকার করতে সক্ষম হবে না, যেদিন কোন সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না, যেদিন কোন প্রকার সাহায্য লাভ করা যাবে না"।

অতএব, আল্লাহ্‌র ভয় হল এমনি একটি গুণ যা যাবতীয় সৎ কাজের উপকরণ হয়, আখেরাতের সম্বল সংগ্রহের সহায়ক হয় এবং আল্লাহ্‌র নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষার কারণ হয়। এজন্যে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেনঃ যারা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে তারাই আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় এবং প্রিয়। এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ (সূরা তওবা)

(নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক পছন্দ করেন সেসব লোককে যারা আল্লাহকে ভয় করে ও তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করে।) পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক একথাও ঘোষণা করেছেনঃ সে সব লোকই আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন যারা আল্লাহ পাককে অধিক পরিমাণে ভয় করে তথা অধিক পরিমাণে তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করে। এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰكُمْ (সূরা হুযুরাত)

তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহকে বেশী ভয় করে, যে অধিক পরিমাণে তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করে সে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন।

আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ (সূরা আরাফ)

অর্থাৎ শুভ পরিণাম শুধু পরহেযগার লোকদের জন্যে।

আরো এরশাদ হয়েছেঃ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ (সূরা শুআরা)

"তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তাঁর অনুগত হও"।

এখন প্রশ্ন হল যে তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের এত তাগিদ, তার সঠিক ব্যাখ্যা কি? ইসলামী শরীয়ত যেসব বিষয়কে সর্বনাশা, অবৈধ, অনিষ্টকর, অকল্যাণকর ঘোষণা করেছে সেগুলো থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে মোমেনের অন্তরে যে প্রেরণা থাকে এবং আল্লাহর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষার যে প্রয়াস ও প্রচেষ্টা থাকে, তারই নাম তাকওয়া পরহেযগারী। এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁর বক্ষ মোবারকের বাম দিক তথা কলবের প্রতি ইঙ্গিত করে এরশাদ করেছেনঃ

التقوى هٰهنا

কথাটি তিনি তিনবার বলেছিলেন। অর্থাৎ পরহেযগারী এখানে তথা অন্তরে। মানুষের অন্তরে যখন আল্লাহ্‌র ভয় সৃষ্টি হয় এবং তার পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা আসে, সে তখন আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করতে আন্তরিকভাবে প্রয়াসী হয়। যে কোন অবস্থায় সে আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী থেকে বাঁচার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করে। আত্মরক্ষার এ অনুভূতি এবং প্রয়াস ও প্রচেষ্টাই হল তাকওয়া পরহেযগারী।

হযরত ওমর (রাঃ) একবার হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাকওয়া পরহেযগারীর তাৎপর্য কি? তখন হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি কি কখনো এমন কাঁটাবনে হেঁটেছেন, যখন সর্বক্ষণ পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ হ্যাঁ, এমন স্থানেও আমার পদচারণা হয়েছে। এরপর হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ কাঁটাবনে কিভাবে হেঁটেছেন?

তিনি বললেনঃ কাঁটা বিদ্ধ হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহ্‌র নাফরমানী থেকে তথা পাপাচার থেকে এভাবে আত্মরক্ষা করার প্রচেষ্টার নামই হল তাকওয়া পরহেযগারী।

বস্তুতঃ সকল সৎ কাজের মূল উৎসই হল তাকওয়া পরহেযগারী । যে আল্লাহকে ভয় করে সে ন্যায় পরায়ণতার নীতি অবলম্বন করে, এজন্যে আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

অর্থাৎ– আদল বা ন্যায়পরায়ণতা তাকওয়া বা পরহেযগারীর নিকটতম।

সাধারণতঃ মানুষের মনে কারো প্রতি ভালবাসা থাকে আর একই সঙ্গে কারো প্রতি বিদ্বেষও থাকে, কিন্তু সুবিচার কায়েমের ক্ষেত্রে যে জিনিসটি মানব মনকে বিদ্বেষ ও ভালবাসার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে পারে তা হল মানব মনে সংরক্ষিত আল্লাহ্‌র ভয়। কেননা, একথা চিরন্তন সত্য যে, আল্লাহ্ পাক আমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন থাকে না, আর তিনি কৃতকর্ম ভাল হলে পুরষ্কার, মন্দ হলে শাস্তি বিধান করবেন। তাই আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে পুনরায় আল্লাহ্‌কে ভয় করার তাগিদ করে এ সম্পর্কে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, নির্দেশ পালনে এবং নিষিদ্ধ কাজ বর্জনে আল্লাহকে ভয় করতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে নেককারদের জন্যে সওয়াবের অঙ্গীকার রয়েছে। পরবর্তী বাক্যে আরো সুস্পষ্ট ভাষায় বিষয়টিকে ঘোষণা করা হয়েছে–

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ الاية

আল্লাহ্ পাক অঙ্গীকার করেছেন যে, যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে তাদের জন্যে রয়েছে মাগফেরাত এবং মহান সওয়াব, বিরাট পুরষ্কার।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ

অর্থাৎ যারা কাফের হবে, যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করবে, সত্যের দিশারীকে অসত্য মনে করবে এবং সত্যের আহবানকে উপেক্ষা করবে, দোযখের অনলকুণ্ড হবে তাদের শোচনীয় পরিণাম, তারা হবে দোযখবাসী।

## আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াতে মোমেনদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে ন্যায় বিচার কায়েম করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সত্য সাক্ষ্য প্রদানের বিশেষ তাগিদ রয়েছে। এরপর মুসলমানদেরকে একটি বিশেষ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে তোমাদের শত্রুতা থাকে, যেমন কাফেরদের সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই শত্রুতা থাকে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও কাফেরদের প্রতি ন্যায় বিচার করতে তোমরা শৈথিল্য করোনা। কি বিস্ময়কর এ ব্যবস্থা! এটি যে আল্লাহ্‌র বিধান তাই এর এ বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর কোন সংবিধান, কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তার বিদ্রোহীদের প্রতি ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা রাখে না। কিন্তু আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে মুসলমানদেরকে হুকুম দিচ্ছেন, কেউ কাফের হতে পারে, হতে পারে তোমাদের পরম শত্রু কিন্তু তার কুফরী বা শত্রুতা ন্যায় বিচার থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারে না।

আল্লামা কুরতবী তাই লিখেছেনঃ

دلّت الاية ان كفرالكافر لايمنع من العدل عليه

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, তার কুফরী তাকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করেনা।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, কারো কুফরী যখন তাকে ন্যায়বিচার থেকে মাহরূম হতে দেয় না, এর চেয়ে কম পাপে যারা লিপ্ত, তাদের প্রতিও জুলুম করা বৈধ হয় না। তারাও ন্যায় বিচারের হক্বদার।

অতএব, যে কোন মূল্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করাই হল মোমেনের একান্ত কর্তব্য। ইসলাম মানব জীবনের কল্যাণ সাধনের আহবান জানায়। এমনকি যখন মানুষ ক্রোধান্বিত হয় তখনও সে যেন সীমালঙ্ঘন না করে তার তাগিদ করে ইসলাম। তাই কাফের বা পাপাচারী কাউকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত না করার নির্দেশ করেছে এ আয়াতে।

হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা থানবী (রঃ) লিখেছেন, দৈনন্দিন কর্মজীবনে মানুষ অনেক সময় নিজের মেজাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এ আয়াতে মেজাজকে নিয়ন্ত্রণ করার, নিজেকে সুসংযত, সুসংহত ও সুশৃংখল করার তাগিদ রয়েছে।[১]

অতঃপর এ আয়াতে তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করার নির্দেশ রয়েছে। এর পাশাপাশি একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য-সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত, অতএব জীবনের সকল অবস্থায় তাঁকে ভয় করতে থাক।

এরপর যারা ঈমানদার ও নেককার তাদের পুরষ্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা পাপিষ্ঠ, যারা কাফের ও বদকার, যারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করে তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তারা হবে দোযখবাসী, তাদের জন্যেই তৈরী হয়েছে দোযখ। কেননা, তারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনেনি, তাঁর সাথে শেরক করেছে, তাঁর বিধান সমূহকে অস্বীকার করেছে, এটি এত বড় জুলুম, এর চেয়ে বড় কোন জুলুম হতে পারে না। তাই দোযখের কঠিন শাস্তি প্রদানই তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের ন্যায়বিচার, আর তাঁর প্রত্যেকটি কাজই হেকমতপূর্ণ।[২]

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৩৯-৪০
২। তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০৪

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ
عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ
فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١١﴾

**তরজমা**

(১১) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার যে নেয়ামত রয়েছে তা স্মরণ কর, যখন একদল লোক তোমাদের উপর তাদের হস্ত প্রসারিত করার ইচ্ছায় মেতে উঠেছিলো, তখন আল্লাহ্ পাক তোমাদের উপর থেকে তাদের হাত নিবৃত্ত করেছিলেন, আর আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক, আর মোমেনদের আল্লাহ্ পাকের উপরই ভরসা করা উচিত।

## তফসীরুল কোরআন

### শানে নুযুল

আল্লামা বগভী (রঃ) মুজাহেদ, একরামা, কালবী এবং এবনে বাশারের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত মুনজের এবনে ওমর সায়েদীকে মোহাজের ও আনসারদের ৩০ জনের একটি দলের সঙ্গে বনী আমের এবনে সা'অসাআর নিকট ইসলামের তবলীগের জন্যে প্রেরণ করলেন।

উল্লেখ্য, হিজরতের পূর্বে মদীনা শরীফ থেকে যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় হাযির হয়ে তাঁকে মদীনা শরীফে আগমনের দাওয়াত পেশ করেছিলেন, মুনজের এবনে ওমর তাঁদের অন্যতম ছিলেন।

যাহোক তাঁরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশক্রমে বনি আমেরের 'বীরে মাউনা' নামক কূপে উপস্থিত হলেন, সেখানে বনি আমের এবনে তোফায়েলের সঙ্গে তাদের মোকাবিলা হল। বনি আমের তাদের সঙ্গে প্রতারণা করল,

সকলকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল, তাদের মধ্যে লড়াই হল, পরিণামে হযরত মুনজের (রাঃ) এবং তাঁর সাথীগণ শাহাদাত বরণ করলেন। ৩০ জনের মধ্যে শুধু ৩ জন মুসলমান জীবিত রইলেন, যারা হারানো উষ্ট্রের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন আমর এবনে উমাইয়া জমিরী। তারা দেখলেন, আকাশে পাখি উড়ন্ত অবস্থায় রয়েছে। তাদের ঠোট থেকে জমাট রক্তের টুকরো মাটিতে পড়ছে।

এ দৃশ্য দেখে তাঁদের একজন বললেন, আমাদের সাথীগণকে শহীদ করা হয়েছে, একথা বলে নিজের দলের দিকে দ্রুতবেগে রওয়ানা হলেন। পথে এক ব্যক্তির সঙ্গে মোকাবেলা হল এবং কাফেরের আঘাতে একজন মুসলমান শহীদ হলেন। তিনি ধরাশায়ী অবস্থায় আসমানের দিকে তাকালেন, চক্ষু খুললেন এবং বললেন, আল্লাহ আকবর, রব্বুল আলামীনের শপথ! আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি। তাঁর দু'জন সাথী তখন পৌঁছলেন, তাদের সঙ্গে লড়াই হল বনি সলিম গোত্রের দু'জন ব্যক্তির সঙ্গে। বনি সলিম গোত্র বনি আমের গোত্রেরই একটি শাখা ছিল, বনি সলিমের এ দু'জনকে কাফের ভেবে তারা উভয়ে তাদের দু'জনকে হত্যা করলেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এই যে, ইতিপূর্বে বনি সলিম গোত্রের সঙ্গে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একটি শান্তি চুক্তি হয়েছিলো যে কারণে বনি সলিম গোত্রের লোকেরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হয়ে তাদের গোত্রের দু'জন নিহত ব্যক্তির রক্ত পণ দাবী করল, রক্তপণের জন্যে যে টাকা পয়সার প্রয়োজন ছিল তার আয়োজনের জন্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ) এবং হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে ইহুদী কা'ব এবনে আশরাফ এবং বনি নজির গোত্রের নিকট গমন করলেন, যেন মুক্তিপণ আদায়ের ব্যাপারে তাদের নিকট থেকে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করা যায়। কেননা, তারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এ চুক্তি করেছিলো যে, মুসলমান এবং ইহুদীদের মধ্যে যুদ্ধ হবে না। যদি মুসলমানদের প্রয়োজন হয় তবে রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে তারা মুসলমানদেরকে সাহায্য করবে।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা শ্রবণের পর ইহুদীরা বললঃ হে আবুল কাসেম! এখন সময় এসেছে যে আপনি আমাদের নিকট প্রয়োজনের কথা বলবেন, ঠিক আছে, আপনি বসুন, প্রথমে আপনাদের মেহমানদারী করব, এরপর যা চাইবেন তা আদায় করব। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের ঘরে বসলেন।

এদিকে ইহুদীরা পরস্পর পরামর্শ করল এবং বলল- মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আজ তোমাদের যত নিকটে এসেছেন, এরপর ভবিষ্যতে আর এত নিকটে আসবেন না, যদি কেউ এমন হত যে, ঘরের ছাদের উপরে উঠে একটি

বড় পাথর মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) প্রতি নিক্ষেপ করত, তাহলে সর্বকালের জন্যে আমরা শাস্তি পেতাম।

আমর এবনে জাহাশ নামক এক দুর্বৃত্ত বলল, আমি এ কাজটি করব এবং ঐ দুর্বৃত্ত এ অসৎ উদ্দেশ্যে গমন করল। কিন্তু আল্লাহ্ পাক ইহুদীদের হাত বেঁধে দিলেন। জীব্রাঈল (আঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়্যারা প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসলেন এবং হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেনঃ তুমি স্বস্থানে থাক এবং আমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ যদি আমার কথা জিজ্ঞাসা করে তবে তুমি বলবে, তিনি মদীনা শরীফে গমন করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) এ আদেশ পালন করেন। এরপর সাথীগণ একে একে সবাই বের হয়ে আসলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল বর্ণনা করেছেন ইমাম রাজী (রঃ) তফসীরে কবীরে এবং আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) তফসীরে মাজহারীতে।[১]

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে আরো একটি ঘটনা বর্ণনা দিয়েছেন আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এবং আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ)।

হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, 'যাতুররেকা' এর জেহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এক স্থানে বিশ্রাম করলেন, যে যেখানে সুযোগ পেয়েছেন বৃক্ষতলে অথবা পাহাড়ের পাদদেশে বিশ্রাম করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তরবারীটি একটি বৃক্ষে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় এক দুশমন এসে তাঁর তরবারীটি হাতে নেয় এবং তাঁকে সম্বোধন করে বলল- এখন আপনাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? তিনি জবাব দিলেন- আল্লাহ্ পাক। একথা সে একাধিক বার বলল, তিনিও প্রতিবারই একই জবাব দিলেন। এরই মধ্যে হযরত জীব্রাঈল (আঃ) অবতরণ করলেন এবং তার বুকে আঘাত দিলেন। ফলে তার হাত থেকে তরবারী ছুটে গেল, সে মুহূর্তে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তরবারী হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এবার তোমাকে কে রক্ষা করবে? সে বলল কেউ নয়। তখন তিনি তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, চলে যাও এবং তার কোন শাস্তির ব্যবস্থা করলেন না। এ অবস্থায় সে ইসলাম কবুল করল, তার কারণে আরো কিছু লোক হেদায়েত লাভ করল, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[২]

---

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪১৬-১৭
তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৮৩
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৮৪-৮৫

২। তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০৫
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৬ খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৫৬-৫৭

## আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে স্মরণ কর

ইমাম রাজী (রঃ) সহ অন্যান্য তফসীরকারগণ এ আয়াত সম্পর্কে একথাও বলেছেন যে, এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক মুসলমানদেরকে আল্লাহ পাকের একটি বিশেষ নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, হে মোমেনগণ! যখন তোমরা মক্কার বুকে ছিলে তখন তোমরা ছিলে উৎপীড়িত, নির্যাতীত। কাফেররা তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার সর্বাত্মক অপচেষ্টা করেছে। সেই মহাবিপদের সময় আল্লাহ পাকই তোমাদের রক্ষা করেছেন। তাদের সকল চক্রান্ত তিনি ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের কোন চেষ্টাই সফল হয়নি। আজ আল্লাহ্‌র রহমতে তোমরা বিজয় লাভ করেছ, তোমরা একটি শক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়েছ, ইসলামের দুশমনের উপর তোমাদের ক্ষমতা এবং আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অতএব, তোমরা আল্লাহর সেই নেয়ামতকে ভুলে যেয়ো না, আত্মবিস্মৃত হয়ো না। তোমাদের অতীতকেও ভুলে যেয়ো না, প্রতিশোধ প্রবৃত্তির কারণে ন্যায়-নীতি বিচ্যুত হয়োনা। ন্যায় বিচার কায়েম কর, আত্মসংযমের গুণ অর্জন কর, সীমা লঙ্ঘন করোনা। মনে রেখো, শক্তি লাভের পর শক্তির যথাযথ ব্যবহারই হলো তার শোকর গুজারী। আর আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাক। আল্লাহর ভয়ের মধ্যেই রয়েছে মুসলিম জাতির সাফল্য নিহিত। যদি তোমরা মনে কর যে, শত্রুর প্রতি উদার নীতি অবলম্বন করলে তার দুঃসাহস বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে আর এমন চিন্তা অস্বাভাবিকও নয়, এমন অবস্থায় তোমাদের একান্ত কর্তব্য হলো পরম পরাক্রমশালী আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ভরসা করা। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

"আর মোমেনদের আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা করা উচিত এবং আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রকাশে তাদের সুদৃঢ় থাকা উচিত"।

অতএব আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে তোমরা ভয় করোনা, ভয় কর শুধু এক আল্লাহ্‌কে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের আনুগত্য প্রকাশ করতে থাক এবং তাঁর প্রতিই ভরসা রাখ।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ইহুদীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর কয়েকজন সাহাবীকে

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৮৩
ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১৪০

হত্যা করার উদ্দেশ্যে বিষ মিশ্রিত খাবার তৈরী করে দাওয়াত দেয়। কিন্তু আল্লাহ পাক পূর্বেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সতর্ক করেন, ফলে তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়।

আর একথাও বর্ণিত আছে যে, ইহুদীদের সর্দার কাব এবনে আশরাফ তার বাড়ীতে তাঁকে দাওয়াত দেয় এবং তাঁকে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু আল্লাহ্ পাক তাঁকে রক্ষা করেন।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) অন্যান্য ঘটনার পাশাপাশি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আরো একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

আবু নাঈম 'দালায়েলুন নবুওয়্যত' গ্রন্থে হাসান বসরী (রঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, বনি মহরব গোত্রের গোয়াইরাস এবনে হারেস নামক ব্যক্তি তার সম্প্রদায়কে বলে- আমি মোহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হত্যা করে ফেলি। এই বলে সে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হলো। তাঁর নিকট তখন একটি তরবারী ছিল। সে বললো, আপনার তরবারীটি একটু দেখতে পারি?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার দিকে তরবারী বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, দেখ! গোয়াইরাস তরবারী হাতে নিয়ে খাপ থেকে বের করলো এবং নড়াচড়া করলো লাগলো। তার অন্তরে তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা প্রবল হলো। কিন্তু আল্লাহ পাক তাকে অপমানিত করছিলেন। সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বললোঃ আপনার কি ভয় লাগে না যে, আমার হাতে নগ্ন তরবারী রয়েছে?

তিনি এরশাদ করলেন নাঃ সে বলল আমার নিকট যে তরবারী রয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আল্লাহ পাক আমাকে হেফাজত করবেন। একথা শ্রবণ করে সে তরবারীটি খাপে রেখে দিল এবং তাঁর নিকট ফেরত দিল।

এ বর্ণনায় একথাও রয়েছে যে, এ ঘটনা ঘটে তখন যখন সাহাবায়ে কেরাম কাফের গোত্র বনী গাদফানকে ঘেরাও করে রেখেছিলেন।[২]

আল্লামা আলুসী (রঃ) হযরত যাবের (রাঃ) কতৃক বর্ণিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, আসফান নামক স্থানে হযরত

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৬ খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৬৬
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪১৮
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪১৮

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে জোহরের নামাজ আদায় করছিলেন। কাফেররা এ দৃশ্য দেখে আক্ষেপ করতে থাকে এজন্যে যে, মুসলমানগণ যখন নামাজে ছিলেন তখন তাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে বিরাট ক্ষতি সাধন করা সম্ভব হতো। কিন্তু তারা এ সুযোগ হারানোর কারণে আক্ষেপ করতে লাগলো। অবশেষে এ সংকল্প করলো যে, আসরের নামাজে যখন মুসলমানগণ দাঁড়াবেন তখন তারা হামলা করবে। আল্লাহ পাক তাদের এ ষড়যন্ত্রের কথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিলেন এবং সালাতুল খওফের বিধান দান করলেন (যুদ্ধরত অবস্থায় নামাজের বিধান)।[১]

إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ

অর্থাৎ-যখন কাফেরদের এক দল হত্যা করার জন্যে তোমাদের দিকে হস্ত প্রসারিত করেছিল তখন আল্লাহ পাকই তোমাদের থেকে তাদের হাতকে নিবৃত্ত করেছিলেন এবং তোমাদেরকে তাদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

অতএব, তোমরা আল্লাহ তায়ালার এ নেয়ামতকে স্মরণ কর যে, তিনি অতি সংকটময় মুহূর্তে তোমাদেরকে দুশমনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন। যারা তোমাদেরকে গাফলতের অবস্থায় হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল, আল্লাহ পাক তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে তোমাদের প্রতি বিরাট এহসান করেছেন। অতএব, তোমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের শোকর গুজার হওয়া। তোমাদের শক্তি অর্জন করতে হবে, জেহাদে তৎপর হতে হবে। তবে তোমাদের নিজেদের শক্তির উপর ভরসা করবে না। এ শক্তির কারণে অহংকার করবে না, বরং ভরসা রাখবে এক আল্লাহ পাকের প্রতি। তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল করেন। তিনিই তোমাদের হেফাজত করেন। অতএব, ভরসা শুধু তাঁর প্রতি, আশা শুধু তাঁর নিকট। আর ভয় শুধু তাঁকেই করতে হবে।

যেভাবে আল্লাহ পাক দুশমনের আক্রমণ থেকে এখন তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন ঠিক তেমনি ভবিষ্যতেও তিনিই রক্ষা করবেন। এ পর্যায়ে তোমাদের দু'টি কর্তব্য ঃ

وَاتَّقُوا اللَّهَ

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক।

১। তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৮৪
তফসীরে নূরুল কোরআনের ৫ম খন্ডের ১৯৮ পৃষ্ঠায় সালাতুল খওফের বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

আর আল্লাহ পাকের প্রতিই মোমেনদের ভরসা করা উচিত।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) লিখেছেন, পবিত্র কোরআন মানুষকে সকল প্রকার ভয়-ভীতি পরিহার করে শুধু আল্লাহ পাককে ভয় করার শিক্ষা দেয়। এমনিভাবে পবিত্র কোরআন মানুষকে সকল ক্লীবতা, জড়তা, নিষ্ক্রীয়তা বর্জন করে কর্ম তৎপরতার নীতি অবলম্বনের তাগিদ করে। কিন্তু পবিত্র কোরআন এর অনুমতি দেয় না যে, মানুষ শুধু উপায়-উপকরণ বা নিজের প্রস্তুতির উপরই নজর রাখবে, বরং পবিত্র কোরআন বলে তোমার সর্বপ্রকার প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও নজর রাখতে হবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের প্রতি। তিনিই তোমাদের সকল সমস্যার সমাধান করেন। অতএব তাঁকেই ভয় করতে হবে এবং তাঁর প্রতিই ভরসা রাখতে হবে।[১]

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ
وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا ۭ وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ ۭ
لَىِٕنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ
بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا
لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ⑫

তরজমা

(১২) নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক বনী ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মধ্য থেকে বার জন নেতা নির্বাচন করেছিলেন এবং আল্লাহ্ তায়ালা বলেছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি, যদি তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত আদায় কর এবং আমার রসূলগণকে বিশ্বাস কর ও তাদেরকে সাহায্য কর

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৪২

এবং আল্লাহ তায়ালাকে উত্তম করজ প্রদান কর (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাহে উত্তম বস্তু এবং তোমাদের প্রিয়তম বস্তু ব্যয় কর) তবে অবশ্যই আমি তোমাদের গুনাহ সমূহকে দুরীভূত করব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাব যার নিম্নদেশে নহ্‌র সমূহ প্রবাহিত হয়। (কিন্তু এ প্রকাশ্য ঘোষণার পরও) যারা কাফের হয়েছে তারা অবশ্যই সরল সত্য পথ থেকে দূরে সরে পড়েছে।

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্‌ পাকের নেয়ামত এবং মুসলমানদের নিকট থেকে গৃহীত আল্লাহ পাকের অঙ্গীকারের কথা ছিল আর এ আয়াতে পূর্ববর্তী উম্মত থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিল এবং সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারণে তাদের যে শোচনীয় পরিণাম হয়েছে তার উল্লেখ রয়েছে। এতদ্বারা মুসলমানদের সতর্ক করা হচ্ছে, যদি তোমরা বনী ইসরাঈলের মত আল্লাহর বিধান অমান্য কর, তবে বনী ইসরাঈলের মত তোমাদের শাস্তিও অবধারিত। হে মুসলমানগণ! তোমরা একথা মনে করোনা যে, আল্লাহ পাক শুধু তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন বরং ইতিপূর্বে অন্যান্য উম্মত থেকেও এমনি অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। অতএব, তোমাদের কর্তব্য হল আল্লাহ্‌ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করা তথা তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে চলা।[১]

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক মুসলমানদেরকে আল্লাহ্‌ পাকের বিশেষ নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, দুশমন যখন তোমাদের প্রতি হামলায় উদ্দত ছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তখন আমি তোমাদেরকে রক্ষা করেছি, আর এ দুশমন ছিল কুখ্যাত ইহুদী সম্প্রদায়। আলোচ্য আয়াতে এ ইহুদীদের সম্পর্কে আরো তথ্য পেশ করা হয়েছে যে, ইহুদীদের চরিত্রহীনতা, অপকর্ম, অন্যায় আচরণ, নিষ্ঠুরতা নতুন কিছু নয়, এদের পূর্ব পুরুষও ছিল অত্যন্ত মন্দ চরিত্রের। হযরত মূসা (আঃ) তাদের থেকে ১২ জন নেতা নির্বাচন করেছিলেন, যখন ফেরাউনের চরম জুলুম-অত্যাচার থেকে আল্লাহ্‌ পাক তাদেরকে নাজাত দিয়েছিলেন তখন তাদের থেকে আল্লাহ্‌ পাক কিছু অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এ দূরাত্মা সম্প্রদায় সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং আল্লাহ্‌র কোপগ্রস্ত হয়েছে।

১। তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন–কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩০৭

## অঙ্গীকার ভঙ্গ করার শাস্তি অবধারিত

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, অঙ্গীকার ভঙ্গের শাস্তি যেমন অবধারিত তেমনি ভয়াবহ। আল্লাহ্ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ হলে তার শাস্তি অবধারিত। পবিত্র কোরআন এ পর্যায়ে বিশ্ব মানবকে সতর্ক করেছে যে, অঙ্গীকার যদি মানুষের সাথেও করা হয় তবে তা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। যদি কেউ এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তবে দুনিয়াতে অপমান, আখেরাতে শাস্তি অবধারিত। যেমন পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এ সম্পর্কে তাগিদ করে এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا

"নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে"।

## আয়াতের মর্মকথা

ইমাম রাজী (রঃ) এ পর্যায়ে বলেছেন, এ আয়াতের মর্মকথা হল মানুষকে আল্লাহ্র হুকুম পালনে উদ্বুদ্ধ করা এবং আল্লাহ্র নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে প্রস্তুত করা। তাই আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে এরশাদ করেছেন যে, পূর্বকালে যারা পৃথিবীতে এসেছিলো তাদেরকেও এভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু তারা সেই আদেশ লঙ্ঘন করার কারণে আল্লাহ পাকের শাস্তি ভোগ করেছে। অতএব, আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ নতুন কিছু নয়, বরং যুগে যুগে মানব জাতির প্রতি এমনিভাবে এসেছে আসমানী ফরমান, যারা সে ফরমান মেনে চলেছে তাদের জীবন-সাধনা সার্থক হয়েছে, কিন্তু যারা সেই ফরমান অমান্য করেছে তারা শাস্তি ভোগ করেছে, এটিই আল্লাহ পাকের অমোঘ বিধান।[১]

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ج

অর্থাৎ- ফেরাউনের গোলামী থেকে বনী ইসরাঈলেকে নাজাত দেয়ার পর আল্লাহ্ পাক তৌরাত নাযিল করলেন, এরপর বনী ইসরাঈল থেকে একটি অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন।[২]

وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا ط

বনী ইসরাঈলরা যেন আল্লাহ্ পাকের বিধান যথাযথভাবে পালন করে তা তদারক করার জন্যে তাদের থেকে বারজন নেতা নির্বাচন করা হয়েছিলো, তারা পয়গম্বরের আদেশ মোতাবেক কল্যাণকর কাজের নির্দেশ দিত এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখত।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৮৩-৮৪
২। এ অঙ্গীকারের বিস্তারিত বিবরণ তফসীরে নূরুল কোরআনের ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪০২-০৫ দ্রষ্টব্য

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, হিজরতের পূর্বে আনসারদের যে দলটি মক্কায়ে মোয়াজ্জমার অদূরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দস্তে মোবারকে বয়আত করেছিলেন, তাঁদেরও ১২ জন নেতা ছিলেন। ৩ জন ছিলেন আওস গোত্রীয়, আর ৯ জন ছিলেন খাজরাজ গোত্রীয়। আওস গোত্রীয় ৩ জন হলেন (১) হযরত উসায়েদ এবনে হেজায়ের (রাঃ) (২) হযরত সা'দ এবনে খায়ছামা (রাঃ) এবং (৩) হযরত রোফা এবনে আবদুল মুনজের (রাঃ)।

কোন কোন বর্ণনায় তাঁর স্থলে হযরত আবুল হাইছেম এবনে তাইহান (রাঃ)-এর নাম উল্লেখিত হয়েছে। আর খাজরাজ গোত্রের ৯ জন নেতা হলেন (১) আবু উমামা আসআদ এবনে জুরারাহ (রাঃ) (২) সা'দ এবনে রবী (রাঃ) (৩) আবদুল্লাহ এবনে রওয়াহা (রাঃ) (৪) রাফে এবনে মালেক এবনে আজলান (রাঃ) (৫) বরা এবনে মারুর (রাঃ) (৬) ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) (৭) সাদ এবনে ওবাদা (রাঃ) (৮) আবদুল্লাহ এবনে আমর (রাঃ) এবং (৯) মুনজের এবনে আমর এবনে হোনায়েস (রাঃ)। তাঁদের প্রত্যেকে নিজেদের সম্প্রদায়ের তরফ থেকে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দস্তে মোবারকে বয়আত করেছেন এবং তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ অনুকরণের অঙ্গীকার করেছেন।[১]

## একটি বিরল সুসংবাদ

وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّیْ مَعَكُمْ ط

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি। নিঃসন্দেহে এটি একটি বিরল সুসংবাদ। কিন্তু প্রশ্ন হলো আল্লাহ্ পাকের একথা কার উদ্দেশ্যে? এ ১২ জন নেতার উদ্দেশ্যে, না সমগ্র বনী ইসরাঈল জাতির জন্য। তফসীরকারগণ এর জবাবে বলেছেন, উভয় অর্থই এখানে হতে পারে। তবে ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেন, এ পর্যায়ে প্রথম অর্থই উত্তম অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক ১২ জন নেতাকেই বলেছেন যে, "আমি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি"।

"আল্লাহ পাক সঙ্গে আছেন" একথার উপলব্ধি একজন মুসলমানের জন্যে কত বড় আনন্দদায়ক সুসংবাদ তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কেননা, বর্তমান যুগে সামান্য কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তি যদি কোন দরিদ্র মানুষকে বলে চিন্তা করোনা, আমি তোমার সঙ্গে আছি, তবে তার আনন্দের সীমা থাকে না। আর যেখানে আহকামুল হাকেমীন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেনঃ আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি এর চেয়ে বড় সুসংবাদ আর কী হতে পারে!

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৬ খন্ড-৭ পৃষ্ঠা-৬৭

## সুসংবাদের শর্ত সমূহ

এ সুসংবাদের জন্যে পাঁচটি শতারোপ করা হয়েছে–

(১) যদি তোমরা নামাজ কায়েম কর – لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ

(২) এবং যদি তোমরা যাকাত আদায় কর – وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ

(৩) আর আমার সমস্ত রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর – وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ

(৪) এবং রসূলগণকে যদি সাহায্য কর – وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ

(৫) আর যদি আল্লাহ্ পাককে 'করজে হাসানাহ' দান কর – وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا

তবে আমি অবশ্যই তোমাদের গুনাহ সমূহ দূরীভূত করব।

এ পর্যায়ে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। প্রথমতঃ আল্লাহ পাক তাঁর নৈকট্য-ধন্য হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম শর্তারোপ করেছেন-নামাজ কায়েম কর। এতদ্বারা হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক্ব আদায়ের প্রতি তাগিদ রয়েছে। অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অর্পিত দায়িত্ব সমূহ যথাযথভাবে পালন কর তবে নিশ্চিত ভাবে জেনে রেখ, আল্লাহ পাক তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন, তিনি তোমাদের নিকট থেকে দূরে নন। গোপন ও প্রকাশ্য তাঁর নিকট সবই সুস্পষ্ট। অতএব, তোমরা আল্লাহ্ পাকের হক্ব আদায়ে তৎপর থাক।

দ্বিতীয় শর্ত হলো যাকাত আদায় করা। এতদ্বারা "হক্কুল এবাদ" বা বন্দার হক্ব তথা যাবতীয় হক্ব আদায়ের তাগিদ এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আর তৃতীয় শর্ত হলো আল্লাহ পাকের সমস্ত নবী রসূলগণের প্রতি ঈমান আনা। কোন নবীকে মানব আর কোন নবীকে মানব না-এ সর্বনাশা নীতি অচল। যেমন ইহুদীরা হযরত মূসা (আঃ)-কে মানে কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ)-কে মানে না, এমনকি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মানে না। খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে রসূল হিসেবে মানে না, তাঁর সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। আর চতুর্থ হলো সমস্ত রসূলগণের প্রতি শুধু যে অকুণ্ঠ চিত্তে ঈমান আনবে তাই নয়, বরং তাঁদের দুশমনদের মোকাবেলায় তাঁদেরকে সর্বপ্রকার সাহায্য করবে।

পঞ্চম শর্ত হলো আল্লাহ দ্বীন রক্ষায়, জেহাদে, নবী রসূলগণের সহায়তায়, দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং প্রতিষ্ঠায় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবে। আর তা নিতান্ত নিঃস্বার্থভাবে এক আল্লাহর সন্তুষ্টির লাভের উদ্দেশ্যে, এ কাজটিকে 'করজে হাসানাহ" বলে অভিহিত করা হয়েছে।

মূলত প্রত্যেক ভাষারই কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা অন্য ভাষায় অভিনব মনে হয়।

আরবী ভাষায় "করজ" শব্দটির অর্থ হলো "সেই ধন-সম্পদ যা কিছু দিন পর গ্রহণকারীকে অবশ্যই ফেরত দিতে হয়"। আভিধানিক ভাষায়ঃ

ما يدفع الى الانسان من المال بشرط رد من له قرضا

(রাগেব)

যেহেতু আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর রাহে দান করলে, আল্লাহ পাক দানের বিনিময় বা শুভ পরিণতি অবশ্যই দান করবেন। তাই আল্লাহ রাহে দানকে "করজ" বলা হয়েছে। আর قرض শব্দটি ব্যবহার করে একথা বলা হয়েছে যে, এ দান অবশ্যই এখ্লাস বা আন্তরিকতা পূর্ণ হতে হবে। শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই হতে হবে।

এ সমস্ত শর্ত যারা পূরণ করবে তাদের জন্যে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ

"আল্লাহ পাক তাদের গুনাহ সমূহ দূরীভূত করবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন"।

## লক্ষ্যনীয় বিষয়

লক্ষ্যনীয়, যারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলগণের প্রতি অকুণ্ঠ চিত্তে ঈমান আনবে, আল্লাহ্র হক্ব ও বন্দার হক্ব যথাযথভাবে পালন করবে, তাদের শুভ পরিণতি বা সওয়াব তারা আখেরাতে লাভ করবে। অতএব একথা সুস্পষ্ট যে, পবিত্র কোরআন আখেরাতের জিন্দেগী তথা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে। এর পাশাপাশি ঈমান ও নেক আমলের বিনিময়ে দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীতেও সুফল লাভ করা যায় এর ঘোষণাও রয়েছে পবিত্র কোরআনে।[১]

فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ

অর্থাৎ- এত সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় অঙ্গীকারের পরও যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে না, যারা হবে অবাধ্য অকৃতজ্ঞ, যারা করবে বিশ্বাসঘাতকতা, তারা হবে পথভ্রষ্ট, শান্তি ও সাফল্যের পথ থেকে তারা চিরতরে দূরে সরে যাবে।

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৪৩

তরজমা

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ
لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ
عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ
تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ
عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣﴾
وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ
فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۠ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ وَسَوْفَ
يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١٤﴾

(১৩) শুধু অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুণ তাদের উপর লা'নত করেছি এবং তাদের অন্তর সমূহকে পাষাণ করে দিয়েছি। তারা আমার বাণীকে তার নির্দিষ্ট স্থান থেকে পরিবর্তন করে এবং তাদেরকে যে নসিহত করা হয়েছিল তার একটা বিরাট অংশ তারা ভুলে বসেছে এবং (হে রসূল!) আপনি সর্বদা তাদের অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত আর সবারই বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে অবগত আছেন। অতএব, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং উপেক্ষা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক নেককার লোকদেরকে ভালবাসেন।

(১৪) এবং যারা বলে থাকে যে, আমরা নাসারা, আমি তাদের নিকট থেকেও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি। কিন্তু তাদেরকে যে উপদেশ প্রদান করা হয়েছিল তারও এক বিরাট অংশ তারা ভুলে যায়। পরিণামে তাদের পরস্পরের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক রেখেছি এবং অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে তাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে অবগত করাবেন।

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে বনী ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার গ্রহণের কথা বলা হয়েছিল। এ আয়াতে তাদের সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কথা এরশাদ হয়েছেঃ

বনি ইসরাঈলীদের সুদৃঢ় অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারণে আমি তাদের প্রতি লা'নত করেছি। তাদেরকে আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হয়েছিল কিন্তু তারা তাঁদেরকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে। এমনকি কোন কোন নবীকে তারা হত্যাও করেছে। দ্বিতীয়ত, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে গুণাবলী তৌরাতে উল্লেখিত হয়েছে এবং তৌরাতের মাধ্যমে তারা সে সম্পর্কে অবগত হয়েছে। কিন্তু সে গুণাবলী তারা গোপন করেছে, তাই আল্লাহ পাক তাদের প্রতি লা'নত করেছেন।

## লা'নতের তাৎপর্য

আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলকে লা'নত করেছেন, এর তাৎপর্য সম্পর্কে তফসীরকার আতা (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ তাদেরকে রহমত থেকে মাহরুম করা এবং হাসান ও মোকাতেলের (রঃ) মতে, লা'নতের তাৎপর্য হলো তাদের আকৃতি বিকৃত করা। তাই তাদরে কোন কোন লোককে শুকর ও বানরে পরিণত করা হয়।

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর তাৎপর্য হলো তাদের উপর জিযিয়া বা অমুসলিম করারোপ করা। এ মত প্রকাশ করেছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)।[১]

## আয়াতের মর্মকথা

অতএব, আয়াতের মর্মকথা হলো, যেহেতু খৃষ্টানরা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে এবং ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ) এবং প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এবং অন্যান্য নবীগণের সত্যতা অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহ পাকের প্রেরিত আসমানী কিতাব সমূহ অমান্য করেছে এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অর্পিত কর্তব্য সমূহ পালনে বিমুখ হয়েছে তাই আল্লাহ পাক তাদের প্রতি লা'নত দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বরং–

وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً

তাদের হৃদয়কে পাষাণ করে দিয়েছেন। আর তাদের এ পাষান চিত্ততার কারণ হলো, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। আল্লাহ পাক তাদেরকে তাঁর রহমত থেকে বিতাড়িত করেছেন। তাই তাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে। যেহেতু তারা কোন প্রকার নসিহত গ্রহণ করতো না, কোন প্রকার সতর্কবাণী তাদেরকে সতর্ক করতো না, তাদের মনে দাগ কাটতো না তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ আমি তাদের হৃদয়কে পাষাণ করে দিয়েছি আর তা করা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের কারণেই।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪২০

কোন কোন তফসীরকার এ বাক্যের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো তাদের অন্তরে ঈমানই ছিল না। তাদের অন্তর ছিল কুফর এবং নেফাক দ্বারা পরিপূর্ণ। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো তাদের মন শুষ্ক ছিল এবং সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা তাদের ছিল না। কেননা, তাদের অন্তর নরম হতোনা।[১]

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ

দূরাত্মা ইহুদীরা তাদের অন্যান্য অমার্জনীয় অপরাধের পাশাপাশি আল্লাহর কালামে তাহরীফ করতো অর্থাৎ আল্লাহর বাণীকে তারা স্থানান্তরিত করতো। আল্লাহর বাণীর ভাষায়, মর্মে রদবদল করতো। আল্লাহ পাক এ বাক্যে বনী ইসরাঈলের এ জঘন্যতম অপরাধের কথা বলেছেন।

হাদীস শরীফেও তাদের এ অপরাধের বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। এমনকি বর্তমান যুগেও কোন কোন ইউরোপীয় খৃষ্টান লেখক তাদের রচনা সমূহে বনী ইসরাঈলের কুকীর্তির বিবরণ পেশ করেছে।

ইমাম কুরতবী (রঃ) লিখেছেন, বনী ইসরাঈলীরা আসমানী কিতাবের ভাষায় যেমন পরিবর্তন করেছে তেমনি তার অর্থেও হেরফর করেছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এই, ইহুদীরা এমন অন্যায় করেও লজ্জিত হয়নি; বরং গর্বিত হয়েছে।

وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ

অর্থাৎ- তাদেরকে যে নসিহত করা হয়েছিল তা তারা ভুলে গেছে। এ ভুলে যাওয়ার অর্থ হলো বর্জন করা অর্থাৎ তৌরাতে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের যে আদেশ দেয়া হয়েছিল তা তারা ভুলে গেছে। অথবা এর অর্থ হলো– বনী ইসরাঈলকে নসহিত করা হয়েছিল, তারা তার সেই অংশকে ভুলে গেছে, যাতে তাদের পূর্ব পুরুষকে হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুসরণের আদেশ দেয়া হয়েছে। আর এ যুগের লোকদের হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তারা সবই পরিত্যাগ করেছে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আল্লাহর কালামে পরিবর্তনের পরিণাম স্বরূপ বনী ইসরাঈলীরা তাদের সমস্ত এল্‌ম ভুলে গেছে।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৮৯

ইমাম আহমদ (রঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "আজ জোহদে" হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি মনে করি মানুষ যখন গুনাহ্ করে তখন তার এলম বিদায় গ্রহণ করে। সে যা জানত তা ভুলে যায়। এর প্রমাণ স্বরূপ তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন।[১]

## হতভাগ্য জাতি

বস্তুতঃ বনী ইসরাঈল সত্যিই বড় হতভাগা জাতি। তাদের কিতাব তৌরাতে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের কথা, তাঁর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নের আদেশ রয়েছে, তাদের কর্তব্য ছিল সবার আগে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর অনুসরণ করা। তাহলে তারা ভাগ্যবান হতো। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য এই যে, তারা তৌরাতের এ শিক্ষার প্রতি গাফলত করে। এমনকি, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাদেরকে সত্য গ্রহণের আহবান জানান এবং তাদের কিতাবের কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন তখনও তারা পথে আসেনি। তারা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই রয়ে গেল। পরিণতিতে তাদরেকে যে এল্‌ম দেয়া হয়েছিল তা তারা ভুলে গেল এবং আত্মবিস্মৃত হলো, আল্লাহর নসিহত থেকে উপকার লাভ করতে পারল না। ইহকাল পরকাল উভয়ই হারালো। অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে তাদের হৃদয় পাষাণ হলো। ফলে উপদেশ গ্রহণের যোগ্যতা হারালো।

وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ

(হে রসূল!) বনী ইসরাঈলর এ ধোকাবাজী, দুষ্কৃতি আজও বন্ধ হয়নি, এখনও তা রয়েছে সম্পূর্ণ বিদ্যমান আর ভবিষ্যতেও তা অব্যহত থাকবে। (হে রসূল!) আপনি সর্বদাই তাদের কোন না কোন ধোকাবাজি দুর্নীতি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হবেন। তাদের মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, তৌরাতের বিবরণকে গোপন করা, সত্য ধর্মের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা, নানা প্রকার পাপাচার তাদের জন্যে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এদের পূর্ব পুরুষরা তাদের যুগের নবীগণের বিরোধিতা করেছে। আর এরা (হে রসূল!) আপনার বিরোধিতা করছে।

## বনী ইসরাঈলের খেয়ানতের তাৎপর্য

আলোচ্য আয়াতে ইহুদীদের খেয়ানতের যে কথা রয়েছে তার তাৎপর্য হলো তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪২১

মুশরেকদেরকে সাহায্য করা। তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা, তাঁর খাবারে বিষ দেয়া এবং তাঁর বিরুদ্ধে যাদু টোনা করা প্রভৃতি।

اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ

কিন্তু তাদের মধ্যে সামান্য সংখ্যক লোক দাগাবাজ নয়, বরং নেককার। হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগে তারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগেও বনী ইসরাঈলের কিছু লোক তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে এবং যখন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়েছে তখনও তাদের মধ্যে কিছু লোক তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁর অনুসারী হয়েছে।

## ক্ষমার আদর্শ গ্রহণ কর

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ

অর্থাৎ- (হে রসূল!) ইহুদীদের দুর্নীতি-প্রতারণা চির পরিচিত। অতএব, আপনি তাদের এ অন্যায় আচরণের প্রতি গুরুত্ব দেবেন না। তাদের উপেক্ষা করে চলুন। তাদের দুর্নীতি, দুষ্কৃতি ও বিশ্বাসঘাতকতা ক্ষমা করে উদারতার মাধ্যমেই তাদের অন্যায় আচরণের জবাব দিন।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী আলোচ্য আয়াতের এ অর্থ বর্ণনা করেছেন, যদি ইহুদীরা তওবা করে, ঈমান আনে অথবা শান্তি চুক্তি করে এবং অমুসলিম কর আদায়ের অঙ্গীকার করে, তবে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

(নিশ্চয় আল্লাহ পাক নেককার লোকদেরকে পছন্দ করেন।) উদারতা, ক্ষমা ও ঔদার্য্য নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বড় নেক কাজ। যারা এমন নেক কাজ করবে, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে পছন্দ করেন। তফসীরকারগণ বলেছেন, দাগাবাজ, দুষ্কৃতকারী কাফেরদেরকে ক্ষমা করাকে যখন নেককাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে তাহলে মুসলমানকে ক্ষমা করা কত বড় নেক কাজ, এর ফজিলত ও মাহাত্ম কত বেশী তা সহজেই অনুমেয়। তাই ইমাম বয়যাভী (রঃ) লিখেছেনঃ

ان العفو عن الكافر الخائن احسان فضلا عن العفو عن غيره

ধোকাবাজ খেয়ানতকারী কাফেরকে ক্ষমা করাকেও যখন এহসান বা সৎ কাজ বলা হয়েছে তখন অন্যকে ক্ষমা করার মাহাত্ম কত অধিক তা বর্ণনাতীত। পবিত্র

কোরআন ক্ষমা ও ঔদার্য্যের মহান আদর্শ গ্রহণের আহবান জানিয়েছে। ইসলামই একমাত্র জীবন বিধান যা এমনি আদর্শ পেশ করে। পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদ এমনি আদর্শ পেশ করেনি। যে সব মতবাদ এ যুগের মানুষকে বিশেষতঃ যুব সমাজকে তাদের ভ্রান্ত পথে আকৃষ্ট করে, তারা যখন ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা এমনকি নিজ দেশবাসীর উপরও ট্যাঙ্ক চালিয়ে দিতেও দ্বিধা বোধ করেনা, নিশ্চিহ্ন করে দেয় হাজার হাজার মানুষকে এ পৃথিবীর বুক থেকে। শুধু এ অপরাধে যে, তারা ন্যায্য অধিকার চায়।[১] কিন্তু ইসলাম বিশ্ব ধর্ম। বিশ্ব শান্তি স্থাপন তার লক্ষ্য। সবার কল্যাণ সাধন তার আদর্শ। তাই পরম শত্রুকেও ক্ষমা করার নির্দেশ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

## নাসারাদের অবস্থা

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ

"আর কিছু লোক, যারা নিজেদেরকে 'নাসারা' বলে, আমি তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহন করেছি"।

"নাসারা" নসর থেকে নিস্পন্ন, এ শব্দটির অর্থ হলো সাহায্যকারী। অথবা এর অর্থ হলো "নাসিরা" নামক স্থানের অধিবাসী। নাসিরা সিরিয়ার অর্ন্তগত একটি স্থানের নাম, এখানেই বসবাস করতেন হযরত ঈসা (আঃ)। তাই তাঁর অনুসারীদেরকে "নাসারা" বলা হয়।

হাসান (রহ) বলেছেন, আয়াতের বর্ণনা-শৈলী থেকে প্রমাণিত হয় যে, নাসারাদের এ 'খেতাব' আল্লাহ পাক দান করেননি, বরং তারা নিজেরাই দাবী করেছে যে, তারা আল্লাহর সাহায্যকারী কিন্তু বাস্তবে তা নয়। একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে যে, তারা নিজেদেরকে "নাসারা" বলে দাবি করে এবং এজন্যে গর্ববোধ করে, অথচ তাদের আচরণ এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তারাও ইহুদীদের মত অঙ্গীকার ভঙ্গকারী, সত্য দ্বীনের বিরোধী, নিন্দনীয় তাদের চিন্তা ধারা, ঘৃণ্য তাদের জীবন-ধারা।

নাসারাদের যে দলটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে বর্তমান ছিল তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, তোমাদের পূর্ব পুরুষরা তো আল্লাহর সাহায্যকারী হওয়ার দাবীদার ছিল। আর তাদের কিছু লোক সত্যিই দ্বীন ইসলামের সাহায্যকারী ছিল।

যেহেতু তোমরা তাদের অনুসারী হওয়ার দাবীদার, তাই তোমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করা।

১। ১৯৮৯ সালের জুনের ২য় সপ্তাহে চীনে যে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল তা একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ যারা নিজেদেরকে নাসারা বলে, তাদের থেকেও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম অর্থাৎ ইঞ্জিল গ্রন্থে। আর ঈসার (আঃ) মাধ্যমে তোমাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম। সে সুসংবাদ দিয়েছিলঃ অতঃপর একজন রসূল আসবেন, যাঁর নাম হবে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আর তিনি ঈসার (আঃ) পর আগমন করবেন। তোমরা ইঞ্জিলের এ আদেশ মেনে চলবে।

কিন্তু নাসারা সম্প্রদায় এ নসিহত ভুলে গেল, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ

অতঃপর তারা নসিহতের এ অংশ বা পূর্ণ নসিহতই ভুলে গেলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের যে সুসংবাদ তাদেরকে প্রদান করা হয়েছিল এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নের যে নির্দেশ তাদেরকে প্রদান করা হয়েছিল তারা সে নির্দেশ পালন করেনি। তাদের করা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করেনি। ফলে তাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে। তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে 'মালকানিয়া' এবং 'ইয়াকুবিয়া' নামক ফেরকা তৈরী হয়েছে। তাদের অন্যায় আচরণের শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ তাদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি হয়েছে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ

অর্থাৎ আসমানী শিক্ষাকে বর্জন করার পরিণাম স্বরূপ তাদের শত্রুতা বিদ্বেষ চির প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। পরস্পরের মধ্যে রেষারেষি তাদের জীবনের ব্রত হয়েছে। কেয়ামত পর্যন্ত তারা এ আত্মকলহে লিপ্ত থাকবে, এটি তাদের জন্যে লা'নত বা অভিশাপ। ইহুদী ও নাসারাদের মধ্যে যে সংঘর্ষ বাধল তা তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হলো।

বিখ্যাত তফসীরকার কাতাদা এবং মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন بَيْنَهُمْ (তাদের মধ্যে) এতদ্বারা ইহুদী ও নাসারাদের বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইহুদী ও নাসারাদের মধ্যে চির শত্রুতা এবং চির বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু রবি এবনে আনাস (রঃ)-এর মতে, "তাদের মধ্যে" বলতে খৃষ্টানদের মধ্যে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ খৃষ্টানদের বিভিন্ন ফেরকার মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এ কলহ এত চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তাদের ধর্ম বিদায় নিয়েছে কিন্তু ধর্মীয় দ্বন্দ্ব অব্যাহত রয়েছে।

## একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

প্রশ্ন হতে পারে যে, ইহুদী নাসারাদের কথা বলে লাভ কি, মুসলিম জাতিও আজ কলহ-দ্বন্দ্বের শিকার।

এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বর্তমান যুগে মুসলমানদের মধ্যেও কলহ-দ্বন্দ্ব বিরাজমান রয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের কলহ-দ্বন্দ্বের মধ্যে আর ইহুদী নাসারাদের কলহ-দ্বন্দ্বের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে একথা সত্য, কিন্তু যেহেতু আল্লাহ পাকের মহান গ্রন্থ পবিত্র কোরআন আজও মুসলমানদের কাছে রয়েছে, তাই অধিকাংশ মুসলমান আল্লাহর রহমতে প্রকৃত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, আর কেয়ামত পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ এ অবস্থা অব্যাহত থাকবে।

পক্ষান্তরে, ইহুদী নাসারাদের কোন দলই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আর তাদের সত্য গ্রহণের কোন সম্ভাবনাও নাই। অথচ মুসলমানগণ পরস্পর বিভক্ত হলেও সরল সঠিক পথের এবং শান্তি, মুক্তি ও কল্যাণের পথ তাদের জন্যে চির উন্মুক্ত। আর ইহুদী খৃষ্টানরা সে পথই হারিয়ে ফেলেছে। আল্লাহর মা'রেফাত লাভ করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা, তাঁর সান্নিধ্য ধন্য হওয়া তাদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। তারা পথভ্রষ্টতায় অনেক দূরে সরে পড়েছে। তাদের অন্যায় অনাচারের কারণেই তারা রিক্ত হস্ত, হৃতসর্বস্ব, চির বঞ্চিত। কিন্তু সে উপলব্ধি তাদের নেই। তাই আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় তাদের পরিণাম ঘোষণা করেছেনঃ

## ইহুদী নাসারাদের পরিণাম

وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ

আর অদূর ভবিষ্যতে তথা কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক (তাদের শাস্তি বিধানের মাধ্যমে) তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করবেন। অর্থাৎ এ জীবনে আল্লাহর নাফরমানী, কুকীর্তি, আসমানী কিতাব সমূহের বিরোধিতা, আম্বিয়ায়ে কেরামের শানে বেয়াদবী, সত্য ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক যা কিছু তারা করতো তার যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়ে আল্লাহ পাক তাদেরকে জানিয়ে দেবেন, তারা ছিল দুনিয়াতে পথভ্রষ্ট, সেদিন তারা তাদের কৃতকর্মের ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করবে।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪২৩

يٰٓاَهْلَ
الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا
مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ
كَثِيْرٍ ۬ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ
مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾ يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ
سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ
بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٦﴾

তরজমা

(১৫) হে আহলে কিতাব! নিশ্চয় তোমাদের নিকট আমার রসূল এসেছেন, যিনি (আসমানী) কিতাব থেকে তোমরা যা গোপন কর তার অনেক বিষয় সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেন এবং অনেক বিষয় ক্ষমাও করেন। নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে।

(১৬) যদ্বারা আল্লাহ্ পাক তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণকারীগণকে শান্তির পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে আল্লাহর অনুমতি ক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ধাবিত করেন এবং তাদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদী ও নাসারাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কথা স্বতন্ত্র ভাবে বর্ণিত হয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে তাদের উভয় জাতিকে একত্রিত করে আহলে কিতাব বলে সম্বোধন করা হয়েছে ও তাদেরকে নসিহত করা হয়েছে বিশেষতঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়নের আহবান জানানো হয়েছে এভাবে- হে ইহুদী ও নাসারা সম্প্রদায়! আমার সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোমাদের নিকট গমন করেছেন, তোমরা যাঁর অপেক্ষা করছিলে এবং তৌরাত ইঞ্জিলে যাঁর সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল, আর তোমাদের নিকট থেকে যাঁর আনুগত্যের অঙ্গীকার করা হয়েছিল, এখন তিনি আগমন করেছেন, তাঁর নবুওয়্যত ও রেসালতের অনেক সুস্পষ্ট দলিল এবং উজ্জ্বল নিদর্শন সমূহ রয়েছে, তন্মধ্যে একটি হল তিনি উম্মী নবী। তৌরাত ইঞ্জিলের যে সব কথা

তোমরা গোপন করে থাক সেগুলোকেও তিনি তোমাদের নিকট প্রকাশ করেন, যেমন রজম এবং কেসাসের আদেশ তোমরা গোপন করতে, কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করে দিয়েছেন। এমনিভাবে তোমাদের অনেক দোষকে তিনি ক্ষমা করে দেন, তা তাঁর পয়গম্বরী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।[১]

## শানে নুযুল

এবনে জরীর একরামার বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কয়েকজন ইহুদী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে রজমের (পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের শাস্তি) শাস্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম কে? তাকে হাযির কর, তখন ইহুদীরা এবনে ছুরিয়া নামক এক ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবনে ছুরিয়াকে বললেন, আমি তোমাকে সেই আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি যিনি মূসা (আঃ)-এর উপর তৌরাত নাযিল করেছেন এবং বনী ইসরাঈলের মাথার ওপর তূর পাহাড় উত্তোলন করে তৌরাতের ওপর আমল করার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। এরপর প্রশ্ন করেছেনঃ তোমাদের গ্রন্থে রজমের শাস্তি আছে কি? যদি থাকে তবে তোমরা কিভাবে তা পরিত্যাগ করেছ? জবাবে এবনে ছুরিয়া বলল- যখন আমাদের সমাজে ব্যাভিচার প্রসার লাভ করল এবং প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে মৃতুদণ্ড দেয়া কঠিন হয়ে পড়ল, তখন আমরা একশত কোড়া এবং মাথা মুণ্ডনের শাস্তি জারী করি। একথা শ্রবণ করে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রজমের আদেশ প্রদান করলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

يَاأَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ

## আহলে কিতাবদের প্রতি মূর্খতা পরিহার করার আহবান

'হে আহলে কিতাব'! এ শব্দটি ইহুদী ও খৃষ্টান উভয়ের জন্যে ব্যবহার করা হয়। যদিও ইহুদীদের নিকট অবতীর্ণ আসমানী কিতাব ভিন্ন এবং খৃষ্টানদের কিতাব ভিন্ন। হে আহলে কিতাব! অর্থাৎ হে ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়। তোমরা মূর্খতা, পথভ্রষ্টতা পরিহার কর, অন্ধকার দূরীভূত কর, জ্ঞানের আলোর দিকে আস। নিশ্চয় তোমাদের নিকট আগমন করেছেন আমার রসূল হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, যাঁর সম্পর্কে তোমাদের নিকট অবতীর্ণ গ্রন্থে রয়েছে সুসংবাদ, রয়েছে শেষ নবীর পরিচয় এবং বৈশিষ্ট্যের বিবরণ। তাঁর সম্পর্কে হযরত

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৮৯
তফমীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১০

ঈসাও (আঃ) সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। তাঁর জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এই যে, তোমাদের নিকট অবতীর্ণ তৌরাত ও ইঞ্জিলের যেসব বিষয় তোমরা গোপন করেছ, তিনি প্রকাশ্যে সুস্পষ্ট ভাষায় তা ব্যক্ত করেছেন। তোমাদের গ্রন্থ দেখে তিনি এসব কথা বলছেন না, বরং আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর নিকট ওহী প্রেরণের মাধ্যমে তাঁকে সব কথাই জানিয়ে দিচ্ছেন। ব্যভিচারের শাস্তি 'রজম' সম্পর্কে তৌরাতে যে কথা ছিল, তৌরাত এবং ইঞ্জিলে সর্বশেষ নবী সম্পর্কে যেসব কথা ছিল তা-ও তোমরা গোপন করতে। কিন্তু সবই তিনি প্রকাশ করে দিয়েছেন। আর তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতা, উদারতা ও মহানুভবতা এত বেশী যে, তোমাদের অনেক কথা জানা সত্ত্বেও তিনি তা ক্ষমা করে দিচ্ছেন। অতএব, তোমাদের কর্তব্য হলো তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ইহুদী নাসারারা উল্লেখিত বিষয় সমূহ গোপন রেখেছিল। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা বর্ণনা করে দিয়েছেন। অথচ তিনি তাদের কিতাব পাঠ করেননি। তাই এটি ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোযেজা এবং তাঁর নবুওয়্যতের সুস্পষ্ট দলিল, অকাট্য প্রমাণ।[১]

وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ

অর্থাৎ- ইহুদী ও খৃষ্টানরা যেসব বিষয় গোপন রাখে তার অনেক কিছু তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন অর্থাৎ সেগুলো উপেক্ষা করেন (সেগুলো এমন বিষয় যা বর্তমানে প্রয়োজন নেই)।

অথবা এ বাক্যটির অর্থ হলো, অনেক আহলে কিতাবকে তিনি মাফ করে দেন, তাদের অপরাধের জন্যে তাদেরকে পাকড়াও করেন না।[২]

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রঃ) এ বাক্যের তফসীরে লিখেছেন, আমার নবী তোমাদের অনেক গোপন বিষয় প্রকাশ করেন না, যখন এর কোন দ্বীনি প্রয়োজন না হয় যাতে করে তোমাদের অধিকতর অপমান না হয়। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, কারো সঙ্গে শত্রুতা থাকলেও যদি দ্বীনি প্রয়োজন না হয় তবে ক্রোধের নীতি গ্রহণীয় নয়, বরং বর্জনীয়।[৩]

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৮৯
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪২৪
৩। তফসীরে বয়ানুল কোরআন পৃষ্ঠা-২২৭

(নিঃসন্দেহে তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এসেছে নূর এবং সুস্পষ্ট গ্রন্থ) এখানে নূর অর্থ নূরে মোহাম্মদী তথা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আর কিতাব তথা পবিত্র কোরআন।

তফসীরকারগণ এর আরো একটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। এখানে নূর অর্থ ইসলাম, আর কিতাব অর্থ পবিত্র কোরআন।[১]

ইমাম কাতাদা (রঃ)-এর মত বর্ণিত হয়েছে যে, নূর অর্থ প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আর সুস্পষ্ট কিতাব হলো পবিত্র কোরআন। এর তাৎপর্য এই, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্ত্বা তাঁর নবুওয়্যত ও রেসালতের সুস্পষ্ট দলিল।[২]

آفتاب آمد دلیل آفتاب

অর্থাৎ- সূর্য নিজেই তার অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ। এজন্যে যে, আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন সমগ্র বিশ্ব মানবের হেদায়েতের আলো দিয়ে এবং দীপ্তিমান সূর্যরূপে। এতদ্ব্যতীত, পবিত্র কোরআন তাঁর নবুওয়্যতের সুস্পষ্ট দলিল। যারা শান্তি, মুক্তি ও কল্যাণকামী তাদের জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমন এক সুবর্ণ সুযোগ। যারা ভাগ্যবান, তারা তাঁর হেদায়েত কবুল করে, আর যারা হতভাগা তারা তাঁর হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হয়।

يَّهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ

যারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির অন্বেষণ করবে আল্লাহ পাক তাদেরকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে শান্তি, মুক্তি ও কল্যাণের পথ প্রদর্শন করবেন, আল্লাহর আযাব থেকে নাজাত লাভের পথ-নির্দেশনা দান করবেন, আল্লাহ পাক তাঁর নৈকট্য লাভের পথ দেখাবেন।

وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ

এবং গোমরাহীর অন্ধকার থেকে বের করে তাদেরকে ঈমানের আলোকে আলোকিত করবেন।

وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৮৯
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪২৪
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৮৭
তফসীরে কুরতবী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১১৮

"আর আল্লাহ পাক তাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন"।

অতএব, হে আহ্‌লে কিতাব! তোমরা আজ অন্যায় অনাচার, কুফর ও নাফরমানীর ঘন অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছ। পরস্পর কলহ-দ্বন্দ্ব, হিংসা-বিদ্বেষ এবং শত্রুতায় লিপ্ত রয়েছ, এমনি অবস্থা অব্যাহত থাকলে তোমাদের নাজাতের তথা কল্যাণের আশা সুদূর পরাহত, তোমাদের শাস্তি অবধারিত।

অতএব, যদি আল্লাহ পাকের গযব থেকে নাজাত পেতে চাও, যদি গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোতে আসতে চাও, তবে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ কর। শুধু এটিই সরল সঠিক পথ। এটি চির শান্তি, চির মুক্তি, চির কল্যাণের পথ।

لَقَدْ
كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ
قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ
يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ
جَمِيْعًا ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ
يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

## তরজমা

(১৭) নিশ্চয় তারা কাফের হয়ে গেছে যারা একথা বলেছে যে, নিশ্চয় মসীহ এবনে মরয়ম আল্লাহ তায়ালা (নাউযুবিল্লাহ)।

(হে রসূল!) আপনি বলে দিন, যদি আল্লাহ তায়ালা মসীহ এবনে মরয়ম ও তাঁর মাতাকে এবং পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীদের ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেন তবে কে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা থেকে বাঁচাতে পারবে? (আর একথা জেনে রাখা উচিত যে) আসমান ও জমিন এবং এর মধ্যে যত কিছু আছে সব কিছুর উপর ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ তায়ালা সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াকেত সীরাতুল মুস্তাকিম বা সরল সঠিক পথের কথা বলা হয়েছে। আর এ আয়াতে যারা সরল সঠিক পথ থেকে দূরে সরে পড়েছে তথা যারা পথভ্রষ্ট বা লক্ষ্যচ্যুত হয়েছে তাদের কথা উল্লেখিত হয়েছে। তাদের মধ্যে বিশেষতঃ খৃষ্টানদের কথা যারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। তিনি আল্লাহর সৃষ্টি, তিনি আল্লাহর বন্দা এবং রসূল। কিন্তু তারা সৃষ্টিকে স্রষ্টার আসনে বসাবার কথা বলেছে। তাই আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, নিঃসন্দেহে সে সব লোক কাফের, যারা আল্লাহর পাকের শানে বেয়াদবী করেছে এবং বলেছে, মরয়ম পুত্র মসীহ আল্লাহ (নাউযুবিল্লাহ)। এটি নাসারাদের মধ্যে ইয়াকুবিয়া সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত মত তথা বাতিল আকীদা। তারা বলে মসীহের মধ্যেই আল্লাহ নিহিত এবং রূপান্তরিত হয়েছেন।

বস্তুতঃ এর চেয়ে বড় মিথ্যা এবং বেয়াদবী পূর্ণ কথা আর কিছুই হতে পারে না। সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার কোন প্রকার তুলনাই হতে পারে না। এর চেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা এবং অজ্ঞতা আর কিছুই হতে পারে না। যিনি জমিন ও আসমানের মালিক, যিনি সর্বময় ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী, যিনি অনন্ত অসীম শক্তি ও ক্ষমতার মালিক, সমগ্র সৃষ্টি জগৎ তথা নিখিল বিশ্বে যা কিছু আছে এর সবই যাঁর "কুন" শব্দ দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করেছে, পুনরায় যখন তাঁর মর্জি হবে এবং আদেশ হবে তখন সবই লয়ঃ প্রাপ্ত হবে, সেই মহান স্রষ্টার সঙ্গে কোন সৃষ্টির তুলনা করা মত নির্বুদ্ধিতা আর কি হতে পারে? তাই আল্লাহ পাক পরবর্তী বাক্যে এরশাদ করেছেনঃ

### সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ পাক

قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا

(হে রসূল!) আপনি বলুন, যদি আল্লাহর পাক ইচ্ছা করেন যে, মসীহ এবনে মরয়ম, তার মাতা এবং সমগ্র বিশ্ববাসীকে তিনি ধ্বংস করে দেবেন, তবে কে তাদেরকে আল্লাহ্‌র হাত থেকে রক্ষা করবে? বস্তুতঃ মসীহ এবনে মরয়ম এবং তাঁর মাতা অন্যদের মত আল্লাহ্‌র বন্দাই। একজন মাতা আর একজন পুত্র, উভয়ই ধ্বংসশীল। অতএব, তাদের সম্পর্কে আপত্তিকর ভিত্তিহীন মন্তব্য করার কোন অধিকারই কারো নেই। তারা বা অন্য কোন সৃষ্টিই সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের ক্ষমতার আওতার বাইরে নয় কেননা–

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

আর আসমান জমিনের এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম ক্ষমতার অধীন। কোন কিছুই তাঁর ক্ষমতার আওতার বাইরে নয়। অন্যত্র এরশাদ হয়েছেঃ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ

"মহা মহিমান্বিত তিনি, সর্বত্র কৃর্তত্ব যাঁর করায়ত্ত, তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান"।

অতএব সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ পাক, তাঁর ক্ষমতায় কোন কিছু শরীক নাই। তিনি ইচ্ছা করলে মসীহ এবনে মরয়ম, তাঁর জননীসহ সমগ্র বিশ্ব বাসীকে এক মুহূর্তে ধ্বংস করে দিতে পারেন। তাঁকে বাঁধা দিতে পারে এমন কেউ নেই। কবির ভাষায়-

اوست سلطان هرچه خواهی آن کند

عالمے در دمے ویر ان کند

"তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি যা ইচ্ছা তা করেন। ক্ষণিকের মধ্যে বিশ্বকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। অতএব, বন্দাকে খোদার আসনে বসাবার মত ধৃষ্টতা আর কি হতে পারে"!

يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ

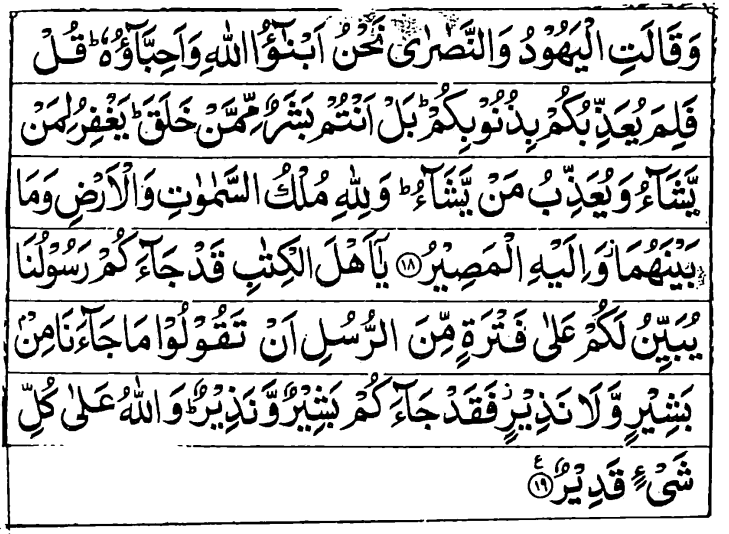
যেহেতু ঈসা (আঃ) পিতা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছেন, তাই খৃষ্টানদের বক্তব্যে হলো আমরা এমন এক বিস্ময়কর সৃষ্টিকে একজন সাধারণ মানুষ কি করে মেনে নেব? নিশ্চয় তিনি অতি মানব। তাঁর মধ্যে স্রষ্টার কিছু অংশ অবশ্যই রয়েছে (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহ পাক এ বাক্যে খৃষ্টানদের এ ভ্রান্ত ধারণার জবাব দিয়েছেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি যা ইচ্ছা, যেমন ইচ্ছা সৃষ্টি করতে পারেন। হযরত আদম (আঃ) এবং হযরত হাওয়া (আঃ)-কে মাতা ব্যতীতই সৃষ্টি করেছেন। আর ঈসা (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন পিতা ব্যতীত এবং সাধারণভাবে সমস্ত মানুষকে পিতা-মাতার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। এটি নিতান্ত তাঁর ইচ্ছা, কুদরত এবং মর্জির ব্যাপার। তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতার জ্বলন্ত প্রমাণ।[১]

তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৪৫
ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১৪২-৪৩
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪২৫

অর্থাৎ- আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। সৃষ্টি করা, মৃত্যুমুখে পতিত করা এসবই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জির ব্যাপার। তিনি সর্বশক্তিমান, তাঁর ক্ষমতা অনন্ত-অসীম। অতএব হে খৃষ্টান সমাজ! ক্ষণিকের জন্যে চিন্তা কর, ঈসা এবং তার মাতা যখন তাদের মৃত্যুকেও এড়াতে না পারে তবে তাদেরকে তোমরা খোদার আসনে বসাবার ধৃষ্টতা কিভাবে দেখাতে পার?


وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ۭ قُلْ
فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ۭ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۭ يَغْفِرُ لِمَنْ
يَّشَاۗءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا ۡ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاۗءَكُمْ رَسُوْلُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰي فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَاۗءَنَا مِنْ
بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ۡ فَقَدْ جَاۗءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

## তরজমা

(১৮) এবং ইহুদী ও নাসারারা বলে বেড়ায় যে, আমরা আল্লাহ তায়ালার পুত্র ও বন্ধু। (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, (যদি তোমাদের এ দাবী সত্য হয়) তবে কেন আল্লাহ পাক তোমাদের গুনাহর কারণে তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন বরং (প্রকৃত অবস্থা এই যে) তোমরাও অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় শুধু মানুষ মাত্র। আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। আর আসমান ও জমিন এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে সমস্তের উপর একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই ক্ষমতা এবং সকলকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে।

(১৯) হে আহলে কিতাব! রসূলগণের আগমন বন্ধ হবার মুহূর্তে তোমাদের নিকট আমার এই রসূল এসেছেন যেন (আমার বিধি-নিষেধ) সুস্পষ্ট ভাষায় তোমাদের জন্যে বর্ণনা করেন, তোমরা যেন একথা বলতে না পার যে, আমাদের

নিকট কোন সুসংবাদ দানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী আসেননি, অথচ অবশ্যই তোমাদের নিকট সুসংবাদ দানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী এসেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

## তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদী ও নাসারাদের কুকীর্তির বিবরণ ছিল। আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, কুফর, শেরক এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ইহুদী ও নাসারারা এই দাবী করে বেড়ায় যে, আমরা আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় এবং নৈকট্য-ধন্য, আমরা যে তাঁর পুত্র ও বন্ধু (নাউযুবিল্লাহ)।

## শানে নুযুল

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার ইহুদী ধর্মজ্ঞানীদের এক দল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো। তন্মধ্যে ছিল নোমান এবনে হাই, বাহারী এবনে আমর এবং সাজ এবনে আদি। তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা বললো। তিনি তাদের ইসলাম কবুল করার দাওয়াত দিলেন। এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের আহবান জানালেন এবং আল্লাহ্‌র আযাবের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তাদের জন্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন। তারা বললো, আপনি আমাদেরকে ভয় প্রদশন করছেন? আমরা তো আল্লাহ্‌র প্রিয় এবং তাঁর পুত্র। তিনি আমাদের কিভাবে শাস্তি দেবেন? তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

## আয়াতের মর্মকথা

যেহেতু ইহুদী ও নাসারারা নিজেদেরকে আল্লাহর বন্ধু এবং আল্লাহর প্রিয়পাত্র বলে অহেতুক অমূলক অযৌক্তিক এবং অবাস্তব দাবী করেছে, তাই আল্লাহ পাক তাদের এ মিথ্যা দাবীর অসারতা ঘোষণা করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনি এ মিথ্যা কথার দাবীদারদের জিজ্ঞাসা করুন, যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহ্‌র সন্তান (নাউযুবিল্লাহ) এবং প্রিয়পাত্র হতে তবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তোমাদের পাপাচারের শাস্তি কেন দেবেন? তোমরা যদি তাঁর প্রিয়পাত্রই হতে তবে তোমাদেরকে আল্লাহ পাক শুকর বানরে কেন পরিণত করেছেন?

ইমাম কুরতবী (রঃ) লিখেছেন, যদিও يُعَذِّبُكُمْ শব্দটি দ্বারা ভবিষ্যত কাল বোঝায় কিন্তু তা অতীত কালের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহর

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪২৬
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৬ খন্ড-৭ পৃষ্ঠা-৭০
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১৪

প্রিয়পাত্র হতে তবে আল্লাহ্ পাক কেন তোমাদেরকে শুকর বানরে পরিণত করে কঠোর শাস্তি দিলেন?[১]

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, দূরাত্মা ইহুদী নাসারারা যে মিথ্যা দাবী করেছে তার অসারতা প্রমাণ করাই এ আয়াতের মর্মকথা। কেননা, কোন সৃষ্টির পক্ষেই আল্লাহ্ পাকের সাথে বংশগত সম্পর্ক করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। একথা চিন্তা করাও অপরাধ। চির অপরাধী ইহুদী খৃষ্টানরা এমন অবাস্তব দাবী করেছে অথচ এ দাবী শুধু অযৌক্তিকই নয়, বরং অমার্জনীয় অপরাধও। যিনি স্রষ্টা, পালনকর্তা রিয্কদাতা, সব কিছুর অধিকর্তা, তাঁর কোন সন্তান নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, এমন দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা। অতএব হে ইহুদী ও নাসারা সম্প্রদায়! তোমরা এমন অন্যায় উক্তি থেকে বিরত থাক, তোমরা অন্য মানুষের মত মানুষই, আর কিছুই নও।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী লিখেছেন, ইহুদী নাসারাদের একথা যে, আমরা আল্লাহর পুত্র এবং প্রিয় এর অর্থ হলো যেভাবে পুত্রের প্রতি পিতা দয়াবান হয়, ঠিক সেভাবে আল্লাহ্ পাক আমাদের প্রতি দয়াবান।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী একথাও বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে একটি শব্দ উহ্য আছে আর সে শব্দটি হলো–

ابنَاءُ انبياء اللّٰه

অর্থাৎ আমরা হলাম আল্লাহর নবীগণের বংশধর। আমাদের শাস্তি কিভাবে হবে? কিন্তু প্রকাশ্যে বাক্যটির অর্থ যা দাড়ায় তা মিথ্যা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কেননা, মহান আল্লাহ্ পাকের সাথে কোন সৃষ্টির এমন সম্পর্ক থাকতেই পারে না।

## প্রিয় বন্দা হবার পথ উন্মুক্ত

হ্যাঁ, আল্লাহ্ পাকের প্রিয় বন্দা হবার পথ উম্মুক্ত। যারা আল্লাহর বন্দেগী করে এবং বন্দেগীর অবস্থায় জীবন যাপন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে চলে তারা আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়। এ সম্পর্কে কোরআনে করীমের সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ

১। তফসীরে কুরতবী খন্ড–৬, পৃষ্ঠা-১২১

সাবধান! যারা আল্লাহ্‌র বন্ধু বা একান্ত আপনজন তাদের কোন ভয় নেই, তারা সেসব লোক যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকে। অতএব, আল্লাহ পাকের প্রিয় হওয়ার জন্যে দুটি শর্ত রয়েছে (১) আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ঈমান বা বিশ্বাস থাকা এবং (২) আল্লাহকে ভয় করা।

অতএব, আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর প্রতি ভয়ই হলো আল্লাহর প্রিয় বন্দা হওয়ার একমাত্র পন্থা। আল্লাহর বন্দেগী করার মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয় বন্দা হওয়া যায়। আর এ পথ কেয়ামত পর্যন্ত খোলা থাকবে। কিন্তু তোমরা যারা আল্লাহর অবাধ্য নাফরমান তোমাদের পক্ষে তাঁর নৈকট্য-ধন্য হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এমনি অবস্থায় মহান আল্লাহ পাকের সাথে বংশগত সম্পর্কের কথা বলা শুধু অবান্তর নয়; বরং অমার্জনীয় অপরাধ। এতদ্ব্যতীত, আল্লাহর প্রিয় বন্দাগণের সঙ্গে দুর্ব্যবহার তোমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। অতএব তোমাদের পক্ষে আল্লাহর প্রিয় বন্দা হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কেননা, আল্লাহর বিধান নিয়ে বাড়াবাড়ি করা, মন্দ আচরণ এবং নিন্দনীয় চরিত্র, আল্লাহ পাকের দরবারে এত ঘৃণ্য যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর পুত্র আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার কারণে আল্লাহ পাক তার সম্পর্কে ঘোষণা করলেনঃ

إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ

(হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়, সে তোমার পরিজন ভুক্ত হওয়ার আদৌ যোগ্য নয়) এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, অপরাধের কারণে হযরত নূহ (আঃ)-এর পুত্র তার পৈত্রিক বংশ মর্যাদা হারিয়েছে এবং আল্লাহ পাকের গযবে পতিত হয়েছে, সেই অপরাধে অপরাধী হয়ে তোমরা আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়ার যে ভিত্তিহীন দাবী করছো তা চরম নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ

বরং তোমরাও আল্লাহর সৃষ্টি, অন্যান্য মানুষের মত সাধারণ মানুষ-ই, তোমাদেরও হিসাব নিকাশ হবে, তোমাদেরও বিচার হবে। ভাল কাজের জন্যে পুরষ্কার এবং মন্দ কাজের জন্যে অবশ্যই শাস্তি হবে। তোমরা যারা আল্লাহ্‌র অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ তাদের মুখে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার দাবী কোন অবস্থাতেই শোভন নয়।

يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ

আল্লাহ্ পাক সর্বশ্রোতা, প্রতিটি মানুষের যাবতীয় আমল তাঁর নখদর্পণে, পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই, কাকে শাস্তি দিতে হবে আর কে ক্ষমার যোগ্য-একথা তিনি ভালভাবেই জানেন, নিখিল বিশ্বের তিনিই মালিক, তিনিই অধিকর্তা, তিনি কাকে ক্ষমা করবেন, কাকে আশ্রয় দেবেন তাঁর রহমতের ছায়ায়

অথবা ন্যায় বিচারের তাগিদে কাকে শাস্তি দেবেন- এসব বিষয়ে তিনিই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এসব বিষয়ে বাঁধা দেয়ার বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার সাধ্য কারো নেই।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ-আসমানে যমিনে এবং তাদের মাঝে যা কিছু আছে সর্বত্র আল্লাহ পাকের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত, তিনি স্রষ্টা, আর সবই তাঁর সৃষ্টি, সৃষ্টি হিসেবে সবই সমান। অতএব কেউ আল্লাহ পাকের পুত্র হতে পারে না। আল্লাহ পাকের সঙ্গে কারোই বংশীয় সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না।

## সতর্কবাণী

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, এ বাক্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে সেসব লোকদের সম্পর্কে যারা হযরত ওযায়ের (রাঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে দাবী করেছে (নাউযুবিল্লাহ)।

وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

অর্থাৎ- তোমাদের প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের দরবারে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং প্রত্যেককে তার আমল অনুযায়ী বিনিময় দেয়া হবে। এ বাক্যে নেককারদের জন্যে সওয়াবের সুসংবাদ এবং বদকারদের জন্যে তাদের শাস্তির ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

আর আল্লাহর নিকটই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে তথা কোন নবীর নিকট নয়, কোন ওলীর নিকট নয়, কোন ফেরেশতার নিকট নয়, কোন দেবতার নিকট নয়, বরং তোমাদের প্রত্যেককে এক আল্লাহ পাকের নিকটই হাযির হতে হবে।

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেন, খৃষ্টানদের আকীদা ছিল, তারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর দরবারে হাযির হবে। আর ইহুদীরা ধারণা করত যে, তাদেরকে তাদের পূর্ব পুরুষ হযরত ইয়াকুব (আঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করবেন। কিন্তু আল্লাহ পাক সকল ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করে এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের সকলকে পরম পরাক্রমশালী আল্লাহ পাকের নিকটই হাযির হতে হবে। তাঁর দরবারেই তোমাদেরকে যাবতীয় কর্মকাণ্ডের জন্যে জবাবদেহী করতে হবে।[১]

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠ-২৪৫

## পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদী ও নাসারাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিল। আর এ আয়াতেও তাদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। উদ্দেশ্যে হলো, আল্লাহ পাকের নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়নের আহবান জানানো।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর সারা বিশ্ব গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে রদবদল করা হয়েছিল। পৃথিবী থেকে হেদায়েত বিদায় নিয়েছিল, এ সময় প্রয়োজন ছিল এমন একজন পয়গম্বর প্রেরণের যিনি সমগ্র বিশ্ববাসীকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন। তাই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, নবীগণের দলপতি বা সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়েছে।

## শানে নুযুল

মোহাম্মদ এবনে এসহাক হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইহুদীদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানালেন। ঐ মুহূর্তে বিখ্যাত সাহাবী হযরত মা'আয এবনে জাবাল (রাঃ) এবং হযরত সাদ এবনে ওবাদা (রাঃ) ইহুদীদের সম্বোধন করে বললেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমরা অবশ্যই জান যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে তোমরাই তো আমাদের সাথে তাঁর আলোচনা করতে এবং তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করতে। একথার জবাবে রাফেঈ এবনে হারীম এবং ওয়াহাব এবনে ইয়াহুদা নামক ইহুদী বলল, আমরা কখনও তাঁর কথা তোমাদের নিকট বলিনি এবং মূসা (আঃ)-এর পর আল্লাহ পাক কোন আসমানী কিতাব নাযিল করেননি। আর মূসা (আঃ)-এর পর আল্লাহ পাক কোন ব্যক্তিকে পয়গম্বর রূপেও প্রেরণ করেননি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ

হে আহলে কিতাব! পয়গম্বরগণের আবির্ভাব বিরতির পর আমার রসূল এসেছেন।

## সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের আবির্ভাবের সুসংবাদ

এ আয়াতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন ইহুদী ও নাসারাদেরকে সম্বোধন করে এ সুসংবাদ প্রদান করেছেন যে, আমার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী তোমাদের

হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেছি। তাঁর পর আর তোন নবী আসবে না। তিনি খাতেমুন্নাবিয়্যীন। তিনি গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে আসার জন্যে তোমাদেরকে আহবান জানান। তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আল্লাহর বিধান বর্ণনা করেছেন।

عَلٰى فَتْرَةٍ

অর্থাৎ-তিনি এমন সময়ে এসেছেন যখন তাঁর পূর্ববর্তী নবী ঈসা (আঃ)-এর অন্তর্ধানের পর তাঁর পূর্বে আর কোন নবীর আগমন হয়নি। উভয় নবীর মধ্যে সময় অতিবাহিত হয় ছয়শত বছর। এই সময় আম্বিয়ায়ে কেরামের আগমন বন্ধ ছিল। সমগ্র বিশ্ব মূর্খতা, অজ্ঞতা, উদাসীনতা, স্বার্থপরতা, হীনমন্যতা, পথভ্রষ্টতা ও সর্বপ্রকর কুপ্রবৃত্তির ইন্দ্রজালে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল, মানবতা বিদায় নিয়েছিল। এটি ছিল মানব-ইতিহাসের সর্বাধিক কলঙ্কময় অধ্যায়। মানুষ তখন ছিল পশুত্বের পর্যায়ে অবনমিত। ভদ্রতা, নম্রতা, উদারতা, ধৈর্য ও সহনশীলতা, পরস্পরের সহযোগিতা, দানশীলতা এক কথায় যাবতীয় মানবীয় গুণ বিদায় নিয়েছিল। মানুষ আত্মবিস্মৃত হয়েছিল। মানবতা ভূ-লুণ্ঠিত হয়েছিল, এমনি দুঃসময়ে আগমন করেছিলেন আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ রসূল হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গোমরাহীর অন্ধকার কেটে গেল, সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। মানুষ বেঁচে উঠল। বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তির মহাসনদ পবিত্র কোরআনের আলো চারিদিকে বিচ্ছুরিত হতে লাগল। মানুষের মনোজগতে, চিন্তা জগতে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সৃষ্টি হলো।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হলেন সমগ্র বিশ্ব মানবের হেদায়েতের জন্যে। বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের জন্য নয়, তিনি প্রেরিত হলেন সর্বকালের মানুষের জন্যে, বিশেষ কোন যুগের জন্যে নয়। কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষের পদচারণা হবে সবার হেদায়েতের জন্যে। যে তার অনুসরণ করবে তার ইহকাল এবং পরকালীন জীবন সার্থক হবে। আর যে তাঁর হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হবে তথা তাঁর অনুসরণ করবে না, তার জীবন-সাধনা হবে ব্যর্থ। অবশেষে সে হবে কোপগ্রস্ত। এটিই সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের অমোঘ বিধান। আল্লাহ পাক তাঁকে প্রেরণ করেছেন সুসংবাদ দাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারীরূপে। যেন কাল কেয়ামতের কঠিন দিনে কেউ একথা বলতে না পারে যে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে কেউ তোমার কথা বলেনি, তোমার তরফ থেকে আমাদের নিকট কোন সুসংবাদ দাতা এবং সতর্কবাণী আসেনি, পরিণামে আমরা তোমার সম্পর্কে কোন কথা জানতে পারিনি। তোমার মা'রেফাত হাসিল করতে পারিনি।

বস্তুতঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমনের পর আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে কোন মানুষের এমন কোন কৈফিয়ত বা ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি অর্পিত রেসালতের মহান দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। বিদায় হজ্জের অবিস্মরণীয় দিনে, আরাফাতের ঐতিহাসিক ময়দানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর ইন্তেকালের মাত্র ৮০ দিন পূর্বে সমবেত লক্ষাধিক সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে প্রশ্ন রেখেছিলেনঃ আমি কি তোমাদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছি? তখন সকলেই সমবেত কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন, আপনি আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন।

অতএব, যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না, তাঁর অনুসরণ করতে প্রস্তুত হবে না, কাল কেয়ামদের কঠিন দিনে তাদের কোন ওজর-আপত্তি চলবে না।

মসনদে আহমদে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি ভাষণ উল্লেখিত হয়েছে। এ ভাষণে তিনি এরশাদ করেছেন, আমার প্রতিপালক আমার প্রতি এ আদেশ দিয়েছেন যে, আমি তোমাদের এমন কথা শিক্ষা দেই, যা তোমরা জান না। আর আল্লাহ পাক আমাকে আজই একথা বলেছেন যে, আমি আমার বন্দাদেরকে যা দান করেছি তা তাদের জন্যে হালাল, আমি আমার সকল বন্দাকে তৌহিদবাদী হিসেবে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শয়তান তাদের নিকট এসে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে এবং আমার হালাল করা বস্তু সমূহকে হারাম করে। আর তাদেরকে বলে যেন আমার সঙ্গে শরীক করে, অথচ এর কোন দলিল নেই। তোমরা শোন, আল্লাহ পাক বিশ্ববাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন এবং আরব-আজম তথা সকলকে অপছন্দ করেছেন, সে সব লোক ব্যতীত যারা আল্লাহর তৌহিদের উপর কায়েম রয়েছে।

এরপর আল্লাহ পাক আমাকে বলেছেনঃ আমি তোমাকে আমার নবী হিসেবে এজন্যে প্রেরণ করিনি যে তোমার পরীক্ষা গ্রহণ করব, অথবা তোমার কারণে অন্যদেরকে পরীক্ষা করব। আমি তোমার নিকট এমন কিতাব নাযিল করেছি যাকে পানি বিনষ্ট করতে পারে না যাকে তুমি ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায় পাঠ কর।

এরপর আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ দিয়েছেন, আমি যেন কোরায়শ গোত্রের লোকের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেই। আমি আরজ করেছি, হে আল্লাহ! তারাতো আমাকে ধ্বংস করে দেবে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ তুমি তাদেরকে বের করে দাও, যেমন তারা তোমাকে বের করেছে। তুমি তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ কর, তোমাকে সাহায্য করা হবে। তুমি তাদের প্রতি ব্যয় কর, তোমার প্রতি ব্যয়

করা হবে। তুমি তাদের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ কর, আমি তার পাঁচ গুণ বেশী সৈন্য প্রেরণ করব। তোমার অনুগত লোকদেরকে নিয়ে তোমার বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।

## জান্নাতী লোক তিন প্রকার

১. সুবিচারক শাসনকর্তা, যাকে সৎ কাজের তৌফিক প্রদান করা হয়, যে সদকা খয়রাত করে।

২. বিনম্র স্বভাবের অধিকারী, যে আত্মীয়-স্বজন তথা সকল মুসলমানের সঙ্গে বিনম্র ব্যবহার করে।

৩. যে দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও হারাম বস্তু থেকে আত্মরক্ষা করে অথচ তার পরিবারবর্গও থাকে।

আর দোযখের অধিবাসী পাঁচ প্রকার লোক–

১. নিম্ন শ্রেণীর এমন বে-দ্বীন লোক যারা খোশামোদকে পছন্দ করে।

২. আমানতে খেয়ানতকারী, যাদের দৃষ্টি সামান্য জিনিসকেও এড়িয়ে চলে না তথা তুচ্ছ জিনিস খেয়ানত করতেও তারা ভুল করে না।

৩. যারা সকাল সন্ধ্যায় নিজেদের পরিবারবর্গকে ধোকা দিতে থাকে।

৪. কৃপণ অথবা বলেছেন মিথ্যাবাদী।

৫. যার মুখ খারাপ (তথা যে গাল-মন্দ দেয়)

এই হাদীস মুসলিম শরীফ ও নেসায়ী শরীফে সংকলিত হয়েছে।

## আয়াতের মর্মকথা

আয়াতের মর্মকথা হলো আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মানুষকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং সরল সঠিক পথে পরিচালনা করেন। তিনি মানুষকে সুস্পষ্ট শরীয়ত তথা জীবন বিধান দান করেছেন- যাতে করে কাল কেয়ামতের দিন কারোর এ ওজর-আপত্তি পেশ করার সুযোগ না থাকে যে, আমাদের নিকট কোন নবী আসেননি, কোন সুসংবাদ দাতা বা সতর্ককারীও প্রেরিত হননি।[১]

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৬ খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৭১-৭২

অর্থাৎ আল্লাহ পাক সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি একাধারে নবী রসূলগণ প্রেরণ করতে পারেন যেমন হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর মধ্যে ১৫০০ বা ১৭০০ বছর অতিবাহিত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে আল্লাহ পাক এক হাজার নবী প্রেরণ করেছেন।

এবনে সাদ যোবায়ের এবনে বকর এবং এবনে আসাকের কালবীর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, মূসা এবনে এমরান এবং ঈসা (আঃ)-এর মাতা মরয়ম এবনে এমরানের মধ্যে এক হাজার সাতশ' বছরের পার্থক্য ছিল। অবশ্য হাকেম হযরত এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, মূসা (আঃ) এবং ঈসা (আঃ)-এর মধ্যে ১৫০০ বছর অতিবাহিত হয়। এবনে আবি হাতেম আ'মাসের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, মূসা (আঃ) এবং ঈসা (আঃ)-এর মধ্যে এক হাজার পয়গম্বর প্রেরিত হন। 'আল্লাহ পাক সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান' একথার আরেকটি তাৎপর্য হলো, যেভাবে তিনি একাধারে পয়গম্বর প্রেরণ করতে পারেন ঠিক তেমনি নবুওয়্যতের সিলসিলা মুলতবী হওয়ার পর পুনরায় নবী প্রেরণও করতে পারেন। যেমন হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর ছয়শ' বছর যাতে কোন নবী প্রেরণ করেননি, এরপর প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের এ দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব এমন সময়ে হয়েছে যখন ওহীর সমস্ত নিদর্শন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, কুসংস্কারের অন্ধকার তদানীন্তন মানুষকে পেয়ে বসেছিল। তাই পয়গম্বর প্রেরণের প্রয়োজন ছিল অত্যধিক। তখন আল্লাহ পাক মানব জাতির প্রতি এহসান করেছেন যে, তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলকে সমগ্র মানব জাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন।[১]

আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, এতদসত্ত্বেও তোমরা যদি তাঁকে না মান তবে তিনি তোমাদের কোন পরোয়া করেন না। তোমাদেরকে মৃত্যু মুখে পতিত করে তাঁর অনুগত জাতিকে পৃথিবীতে আনয়ন ও প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি রাখেন। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

(সূরা ইব্রাহীম) إِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ

অর্থাৎ- আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে বিদায় করে দেবেন এবং অন্য সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন যারা এ নবীর আহবানে সাড়া দেবে। অতএব, সাবধান হও।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪২৮
২। তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৬

**তরজমা**

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ
مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ
الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ
فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿٢١﴾ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ
وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا
فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿٢٢﴾

(২০) এবং স্মরণ কর সে সময়কে যখন মূসা (আঃ) তাঁর জাতিকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত সমূহকে স্মরণ কর (যা তিনি তোমাদের দান করেছেন) তিনি যে তোমাদের মধ্য হতে পয়গম্বর নির্বাচন করেছেন এবং তোমাদেরকে বাদশাহ করেছেন আর দুনিয়াতে কাউকেও যা দান করেননি তা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন'।

(২১) হে আমার সম্প্রদায়! 'তোমরা সে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর যা আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করোনা। তাহলে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে'।

(২২) তখন তারা বললো, হে মূসা (আঃ)! সে পবিত্র ভূমিতে একদল লোক আছে যারা অত্যন্ত সবল শক্তিশালী এবং আমরা কোন অবস্থাতেই সেখানে প্রবেশ করবো না যে পর্যন্ত না তারা সে শহর থেকে বের হয়। তারা যদি সে শহর থেকে বের হয়ে যায় তবে আমরা অবশ্যই সেখানে প্রবেশ করবো।

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণ ছিল, আর এ আয়াতে তাদের একটি বিশেষ অঙ্গীকার ভঙ্গ করার বিবরণ ও তাদের কাপুরুষতা এবং শোচনীয় পরিণামের বর্ণনা রয়েছে।

## বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার পরিণতি

এ আয়াতের তফসীরে শাহ আবদুল কাদের (রঃ) লিখেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর জন্মভূমি ছেড়ে আল্লাহর পথে বের হন এবং শাম দেশে এসে অবস্থান করেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান, তাঁর জীবনের ৮৫ বছর পর্যন্ত কোন সন্তান হয়নি। এরপর আল্লাহ পাক তাঁকে সুসংবাদ দান করেন যে, তোমার বংশ হবে সুদূরপ্রসারী। শাম দেশ (সিরিয়া) তাদের করতলগত হবে। নবুওয়্যত, দ্বীন, ধর্ম, কিতাব এবং রাজত্ব সবই তাদের মধ্যে থাকবে। একথা সর্বজনবিদিত যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর জমানায় এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়। বনী ইসরাঈলীরা ফেরাউনের গোলামী থেকে নাজাত লাভ করে এবং শাম দেশে ক্ষমতা বিস্তার করে। আল্লাহ পাক ফেরাউনকে দলবলসহ লোহিত সাগরে ডুবিয়ে ধ্বংস করেন। তখন আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলকে এ নির্দেশ প্রদান করেন যে, তোমরা আমালেকা সম্প্রদায়ের সঙ্গে জেহাদ কর এবং শাম দেশে আধিপত্য বিস্তার কর, তা তোমাদের জন্যে লিপিবদ্ধ।

বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈলের বারটি দলের মধ্য হতে বারজন প্রতিনিধি মনোয়ন করা হয়। হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে শাম দেশের সংবাদ সমূহ সংগ্রহ করার জন্যে প্রেরণ করেন। তারা সংবাদ সংগ্রহ করে প্রত্যাবর্তন করে এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট এ বিবরণ পেশ করে যে, আমালেকা জাতি ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ। তাদের শক্তি বর্ণনাতীত। আমালেকা এক দুর্ধর্ষ জাতি।

যেহেতু মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈল জাতির চরিত্র সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকেফহাল ছিলেন, তাই তিনি প্রতিনিধিদেরকে হেদায়েত করলেন যে, তোমরা আমালেকা জাতির ধন-সম্পদ এবং ঐশ্বর্য-প্রাচুর্যের কথা তোমাদের সম্প্রদায়কে জানাতে পার। কিন্তু তারা যে এক ভয়ঙ্কর জাতি, তারা যে বিরাট শক্তির অধিকারী একথা তোমাদের সম্প্রদায়কে জানাবেনা।

কিন্তু যা হবার তাই হলো। বনী ইসরাঈল জাতির চারিত্রিক দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ হলো। দু'জন ব্যতীত আর সবাই তাদের সম্প্রদায়ের নিকট আমালেকা জাতির বিপুল শক্তির কথা বর্ণনা করলো। পরিণামে বনী ইসরাঈল জাতি অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। এমনকি, তাদের কেউ কেউ মিশর ফিরে যেতেও ইচ্ছা করলো।

তাদের এ অপরাধের কারণে আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলকে সুদীর্ঘ ৪০ বছর যাবত ময়দানে তীহে দিশেহারা অবস্থায় ঘোরা ফেরা করার শাস্তি প্রদান করলেন। এরপর যখন উপরোক্ত দু'জন প্রতিনিধি ব্যতীত সমসাময়িক সবাই মৃত্যুমুখে পতিত

হলো তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে ময়দানে তীহের শাস্তি থেকে নাজাত দিলেন এবং তারা আমালেকা জাতির সঙ্গে জেহাদ করে সিরিয়া জয় করলো। উল্লেখ্য, হযরত মূসা (আঃ)-এর অবর্তমানে তাঁর মনোনীত ঐ দু'জন প্রতিনিধিই তাঁর খলিফা নিযুক্ত হন।[১]

## আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করার নির্দেশ

يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

হযরত মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! 'তোমরা আল্লাহ পাকের নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ পাক তোমাদের মধ্য হতে নবী নির্বাচন করেছেন'।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলের প্রতি তাঁর তিনটি নেয়ামতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

১. বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে আল্লাহ পাক অনেক নবী মনোনীত করেছেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত ইয়াকুব (আঃ), ইউসুফ (আঃ) সহ দু' হাজার বছরে বনী ইসরাঈলে চার হাজার নবী আগমন করেছেন।

২. আল্লাহ পাক তাদের মধ্য হতে বাদশাহ নির্বাচন করেছেন। অথচ অবস্থা এই যে, মিশরে তারা ছিল ফেরাউনের গোলাম, তারা ছিল নির্যাতীত, উৎপীড়িত। হযরত মূসা (আঃ)-এর বরকতে আল্লাহ পাক তাদেরকে ফেরাউনের অমানুষিক নির্যাতন উৎপীড়ন থেকে নাজাত দিয়েছেন শুধু তাই নয়, তাদেরকে দান করেছেন স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, রাজ্যভাণ্ডার।

৩. এতদ্ব্যতীত, তাদের পূর্ব পুরুষের মধ্যেও ছিল অনেক ক্ষমতাবান ব্যক্তি।[২]

## বনি ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ-তোমরা স্মরণ কর সে সময়কে যখন মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতকে স্মরণ কর। তোমাদেরকে আল্লাহ পাক ফেরাউনের গোলামী এবং জুলুম থেকে নাজাত দিয়েছেন, তোমাদেরকে এমন নেয়ামত সমূহ দান করেছেন যা পৃথিবীতে আর কোন জাতিকে দান করা হয়নি। যেমন লোহিত সাগরের পানিকে

১। তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন কৃত- আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠ-৩১৮ ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১৪৩

২। তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৯৫-৯৬

পাহাড়ে পরিণত করে তোমাদেরকে আত্মরক্ষা করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তোমাদের সম্মুখে তোমাদের দুশমনকে ধ্বংস করেছেন এবং তোমাদেরকে সমুদ্র পার হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন, তোমাদের উপর মেঘমালা দ্বারা ছায়া করেছেন, তোমাদেরকে 'মান্না সালোয়া' রিয্ক হিসেবে দান করেছেন। একটি প্রস্তর খণ্ড থেকে ঝর্ণা বের করে তোমাদের ছয় লক্ষ লোকের পানির প্রয়োজন পূরণ করেছেন। তোমাদেরকে এমন পোষাক দান করেছেন যা ৪০ বছর যাবত ময়লা হয়নি, জীর্ণ হয়নি, পুরনো মনে হয়নি। তোমাদের দৈহিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সে পোষাকও প্রশস্ত হয়েছে। এসবই ছিল তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের মহান দান। অতএব, তোমরা আল্লাহ্ পাকের সমস্ত নেয়ামতের জন্যে শোকর গুজার হও এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর।

وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا

(আল্লাহ্ পাক তোমাদের থেকে অনেক বাদশাহ্ বানিয়েছেন।)

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, ফেরাউন বিতাড়িত হয়ে যাওয়ার পর বনী ইসরাঈলে অনেক বাদশাহ্ হয়েছে। কিন্তু হযরত ইয়াহয়া (আঃ)-কে যখন তারা হত্যা করে এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে-এরপর আর তাদের মধ্যে কোন বাদশাহ্ হয়নি।

এবনে আবি হাতেম হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ বনী ইসরাঈলে যদি কারো নিকট খাদেম, স্ত্রী এবং নিজস্ব যানবাহন থাকতো তবে তাকে বাদশাহ্ বলা হতো।

যায়েদ এবনে আসলামের বর্ণিত হাদীস এই হাদীসের মর্মের সমর্থক। আবদুর রহমান বর্ণনা করেন, আমার সম্মুখে এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আমরুল আসের নিকট প্রশ্ন করলো, আমরা কি দরিদ্র মোহাজেরীনদের অন্তর্ভুক্ত নই? হযরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বললেনঃ তোমার স্ত্রী আছে কি যার কাছে তুমি থাক? সে বললঃ জ্বী-হ্যাঁ আছে।

এরপর তিনি প্রশ্ন করলেনঃ তোমার কি বাড়ী আছে যেখানে তুমি বাস কর? সে বললো, জ্বী-হ্যাঁ আছে।

তখন হযরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বললেন, তাহলে তুমি ফকির নও, বরং গনী তথা ধনী। তখন ঐ ব্যক্তি বললোঃ আমার একজন খাদেমও আছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বললেন, তাহলে তো তুমি বাদশাহ্।

সুদ্দী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, বাদশাহ করার অর্থ হলো তোমাদেরকে স্বাধীন করেছি। আর যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, বনী ইসরাঈলে বাড়ী-ঘর অত্যন্ত বড় এবং প্রশস্ত হতো যার বাড়ী এত বড় সে তো বাদশাহ।

وَّاٰتٰكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ

আর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে এমন নেয়ামত সমূহ দান করেছেন যা তোমাদের যুগে আর কাউকে দান করেননি। আম্বিয়ায়ে কেরামের বরকতে আল্লাহর নৈকট্য লাভ, দুনিয়াতে ইজ্জত-সম্মান এবং আল্লাহর নবীগণের অনেক মোজেযা যার উল্লেখ ইতিপূর্বে হয়েছে, এসব এমন নেয়ামত যা আল্লাহ পাক শুধু বনী ইসরাঈলকে দান করেছেন, সে যুগে আর কাউকে দান করেননি।

## পবিত্র ভূমিতে প্রবেশের অনুমতি

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ

(হে আমার জাতি, সেই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর) হযরত মূসা (অঃ) তাঁর জাতিকে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করার আহবান জানিয়েছেন। এ পবিত্র ভূমি কোন্‌টি? এ বিষয়ে তফসীরকারদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। বিখ্যাত তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ)-এর মতে তা হলো 'তূর' এবং 'তূরের উপকণ্ঠ'। যাহ্যাক (রহঃ)-এর মতে, এ পবিত্র ভূমি হলো 'এলিয়া' এবং বায়তুল মুকাদ্দাস'। একরামা এবং সুদ্দী (রহঃ)-এর মতে, এ পবিত্র ভূমি হলো 'আরিহা'।

ক্বালবীর মতে এ পবিত্র ভূমি হলো দামেস্ক, ফিলিস্তিন এবং জর্ডানের কিছু অংশ। কাতাদা (রহঃ)-এর মতে, এ পবিত্র ভূমি হলো শাম দেশ বা সিরিয়া।

হযরত কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থ তৌরাতে পাঠ করেছি যে, শাম দেশ হলো আল্লাহর জমীনের ভাণ্ডার। আর এ দেশের অধিবাসী হলো আল্লাহর বন্দাদের মধ্যে ভাণ্ডার। (পবিত্র) শব্দটি সংযোজনের কারণ হলো, উল্লেখিত এ ভূমিটি আল্লাহর নবীগণের এবং ঈমানদারদের অবস্থান-স্থল ছিল।

الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ

অর্থাৎ-এ এলাকাটি তোমাদের জন্যে (লৌহে মাহফুজে) পূর্ব নির্দিষ্ট। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধরদেরকে আল্লাহ পাক শামদেশের রাজত্ব দান করবেন বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন হযরত মূসা (আঃ) সে প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে জেহাদে অংশ গ্রহণের জন্যে অনুপ্রাণিত করেছেন। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে,

যাদের হাতে আল্লাহ পাকের এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তারা হবে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। অতএব, রাজত্ব, আধিপত্য এবং ক্ষমতা লাভের এ সুবর্ণ সুযোগ তোমরা হারাবে না। যদি কাপুরুষের মত জেহাদ থেকে বিমুখ হও তবে গোলামী, অবমাননা তোমাদের ভাগ্যে অবধারিত। এতে একথা প্রমাণিত হয়, কারো তকদীরে কোন কিছু লিপিবদ্ধ থাকলেও আল্লাহ পাকের মর্জি মোতাবেক তার জন্যে চেষ্টা করা জরুরী। আল্লাহ পাক বন্দাকে তার মেহনতের ফল দান করেন।

দ্বিতীয়ত, কোন সম্প্রদায় যদি জেহাদে অবতীর্ণ হয়, বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দান করে তবে আল্লাহ পাক তাকে দান করেন স্বাধীনতা, সম্মান ও সাফল্য। পক্ষান্তরে যদি কোন জাতি কাপুরুষতার পরিচয় দেয় তবে পরাধীনতা ও পরাজয় তার ভাগ্যে জোটে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) আলোচ্য বাক্যটির ব্যাখ্যায় ইমাম কাতাদা ও সুদ্দী (রহঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তারা বলেছেন, এর অর্থ হলো, সেই পবিত্র ভূমি তোমাদের জন্যে লিখে দিয়েছেন অর্থাৎ জেহাদ করে তাতে প্রবেশ করা তোমাদের জন্যে ফরয করে দিয়েছেন যেমন, নামাজ রোযাকে ফরয করেছেন।[১]

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী আলোচ্য আয়াতের এ অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাক লওহে মাহফুযে লিখে দিয়েছেন, পবিত্র ভূমি তোমাদের আবাস-স্থল হবে। তবে এ অবস্থায় একটি শর্ত উহ্য থাকবে, যদি তোমরা ঈমান আনয়ন কর এবং আনুগত্য প্রকাশ কর, তবে এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন যে, পবিত্র ভূমি তোমাদের আবাস-স্থল হবে। এ শর্তটি উহ্য রাখা প্রয়োজন এজন্যে যে, যখন বনী ইসরাঈল নাফরমানী করল তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ

فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ- এ জমিন তাদের জন্যে হারাম করে দেয়া হলো। যদি তারা নাফরমানী না করত, তবে তাদের পক্ষে তাতে প্রবেশ করা সম্ভব হতো এবং পবিত্র ভূমি তাদের আবাস-স্থল হয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহর নাফরমানীর কারণে পবিত্র ভূমি তাদের জন্যে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, এ দু'টি আয়াতের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে অর্থাৎ যারা আল্লাহর হুকুমের তাবেদার হবে তাদের

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪২৯

জন্যে পবিত্র ভূমি আবাস-স্থল হওয়া লিপিবদ্ধ। আর যারা নাফরমান হবে তাদের জন্যে পবিত্র ভূমি হারাম করে দেয়া হয়েছে। অথবা এর অর্থ হলো, পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ ৪০ বছর যাবত হারাম করা হলো। হারাম করার কথা যে আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে তার সময়সীমা ৪০ বছর। এ সময় শেষ হওয়ার পর পবিত্র ভূমিকে তাদের জন্যে আবাস-স্থল করা হয়েছে।

এবনে এসহাক (রঃ) লিখেছেনঃ শব্দটির অর্থ হলো, আল্লাহ্ পাক পবিত্র ভূমি তোমাদেরকে দান করেছেন এবং তোমাদের জন্যে নিদিষ্ট করে দিয়েছেন (তোমরা তা অবশ্যই পাবে)।

কালবী (রঃ) বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন লেবাননে পৌঁছেন তখন আল্লাহ্ পাক তাঁকে সম্বোধন করে এরশাদ করেনঃ তুমি সম্মুখের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তোমার দৃষ্টি যত দূর যায় তত দূর পবিত্র ভূমি, আর তা তোমার সন্তান-সন্ততিদের উত্তরাধিকার।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ্ পাক যখন হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন যে, পবিত্র ভূমি তোমাকে এবং তোমার সম্প্রদায়কে প্রদান করা হবে। এ পবিত্র ভূমির অর্থ হলো, সিরিয়া বা শাম দেশ। ইতিপূর্বে সেখানে জালেম, অহংকারী কেনানী সম্প্রদায়ের লোকেরা আবাদ ছিল। ফেরাউনের ব্যাপার শেষ হওয়ার পর বনী ইসরাঈল যখন মিশরে আবাদ হলো তখন আল্লাহ্ পাক তাদের শাম দেশের 'আরিহা' নামক স্থানে গমনের আদেশ দিলেন। এ স্থানটিই ছিল পবিত্র ভূমি। এ স্থানে এক হাজার আবাদি ছিল, প্রত্যেক বস্তিতে অনেক অনেক বাগ-বাগিচা ছিল।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে মূসা! আমি এ জমিনকে তোমাদের আবাস-স্থল রূপে নির্দিষ্ট করেছি। তোমরা সেখানে যাও এবং সেখানকার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে জেহাদ কর। আমি তোমাদেরকে বিজয় দান করবো এবং নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন প্রতিনিধি নির্বাচন কর যে তার গোত্রের তরফ থেকে আল্লাহর হুকুম পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তাই মূসা (আঃ) ১২ জন নেতা নির্বাচন করলেন এবং বনী ইসরাঈলকে নিয়ে আরিহার দিকে অগ্রসর হলেন। পথে এক ব্যক্তির সাথে তাদের দেখা হলো। সে ছিল জালেম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। সে এত দীর্ঘ দেহী ছিল যে, মেঘমালা ছিদ্র করে সে পানি পান করতো এবং সমুদ্রের তলদেশ থেকে মাছ ধরে সূর্যের তাপে ভুনে ভক্ষণ করতো। এ ব্যক্তির নাম ছিল আওজ এবনে ওনক। যখন বন্যার পানির কারণে পাহাড় ডুবে যেতো তখন পানি তার হাঁটুর নীচে থাকতো। এ ব্যক্তি ৩ হাজার বছর জীবিত ছিল।

অবশেষে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-এর হাতে তাকে ধ্বংস করেন। তার ধ্বংসের অবস্থা এই হয়েছিলো যে, হযরত মূসা (আঃ) তাঁর জাতিকে নিয়ে যখন তাদের এলাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন সে বিরাট এক পাথর উত্তোলন করেছিল যা দ্বারা সে চেয়েছিল হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গীদেরকে নিপাত করতে। আল্লাহ পাক হুদহুদ নামক পাখিকে তার ধ্বংসের জন্যে মোতায়েন করলেন। সে যে বিরাট পাথরটিকে মাথার উপর তুলে ধরেছিল তার মাঝখানে হুদহুদ তার ঠোঁট দ্বারা ছিদ্র করে দিল। ফলে ঐ ছিদ্রে আওজের মাথা ঢুকে গেল এবং গর্দানে এসে ফেঁসে গেল এবং সে ধরাশায়ী হলো। এমন সময় মূসা (আঃ) আগমন করলেন। তাকে ধরাশায়ী পেয়ে হত্যা করলেন। তার মায়ের নাম ছিল ওনক। তিনি হযরত আদম (আঃ)-এর কন্যা ছিলেন।

যাহোক, হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রেরিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে যখন আওজের সাক্ষাত হলো, সে তাদের সকলকে ধরে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল এবং তার স্ত্রীকে বললো, এরা আমাদের সঙ্গে লড়াই করতে চায়। আমি এদেরকে এখনই পদদলিত করে শেষ করে দিচ্ছি। তার স্ত্রী বললো না, এ কাজ করোনা, বরং এদেরকে ছেড়ে দাও যাতে করে তারা এখানে যা কিছু দেখেছে তা স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট বর্ণনা করতে পারে। তখন সে তার স্ত্রীর কথা রাখলো এবং মূসা (আঃ)-এর প্রতিনিধিদের ছেড়ে দিল।

অন্য একটি বর্ণনার রয়েছে, আওজ তার আস্তিনে ১২ প্রতিনিধিকে ঢুকিয়ে নিল এবং তাদের বাদশাহর সম্মুখে নিয়ে ছেড়ে দিল। বাদশাহ হুকুম দিল তোমরা ফেরত যাও এবং যা কিছু এখানে দেখেছ তা তোমাদের সম্প্রদায়ের নিকট বর্ণনা কর। তখন আল্লাহ পাক তাদের বাগানে যে ফল দিয়েছিলেন তার অবস্থা এই ছিল, আঙ্গুরের একটি ছড়া এত বড় হতো যে, তাকে পাঁচ জন মানুষ বহন করতো। আর আনার এত বড় হতো যে, একটি আনারের বিচি বের করে দিলে তার ছিলকা বিছিয়ে পাঁচজন লোক তাতে বসতে পারত।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বগভীর সূত্রে এসব ঘটনা বর্ণনা করার পর লিখেছেন, এগুলো কিছুটা অতিরঞ্জিত মনে হয়। হাদীস শাস্ত্রের পারদর্শী-গণ এ ধরণের কথা অস্বীকার করেছেন। তবে একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, সে যুগের মানুষ অনেক দীর্ঘদেহী হতো। আর তাদের মধ্যে সর্বাধিক দীর্ঘ এবং সর্বাধিক শক্তির অধিকারী ছিল আওজ নামক এ ব্যক্তি। হযরত মূসা (আঃ) প্রেরিত প্রতিনিধিরা যখন তাঁর নিকট থেকে প্রত্যাবর্তন করলো এবং সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো তখন তিনি আদেশ দিলেন, এসব ঘটনা মানুষের নিকট প্রকাশ করোনা। কিন্তু দু'জন ব্যতীত আর সবাই এ আদেশ অমান্য করলো এবং স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট প্রকাশ

করে দিল। যে দু' ব্যক্তি হযরত মূসা (আঃ)-এর আদেশ মেনেছিলেন তারা হলেন ইউশা এবনে ননু এবনে আফরাহাম এবনে ইউসুফ (আঃ), আর অন্য জন হলেন কালেব এবনে ইউহান্না। ইউশা হযরত মূসা (আঃ)-এর বিশেষ খাদেম ছিলেন। আর কালেব ছিলেন মূসা (আঃ)-এর ভগ্নিপতি। হযরত মূসা (আঃ)-এর ভগ্নি মরয়ম বিনতে এমরানের স্বামী।

বনী ইসরাঈল যখন আমালেকা জাতির অবস্থা জানতে পারে তখন চিৎকার করে বলতে থাকে হায় আক্ষেপ, আমরা যদি মিশরেই মরে যেতাম কত ভাল হতো! যদি এখানে না আসতাম কত ভাল হতো!! তাদের মধ্যে কিছু লোক বললো, চল আমরা মূসাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নেতা মনোনীত করে মিশর প্রত্যাবর্তন করি।[১]

আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের একথাকে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ

বনী ইসরাঈল বললোঃ হে মূসা! ঐ পবিত্র ভূমিতে অত্যন্ত শক্তিশালী মানুষ রয়েছে। তাদের সঙ্গে লড়াই করাতো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের দৈহিক শক্তি, বিরাট সৈন্য বাহিনী, তাদের অর্থ-সম্পদের পরিবৃদ্ধি এবং তাদের অস্ত্র-শস্ত্র এত বেশী যে আমরা তাদের মোকাবেলা করতে পারবো না। তাই তারা বললো, পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঃ

وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ

অর্থাৎ- হে মূসা! যতক্ষণ আমালেকা সম্প্রদায় পবিত্র ভূমি থেকে না বের হবে, আমরা কোন অবস্থাতেই সেখানে প্রবেশ করবো না। হ্যাঁ যখন তারা বের হয়ে যাবে তখন আমরা প্রবেশ করবো। পবিত্র ভূমিতে গমনে আমাদের কোন আপত্তি নেই। তবে দুর্ধর্ষ আমালেকা জাতির সঙ্গে লড়াই করার শক্তি আমাদের নেই।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৩০-৩২

قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ
اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ
غٰلِبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٣﴾

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ
اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ
لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ
الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ
يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۗ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٦﴾

তরজমা

(২৩) ভীত লোকদের মধ্য হতে দু'জন লোক, যাদের উপর আল্লাহ পাক নেয়ামত নাযিল করেছেন বলল, তোমরা নগরের দ্বার পর্যন্ত তো প্রবেশ কর, এরপর যখন তোমরা জয়ী হবে এবং যদি মোমেন হও, তবে আল্লাহ তায়ালার উপরই তোমাদের ভরসা করা উচিত।

(২৪) তারা বলল, হে মূসা! যে পর্যন্ত নগরবাসীগণ সেখানে থাকে, আমরা কখনও তাতে প্রবেশ করব না, অতএব, তুমি বরং তোমার পালনকর্তা উভয়ে গমন কর এবং লড়াই কর, আমরা অবশ্যই এখানে বসে থাকব।

(২৫) মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে নিবেদন করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি শুধু আমার ও আমার ভ্রাতার উপর অধিকার রাখি (এতদ্ব্যতীত, অন্যদের উপর আমার কোন অধিকার নেই। এমন অবস্থায় যখন তারা জেহাদে অগ্রসর হয় না) তুমিই আমাদের ও এ ফাসেক জাতির মধ্যে মীমাংসা করে দাও।

(২৬) আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ তবে নিশ্চয় ঐ পবিত্র ভূমি ৪০ বছর পর্যন্ত তাদের উপর হারাম করে দেয়া হলো, তারা (দিশেহারা হয়ে) যমীনে ঘুরে বেড়াবে। অতএব, নাফরমানদের জন্যে আফসোস করোনা।

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আঃ) যখন বনী ইসরাঈলকে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করার আহবান জানালেন তখন তারা সে আহবানে সাড়া দিতে রাজী হলোনা এবং বলল, দুর্দান্ত জাতির সঙ্গে লড়াই করার সাহস আমাদের নেই।

অবশেষে তাদেরই দু' ব্যক্তি তখন সাহস করে যে কথা বলেছিলো, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক তারই উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা আল্লাহকে ভয় করত, যাদের প্রতি আল্লাহ পাক নেয়ামত দান করেছেন তাদের মধ্যে দু'জন বললেন, "তোমরা মিথ্যাই ভয় করছ, একবার শুধু সাহস করে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড় এবং দ্বারে ঢুকে যাও, তোমরা যখন তাতে ঢুকে যাবে তখন দেখবে যে বিজয় তোমাদের এবং আল্লাহ পাকের সাহায্য আসবে, কেননা যারা নিজেকে সাহায্য করে আল্লাহ পাকও তাদের সাহায্য করেন"। এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, যার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকে, অন্যের ভয় তার অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না।

اَلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ

(যাদের অন্তরে ছিল আল্লাহর ভয়) যেহেতু ঐ দু' ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর ভয় ছিল তাই বনী ইসরাঈলের লোকেরা যখন ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল তখন তাদের মধ্যেই দু'জন অকুণ্ঠ চিত্তে এমন সৎ সাহসের পরিচয় দিলেন।

যে দু'জন এমন সৎ সাহসের পরিচয় দিলেন, তারা হলেন হযরত ইউশা বিন নুন এবং কালেব বিন ইউহান্না।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ দু' ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের লোক ছিল না, বরং আমালেকা সম্প্রদায়ের লোকই মুসলমান হয়ে হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট চলে এসেছিল। এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হলে আয়াতের অর্থ হবে এই, ঐ সম্প্রদায়ের দু' ব্যক্তি বলেছিল যাদেরকে বনী ইসরাঈল ভয় করতো। সাঈদ এবনে যোবায়েরের পাঠ রীতি এ অর্থের সমর্থক, কেননা তিনি يَخَافُوْنَ-এর স্থলে يُخَافُوْنَ পাঠ করতেন।[১]

اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৩২
তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৯৯

অর্থাৎ যাদের প্রতি আল্লাহ পাক নেয়ামত দান করেছেন, আর এ নেয়ামত হলো আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এবং ঈমানের বরকতে তাদের অন্তরে এক প্রকার প্রশান্তি ছিল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক যাকে ঈমানের তৌফিক দান করেন তাকে মনের শান্তিও দান করেন।

ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ

অর্থাৎ তোমরা আমালেকা সম্প্রদায়ের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছে যাও এবং তাদের প্রতি হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়। শহরের ভেতরেই তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখ, যেন জঙ্গল বা ময়দানে দিকে পলায়ন করতে না পারে। অতএব, তোমরা তাদেরকে ভয় করোনা।

فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ

তোমরা যখন তাদের দ্বারে ঢুকে পড়বে তখন তোমরা অবশ্যই বিজয়ী হবে। কেননা, আল্লাহ পাক তোমাদের বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন। আর আল্লাহ পাকের এ সুসংবাদ অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। যেহেতু ঐ দু' ব্যক্তি হযরত মূসা (আঃ)-এর নবুওয়্যাতের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন, ঈমান এনেছেন আল্লাহ পাকের প্রতি, তাই হযরত মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে সুসংবাদ তারা পেয়েছেন তার প্রতিও ছিল তাদের পূর্ণ বিশ্বাস। এজন্যেই তারা আরো বলেছেনঃ

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ– যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও তবে এক আল্লাহর প্রতিই ভরসা করা উচিত। আর আল্লাহর প্রতি ভরসা বা নির্ভর করাই হলো মোমেনের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও, যদি তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর তবে তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি তাওয়াক্কুলের শক্তি অর্জন কর।

## তাওয়াক্কুলের তাৎপর্য

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বর্তমান যুগের মুসলিম সমাজে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে কিছুটা ভুল ধারণা বিরাজমান রয়েছে। তাওয়াক্কুলের অর্থ এক আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং এবং ভরসা করা। কোন ব্যাপারে চেষ্টা-তদ্বীর করা, প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণের আয়োজন করা আদৌ তাওয়াক্কুল বিরোধী কাজ নয়, বরং বৈধ উপায়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করা এবং সর্বাত্মক চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য। যারা প্রকৃত

মোমেন, তারা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করে, চেষ্টা–তদ্বীরে কোন ত্রুটি করে না, বৈধ উপায়ে স্বীয় শক্তি-সামর্থ্য কাজে লাগায় কিন্তু নিজের শক্তির উপর ভরসা করে না এবং নিজের চেষ্টাতেই যে উদ্দেশ্য সফল হবে তা মনে করে না, বরং নিজের চেষ্টার ফল আল্লাহ পাক দান করবেন- একথার প্রতি বিশ্বাস করে। পক্ষান্তরে, যে মোমেন নয় সে তার চেষ্টার উপরই নির্ভর করে। অতএব নিঃশ্চেষ্ট হয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থেকে আল্লাহর তরফ থেকে হবে বলে বিশ্বাস করার নাম তাওয়াক্কুল নয়, বরং কল্পনা বিলাস মাত্র।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى

"মানুষ শুধু তার চেষ্টার ফলই লাভ করবে"। আমরা একথার সত্যতা লক্ষ্য করি প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূতঃ পবিত্র জীবনে, তিনি এক মহূর্তের জন্যেও নির্লিপ্ত জীবন যাপন করেননি। তাঁর সংগ্রামী জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের বিবরণ সংরক্ষিত রয়েছে হাদীস শরীফে। মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় ১৩টি বছর অতিবাহিত হয়েছে নির্যাতীত-উৎপীড়িত অবস্থায়, চরম নির্যাতনের মধ্যেও তাঁকে দেখা যায় আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থাবান ও নির্ভরশীল অবস্থায়। শোয়াবে আবি তালেবের দুর্দিনে বা তায়েফের সেই কঠিন মুহূর্তে যখন তাঁর দেহ মোবারক পৌত্তলিকদের প্রস্তরাঘাতে রক্তাপ্লুত তখনও তাঁর ভরসায় এতটুকু ভাটা পড়েনি। তিনি আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে ঘর থেকে বের হয়েছিলেন, এক মুহূর্তের জন্যেও তিনি দাওয়াতের কাজ বন্ধ করেননি। সর্বাবস্থায় এক আল্লাহর প্রতি ভরসাই ছিল তাঁর সাধনার পথের পাথেয়।

হিজরতের রাতে যখন পৌত্তলিকরা তাঁর বাসস্থান ঘেরাও করে রেখেছিল, তাঁকে হত্যা করার জন্যে যুক্তফ্রন্ট করেছিল এবং সকল গোত্রের প্রতিনিধিরা তাঁর বাড়ীর চার পার্শ্বে উপস্থিত ছিল, তখনও তিনি এক আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করে ঘর থেকে বের হয়েছিলেন। তাঁর ভরসা পৃথিবীর কোন কিছুর প্রতিই ছিল না, জাগতিক কোন উপায়-উপকরণের ব্যবস্থাও ছিল না। তবে হ্যাঁ সুদৃঢ় বিশ্বাস, আস্থা, ভরসা, ঈমান, একীন এবং তাওয়াক্কুল ছিল এক আল্লাহ পাকের প্রতি। আমরা বদরের যুদ্ধে কি দেখি?

একদিকে ৩১৩ জন নিরস্ত্র-প্রায় মুসলমান অন্যদিকে ১০০০ সশস্ত্র অশ্বারোহী দুশমন হামলায় উদ্যত রয়েছে। দুশমন মক্কা শরীফ থেকে প্রায় ২০০ মাইল দূরে এগিয়ে এসেছে মুসলমানদের উপর হামলা করার জন্যে। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফ থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে এগিয়ে গেছেন হানাদার বাহিনীর মোকাবেলায়। ৩১৩ জন সাথীর মধ্যে প্রত্যেক ৯ জনের জন্যে ছিল

একখানি তরবারী। আর ঘোড়া ছিল মাত্র দুটি। এ ছিল যথাসাধ্য চেষ্টা-তদ্বীর কিন্তু এ চেষ্টা-তদ্বীরের প্রতি তাঁর ভরসা ছিল না। ভরসা ছিল একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি। তাই যুদ্ধ যখন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বদরের ঐতিহাসিক রণাঙ্গণের এক প্রান্তে আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদারত অবস্থায় এ দোয়া করেছিলেন-

"হে আল্লাহ! যদি এ ক্ষুদ্র দলটিকে তুমি ধ্বংস করে দাও তবে পৃথিবীতে আর তোমার বন্দেগী করা হবে না"।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের প্রতি সম্পূর্ণ ভরসা রাখতেন এবং উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে যথাসাধ্য প্রয়োজনের আয়োজনও করতেন। তিনি কোন দিনই নিষ্ক্রীয় অবস্থায় বসে থাকেননি, কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে নিষ্ক্রীয়তা, ক্লীবতা, জড়তা, অসলতা অপছন্দনীয় কাজ। তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে হযরত মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়কে একদিকে দুশমনের উপর অতর্কিতে আক্রমণ পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়েছেন, অন্যদিকে এক আল্লাহর প্রতি ভরসা করারও তাগিদ করেছেন।

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا

হযরত মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায় বললো, যতক্ষণ আমালেকা সম্প্রদায় পবিত্র ভূমিতে থাকবে ততক্ষণ কোন অবস্থাতেই আমরা সেখানে যেতে পারব না। অতএব, তুমি এবং তোমার প্রতিপালক যাও এবং তাদের সঙ্গে লড়াই কর। আমরা এখানেই বসে রইলাম। এমনি ধৃষ্টতাপূর্ণ জঘন্য উক্তির দৃষ্টান্ত মানব-ইতিহাসে হয়তো আর একটিও খুঁজে পাওয়া যায় না। এ বিরল দৃষ্টান্ত শুধু বনী ইসরাঈলের ন্যায় হতভাগা কোপগ্রস্ত জাতিই দেখাতে পেরেছে।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ হযরত মেকদাদ এবনে আসওয়াক (রাঃ) একটি উচ্চ মর্তবা লাভ করেছেন। যদি সে মর্তবা আমি লাভ করতাম তবে তা হতো আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। মেকদাদ (রাঃ)-কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুশরেকদের মোকাবেলা করার আহবান জানিয়েছিলেন। তখন মেকদাদ (রাঃ) আরজ করেছিলেনঃ আমরা মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মত বলবো না যে, "তুমি এবং তোমার প্রভু যাও এবং লড়াই কর, আমরা এখানেই বসে থাকবো"। বরং আমরা হুজুরের ডানে-বামে, অগ্র-পশ্চাতে থেকে দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করবো। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক খুশীর ভাব প্রকাশিত হয় এবং তিনি অত্যন্ত খুশী হন (বোখারী শরীফ)।

যখন বনী ইসরাঈল আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হয় এবং ইউশা ও কালেবকে মেরে ফেলার ইচ্ছা করে, তখন হযরত মূসা (আঃ) তাদের প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং এই বলে দোয়া করেনঃ

قَالَ رَبِّ اِنِّیْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِیْ وَاَخِیْ

অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেনঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার নিজের প্রাণ এবং আমার ভাই ব্যতীত কারো উপর আমার অধিকার নেই তথা নাফরমানদের উপর আমার কোন অধিকার নেই। হযরত মূসা (আঃ) তাঁর জাতির অবাধ্য নাফরমানদের বিরুদ্ধে আল্লাহ পাকের নিকট এ অভিযোগ করলেন। এরপর এ আরজীও পেশ করলেনঃ

فَافْرُقْ بَیْنَنَا وَبَیْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِیْنَ

(অতএব, তুমি আমার এবং এ নাফরমানদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দাও।)

এখানে বিচ্ছেদের দুটি অর্থ হতে পারে-

(১) প্রকাশ্য বিচ্ছেদ

(২) অপ্রকাশ্য বিচ্ছেদ

প্রকাশ্যে হযরত মূসা (আঃ) এবং হারুন (আঃ) বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় থেকে দূরে সরে যাননি তথা প্রকাশ্য বিচ্ছেদ হয়নি, কিন্তু অপ্রকাশ্যে বিচ্ছেদ হয়েছে কেননা, ঐ নাফরমান বনী ইসরাঈল জাতি ৪০টি বছর আল্লাহর আযাব ভোগ করেছে এবং দিশেহারা হয়ে ঘুরেছে। আর হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারুন (আঃ) আল্লাহর নবী রসূল হিসেবে তাঁদেরকে প্রদত্ত মর্যাদা সহ শান্তিতে বসবাস করেছেন।

প্রশ্ন হতে পারে, হযরত মূসা (আঃ) ঐ কোপগ্রস্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বাস করেছেন এমন অবস্থায় আল্লাহর আযাব থেকে কিভাবে তিনি রক্ষা পেলেন?

এর জবাব এই, যেভাবে আযাবের ফেরেশতাগণ দোযখীদের সঙ্গে থাকেন কিন্তু দোযখের আযাবের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক থাকে না, অথচ প্রকাশ্যে এক সঙ্গেই থাকে কিন্তু বাস্তব অবস্থার দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর অবস্থানে থাকে। ঠিক এমনিভাবে ময়দানে তীহে আল্লাহর নাফরমানদের জন্যে শাস্তি এসেছে এবং হযরত মূসা (আঃ) এবং হারুন (আঃ)- এর জন্যে এসেছে শান্তি ও রহমত। এর আরো একটি সহজ দৃষ্টান্তের প্রতিও লক্ষ্য করা যেতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কারাগারে অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা হয়ে থাকে, আর সে কারাগারগুলোর ব্যবস্থাপনায় সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিয়োজিত থাকে। কারাগারেই তাদেরকে কর্মরত

থাকতে হয়। মাস শেষে এজন্যে তাদেরকে বেতন-ভাতা দেয়া হয় অথচ যারা বন্দী, তারা সেখানেই শাস্তি ভোগ করে।

## শিক্ষনীয় বিষয়

হযরত মূসা (আঃ)-এর জাতি নাফরমানীর কারণে আল্লাহর কোপগ্রস্ত হলো। তাই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً

অর্থাৎ ঐ পবিত্র ভূমি তাদের জন্যে ৪০ বছর পর্যন্ত হারাম করে দেয়া হলো। তারা সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না। এ ময়দানে তীহে দিশেহারা অবস্থায় মাথা ঠুকতে থাকবে। সকালে তারা তাদের দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে রওয়ানা হবে, কিন্তু সারা দিন চলার পর সন্ধ্যার সময় দেখবে যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিল সকালে সেখানেই হাযির হয়েছে সন্ধ্যায়। এজন্যেই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছেনঃ

فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

"হে মূসা! এ নাফরমানদের জন্যে তুমি আফসোস করোনা, কেননা তারা তাদের কর্মফলই ভোগ করেছে"।

এখানে শিক্ষণীয় বিষয় এই, হযরত মূসা (আঃ)-এর জাতি আল্লাহর নাফরমানী করার কারণে তাদের নবীর বর্তমানেই আল্লাহর আযাবের যোগ্য বিবেচিত হয়েছে। এতদ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগের আহলে কিতাবকে সতর্ক করা হয়েছে যে, যেভাবে হযরত মূসা (আঃ)-এর অবাধ্য হওয়ার কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা আল্লাহর আযাব ভোগ করেছে, তেমনি তোমরাও যদি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবাধ্য হও তবে তোমাদের শাস্তিও অবধারিত। তোমরা যাদের বংশধর তাদের মত তোমাদেরও ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে।

বস্তুতঃ ঘটনা তাই হয়েছিল। মদীনা শরীফের উপকণ্ঠে বনু নযীর ও বনু কোরায়জা নামক দুটি ইহুদী গোত্র বাস করতো। তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে সর্বদা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। সর্বদা মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বাঁধানোর চক্রান্ত করতো, মদীনা শরীফের যাবতীয় ঘটনা বাইরের দুশমনদের জানিয়ে দিত। প্রাণের মদীনা আক্রমণ করার জন্যে বাইরের শক্তিকে প্ররোচিত করতো। অবশেষে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাদের প্রতি শাস্তি নিপতিত হলো, পঞ্চম হিজরীতে অনুষ্ঠিত খন্দকের যুদ্ধের পর তাদেরকে মদীনা শরীফ থেকে বহিষ্কার করা হলো।

অন্যদিকে যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করলেন তারা লাভ করলেন অনন্ত অসীম নেয়ামত, সৌভাগ্য ও সম্পদ।

## উম্মতের মোহাম্মদীয়ার বৈশিষ্ট্য

হযরত মূসা (আঃ)-এর উম্মতকে শুধুমাত্র আমালেকা জাতির সঙ্গে জেহাদ করার আদেশ দেয়া হয়েছিল এবং তাদেরকে শাম দেশ বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা সে আদেশ অমান্য করেছে। অথচ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মতকে শুধু একটি জাতির বিরুদ্ধেই জেহাদের নির্দেশ দেয়া হয়নি, বরং সমগ্র বিশ্বের সকল দুর্ধর্ষ-দুরাত্মা, অবাধ্য, দুর্দান্ত, মানবতা ও সত্যের দুশমনদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

(সূরা তওবা)

অর্থাৎ-হে মোমেনগণ! তোমরা শত্রুকে চরম আঘাত হানতে বেরিয়ে পড়। হালকা এবং ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এবং তোমাদের শত্রুদের মূলোৎপাটন কর। আল্লাহ্‌র রাহে জান মাল দ্বারা জেহাদ কর। আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ (সূরা আনফাল)

"এবং শত্রুদেরকে হত্যা কর, তাদের সঙ্গে লড়াই কর, যতক্ষণ না অশান্তি উৎপাত উপদ্রব হয়"।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার উপর। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরাম এ মহান দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করেছিলেন। ফলে মুসলমানদের সাথে কৃত আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ হয়েছিল।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ الايه

বস্তুতঃ যারা ঈমানদার ও নেককার আল্লাহ পাক তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করবেন। আল্লাহ পাক খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এ অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। তদানীন্তন মুসলমানগণ ছড়িয়ে পড়েছিলেন সারা বিশ্বে।

ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মানবতার দুশমনের উপর। জেহাদ করেছেন সত্য ও ন্যায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বকালের জন্যে রসূল হিসেবে আগমন করেছেন এবং সমগ্র বিশ্বের জন্যে প্রেরিত হয়েছেন আর তাঁর আদর্শ সার্বজনীন, চির অপরিবর্তনীয়, চির অনুসরণীয়, তাই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব উম্মতে মোহাম্মদীয়ার উপর সর্বদাই অর্পিত থাকবে।

বনী ইসরাঈল জাতিকে জেহাদের আদেশ দেয়া হয়েছিল, তা তারা অমান্য করেছে। পরিণামে ৪০ বছর যাবত তারা শাম দেশের প্রতিশ্রুত বিজয় লাভ থেকে বঞ্চিত থাকে।

পক্ষান্তরে, উম্মতে মোহাম্মদীয়া প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের কারণে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সারা বিশ্বের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। বীরত্ব ও সৎ সাহস উম্মতে মোহাম্মদীয়ার বৈশিষ্ট্য। বিজয় মুসলমানদের প্রাপ্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বকালের সকল দেশের সকল মুসলমানের জন্যে একমাত্র আদর্শ।

يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ

এ বাক্যটির অর্থ হল চল্লিশ বছর যাবত বনী ইসরাঈলীরা দিশেহারা হয়ে ঘুরতে থাকবে, সেখান থেকে বের হওয়ার কোন পথ পাবে না।

## ঘটনার পরিসমাপ্তি

হযরত মূসা (আঃ) আমালেকা জাতির বিরুদ্ধে বনী ইসরাঈলকে জেহাদ করার যে আদেশ দিয়েছিলেন, যারা সে আদেশ অমান্য করেছে তারা সকলেই একে একে ময়দানে তীহে মৃত্যুবরণ করেছে। তাদের বংশধররা হযরত ইউশা (আঃ)-এর নেতৃত্বে আমালেকা জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এ ৪০ বছরের মধ্যে সকল অবাধ্য নাফরমান পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করে। হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত হারুন (আঃ)-এর এন্তেকালও ময়দানে তীহে হয়। এরপর হযরত ইউশা (আঃ) পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করেন (এবনে জরীর এবং এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন)।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ এ বর্ণনার ভিত্তিতে ঘটনা এভাবে ঘটেছে- যখন হযরত মূসা (আঃ)-এর এন্তেকাল হল এবং ময়দানে তীহে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হল তখন আল্লাহ পাক হযরত ইউশা (আঃ)-কে নবুওয়্যত দান করলেন, তিনি বনী ইসরাঈলকে বললেন, আল্লাহ পাক আমালেকা জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করার আদেশ

দিয়েছেন, সকলে একথার সত্যতা মেনে নেয় এবং তাঁর হাতে জেহাদের বয়আত করে এবং আরীহা নামক স্থানের দিকে অগ্রসর হয়। সঙ্গে বনী ইসরাঈলের পবিত্র বস্তু সমূহ যে সিন্দুকে ছিল তা-ও ছিল। আমালেকা জাতির আবাস-স্থল আরীহায় পৌঁছে তারা শহর ঘেরাও করে ফেলে আর তা অব্যাহত ছিল ছ' মাস যাবত। সপ্তম মাসের প্রথম দিন যুদ্ধের বিউগল বাজল, হঠাৎ বনী ইসরাঈল জাতি শহরের দেয়াল ভেঙ্গে ঢুকে পড়ল এবং আমালেকা জাতিকে হত্যা করতে লাগল, একেকটি আমালেকার ওপর আঘাত করতে লাগল। এটি ছিল জুমআর দিন। সারা দিন যুদ্ধ চলল, কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ শেষ হলোনা, সূর্য অস্তমিত হতে শুরু করল, এমন সময় হযরত ইউশা (আঃ)-দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! (অস্তগামী) সূর্যকে আমার দিকে ফিরিয়ে দাও। আর সূর্যকে বললেন, তুমি আল্লাহর হুকুম পালনে ব্যস্ত রয়েছ, আমিও আল্লাহর হুকুম পালনেই মশগুল রয়েছি, তুমি থেমে যাও, যাতে করে আমি আল্লাহর দুশমনদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারি, সূর্য প্রত্যাবর্তন করল, দিনকে একঘন্টা বড় করে দেয়া হল। এভাবে হযরত ইউশা (আঃ) সমস্ত আমালেকাকে হত্যা করলেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এরপর হযরত ইউশা (আঃ) শাম দেশের বাদশাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করলেন, এ অভিযানে ৩১ জন বাদশাহকে হত্যা করলেন এবং সমগ্র শামদেশে আধিপত্য বিস্তার করলেন। আঞ্চলিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন এবং যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ একত্রিত করলেন। কিন্তু যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ দগ্ধ করতে আসমান থেকে যে অগ্নি আসার নিয়ম ছিল তা আসেনি। হযরত ইউশা (আঃ) তখন অত্যন্ত অস্থির হলেন (হয়তো কোন গুনাহ হয়েছে), ওহী আসল- "যুদ্ধ লব্ধ সম্পদের কিছু জিনিস চুরি হয়েছে, বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দাও যেন পুনরায় তারা তোমার হাতে বয়আত করে"। আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক সবাই বয়আত করল, তবে এক ব্যক্তি বয়আত করার সময় হযরত ইউশা (আঃ)-এর হাতের সঙ্গে আটকে গেল, হযরত ইউশা (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে কি আছে? সে বলল, স্বর্ণের একটি জিনিস, তাতে হীরা-জহরত দ্বারা কাজ করা ছিল, সে ব্যক্তি উক্ত জিনিসটি চুরি করেছে। হযরত ইউশা (আঃ) গণিমতের মাল যা তখন কোরবান করা হত, তথা আসমান থেকে অগ্নি এসে তাকে জ্বালিয়ে ফেলত, তার মধ্যে ঐ আংটি এবং ঐ চোরকেও তার মধ্যে ফেলে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আসমান থেকে অগ্নি এসে সব কিছু শেষ করে দিল। এর কিছুদিন পর হযরত ইউশা (আঃ) এন্তেকাল করলেন, তার বয়স হয়েছিলো ১২৬ বছর। হযরত মূসা (আঃ)-এর পর ২৬ বছর যাবত তিনি বনী ইসরাঈল জাতির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৩৫-৩৬

## পাপিষ্ঠদের পরিণাম দেখে আক্ষেপ করোনা

এখানে এ-ও উল্লেখ্য, যখন হযরত মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈল জাতির ব্যাপারে আল্লাহ্‌র দরবারে বদদোয়া করলেন যে আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ করে দাও, তখন তাঁর অন্তরে একটু অনুতাপ হয়েছিল, তারই জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন?

فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ

অর্থাৎ- যারা পাপিষ্ঠ, যারা পাপাচারী, তাদের শোচনীয় পরিণাম দেখে তুমি আক্ষেপ করোনা, কেননা প্রত্যেককে অবশ্যই তার কর্মফল ভোগ করতে হবে।

পবিত্র কোরআন এ পর্যায়ে এ যুগের মানুষের জন্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে, যারা নাফরমানীর শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ্‌র কোপগ্রস্ত হয় তাদের জন্যে আফসোস করার অনুমতি নেই। কেননা কর্ম মাত্রেরই পরিণাম আছে। সৎ কর্ম হলে শুভ পরিণতি এবং অসৎ কর্ম হলে শাস্তি অবধারিত। আল্লাহ পাকের এ বিধান চিরন্তন, এ ব্যাপারে আফসোস করার কোন সুযোগ নেই।

বর্ণিত আছে যে, হতভাগা বনী ইসরাঈল জাতিকে মাত্র কয়েক মাইল স্থানের মধ্যে চল্লিশ বছর ঘোরা ফেরা করতে হয়েছে। আর তা করতে হয়েছে দিশেহারা অবস্থায়।

## হযরত হারুন (আঃ)-এর মৃত্যুর ঘটনা

সুদ্দী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি হারুনের মৃত্যুর ব্যবস্থা করব, তুমি তাকে অমুক পাহাড়ের নিকট নিয়ে আস। আদেশ মোতাবেক হযরত মূসা (আঃ) এবং হারুন (আঃ) নির্দিষ্ট পাহাড়ে পৌঁছে গেলেন, সেখানে তিনি এক বিস্ময়কর বৃক্ষ দেখলেন, যা ইতিপূর্বে দেখেননি। আর একটি বাড়ীও দেখলেন, যার ভেতর পালংক বিছানো ছিল আর খাটের ওপর বিছানা পাঁতা ছিল, সে বিছানা থেকে সুগন্ধি আসছিলো, হযরত হারুন (আঃ) এ দৃশ্য দেখে পছন্দ করলেন এবং বললেন- মূসা আমিতো এখানে নিদ্রিত হতে চাই। হযরত মূসা (আঃ) বললেন, নিদ্রিত হও। তখন হযরত হারুন (আঃ) বললেন, আশঙ্কা হচ্ছে যে, বাড়ীর মালিক যেন অসন্তুষ্ট না হয়ে যায়।

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, এ আশঙ্কা তুমি করোনা, বাড়ীওয়ালার ব্যাপার আমি দেখে নেব। এরপর হারুন (আঃ) বললেনঃ হে মূসা! আপনি আমার সঙ্গে শুয়ে পড়ুন। এখনই বাড়ীর মালিক আসবে এবং আমাদের উভয়ের প্রতি রাগ করবে।

অবশেষে তারা উভয়ে শুয়ে পড়লেন। নিদ্রিত অবস্থায় হযরত হারুন (আঃ)-এর মৃত্যু হয়ে গেল। যখন তাঁর মৃত্যুর অনুভূতি হলো তখন তিনি বললেন, হে মূসা! আমার চোখ দু'টি বন্ধ করে দিন। মৃত্যুর পর সে বাড়ীর বৃক্ষ এবং খাট আকাশের দিকে তুলে নেয়া হয়। হযরত মূসা (আ) তখন একাকী প্রত্যাবর্তন করলেন।

হযরত মূসা (আঃ)-কে একা প্রত্যাবর্তন করতে দেখে বনী ইসরাঈল বললোঃ যেহেতু বনী ইসরাঈল হারুনকে ভালবাসে কাজেই মূসা (আঃ)-এর অন্তরে তাঁর জন্য হিংসা হয়েছে। তাই তিনি তাঁকে হত্যা করেছেন। তখন হযরত মূসা (আঃ) বললেনঃ হে হতভাগার দল, হারুনতো আমার ভাই ছিল। তোমরা কি মনে কর যে, আমি তাঁকে হত্যা করেছি? কিন্তু যখন লোকেরা এ সম্পর্কে অনেক বেশী গুজব রটাতে লাগলো তখন হযরত মূসা (আঃ) দু' রাকাআত নামাজ আদায় করলেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন। এ দোয়ার বরকতে হযরত হারুন (আঃ)-কে বহনকারী ঐ খাটটি অবতরণ করলো এবং লোকেরা আসমান জমিনের মধ্যবর্তী স্থানে খাটটিকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখলো। তখন তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর কথার সত্যতা স্বীকার করলো।

এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রাঃ)-এর একটি কথা বর্ণিত আছে। তাঁর বর্ণনা এই, মূসা (আঃ) এবং হারুন (আঃ) যখন পাহাড়ে উঠলেন তখন হারুন (আঃ)-এর ইন্তেকাল হলো। কিন্তু বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আঃ)-কে বললো, তুমি হারুনকে হত্যা করেছ। হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি হত্যার অপবাদ দেয়ার কারণে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তখন আল্লাহ পাকের হুকুমে ফেরেশতাগণ হারুন (আঃ)-কে বনী ইসরাঈলের সম্মুখ দিয়ে নিয়ে গেলেন এবং ফেরেশতাগণ পরস্পর হযরত হারুন (আঃ)-এর মৃত্যুর কথা আলাপ-আলোচনা করলেন। তখন বনী ইসরাঈল বিশ্বাস করলো যে হযরত হারুন (আঃ)-এর ইন্তেকাল হয়েছে। এভাবে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে মিথ্যা অপবাদ থেকে নাজাত দিলেন। এরপর ফেরেশতাগণ হযরত হারুন (আঃ)-এর জানাজা দিলেন এবং কোথাও দাফন করলেন। তাঁর দাফনের স্থানটি একটি গাধা ব্যতীত আর কেউ দেখেনি।

এ প্রসঙ্গে আমর এবনে ময়মুন অন্য একটি বিবরণ দিয়েছেন যে, হযরত মূসা (আঃ) যখন ময়দানে তীহে ছিলেন তখনই হারুন (আঃ)-এর ইন্তেকাল হয়। তারা উভয়ে একটি পাহাড়ের গর্তের দিকে গমন করেন। সেখানে হযরত হারুন (আঃ)-এর ইন্তেকাল হয়। হযরত মূসা (আঃ) তাঁকে দাফন করে প্রত্যাবর্তন করলেন। বনী ইসরাঈল বললো, যেহেতু হারুন (আঃ)-এর সঙ্গে আমাদের মহব্বত ছিল এ হিংসায় আপনি তাঁকে হত্যা করেছেন। হযরত মূসা (আঃ) অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন। আল্লাহ পাক ওহী প্রেরণ করলেন যে, বনী ইসরাঈলকে হারুনের কবরের দিকে নিয়ে যাও। হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে নিয়ে

হযরত হারুন (আঃ)-এর কবরের নিকট গেলেন এবং হারুনকে (আঃ) ডাকলেন। তিনি মাথার বালু ফেলতে ফেলতে কবর থেকে বেরিয়ে আসলেন। তখন হযরত মূসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি তোমাকে হত্যা করেছি? হযরত হারুন (আঃ) বললেন, না। আমার স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়েছে। তখন হযরত মূসা (আঃ) বললেন, তুমি তোমর নিদ্রা-স্থলে ফিরে যাও (হযরত হারুন (আঃ) ফিরে গেলেন) এবং বনী ইসরাঈলও ফেরত আসলো।[১]

## হযরত মূসা (আঃ)-এর ইন্তেকালের ঘটনা

এবনে এসহাকের বর্ণনা হলো হযরত মূসা (আঃ) মৃত্যুকে অপছন্দ করতেন। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলেন হযরত মূসা (আঃ)-এর দৃষ্টিতে মৃত্যু প্রিয় হোক। এজন্যে আল্লাহ পাক হযরত ইউশা এবনে নুনকে নবুওয়্যত দান করলেন। হযরত ইউশা সকাল-সন্ধ্যায় হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট গমন করতেন এবং হযরত মূসা (আঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেনঃ হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ পাক কি নতুন বাণী আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন?

হযরত ইউশা (আঃ) কোন কিছু বর্ণনা করতেন না এবং একথা বলে জবাব দিতেন, হে আল্লাহর নবী! আমি কি সুদীর্ঘ সময় আপনার সংসর্গে ছিলাম না? আমি এ সময়ের মধ্যে নিজে কোন কথা তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করি নাই যে, আল্লাহ পাক কি নতুন বাণী পাঠিয়েছেন? বরং অবস্থা এই ছিল যে, আপনি স্বেচ্ছায় নিজের তরফ থেকেই বর্ণনা করতেন। এ জবাব শ্রবণ করার পর তাঁর অন্তরে জীবনের উপর ঘৃণা এবং মৃত্যুর প্রতি আকর্ষণ তৈরী হয়েছিল। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট মৃত্যুর ফেরেশতা এসে বললো, স্বীয় প্রতিপালকের দাওয়াত কবুল করুন। হযরত মূসা (আঃ) মৃত্যুর ফেরেশতাকে একটি চড় মারলেন। ফরে তাঁর একটি চক্ষু আহত হলো। যমদূত আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হয়ে আরজী পেশ করলেনঃ হে আল্লাহ! তুমি তোমার এমন বন্দার নিকট আমাকে প্রেরণ করেছ যে মৃত্যুমুখে পতিত হতে ইচ্ছুক নয় এবং সে আমার চক্ষুকে আহত করে ফেলেছে ।

আল্লাহ পাক হযরত আজরাইল (আঃ)-কে চক্ষু দান করে আদেশ দিলেন, আমার বন্দার নিকট পুনরায় যাও এবং জিজ্ঞাসা কর, তুমি কি আরো জীবিত থাকার আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর? যদি তাই হয় তবে নিজের হাত কোন গরুর পৃষ্ঠ-দেশে রাখ। তোমার হাতের নীচে যত চুল আসবে তুমি তত বছর জীবিত থাকবে।

মালাকুল মওত হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট আল্লাহ পাকের এ বাণী পৌঁছালেন। হযরত মূসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর কি হবে?

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৩৭

মালাকুর মওত বললেন, অতঃপর আপনাকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে। তখন হযরত মূসা (আঃ) বললেনঃ যদি তাই হয় তবে এখনই মৃত্যু হোক। এরপর আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন এই বলেঃ হে পরওয়াদেগার! আমাকে পবিত্র ভূমির এত নিকটে পৌঁছে দাও যেন একটি ইঁট নিক্ষেপ করার দূরত্ব থাকে।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যদি আমি সেখানে থাকতাম তবে রাস্তার পার্শ্বে লাল টিলার নিকট মূসার কবর আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম।

হযরত ওহাব (রঃ) বর্ণনা করেন, একবার হযরত মূসা (আঃ) কোন কাজে বাইরে আসছিলেন। তিনি দেখলেন ফেরেশতাদের একটি দল কবর খনন করছেন, এমন কবর তিনি আর কখনো দেখেননি। এত সুন্দর এই আলোয় ঝলমল করা কবর। তখন তিনি ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ফেরেশতাগণ! কার জন্যে তোমরা এত সুন্দর কবর খনন করছো? ফেরেশতাগণ জবাব দিলেনঃ এমন এক বন্দার জন্যে যিনি আল্লাহর পাকের দরবারে অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন। হযরত মূসা (আঃ) বললেনঃ সে বান্দা আল্লাহ পাকের দরবারে অত্যন্ত মর্তবা-সম্পন্ন হবেন, যাঁর শোবার স্থানের মত আমি আর কখনও দেখিনি। ফেরেশতাগণ বললেন, হে আল্লাহর নির্বাচিত ব্যক্তি! আপনি কি পছন্দ করেন যে, এটি হোক আপনার শয়ন কক্ষ। তাহলে এর মধ্যে অবতরণ করুন ও শুয়ে পড়ুন আর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে মনোনিবেশ করুন।

হযরত মূসা (আঃ) কবরে শুয়ে পড়লেন এবং আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করলেন। এরপর হালকা নিঃশ্বাস নিলেন এবং আল্লাহ পাকের হুকুমে তাঁর প্রাণ বায়ু বেরিয়ে গেল। হযরত মূসা (আঃ)-এর বয়স হয়েছিল ১২০ বছর।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ
مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ۭ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ۭ قَالَ
اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٧﴾ لَىِٕنْۢ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ
لِتَقْتُلَنِيْ مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّىْٓ اَخَافُ
اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٨﴾ اِنِّىْٓ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْۗءَ بِاِثْمِيْ وَاِثْمِكَ
فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَذٰلِكَ جَزٰۗؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾
فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٣٠﴾

## তরজমা

(২৭) (হে রসূল!) আপনি আহলে কিতাবদেরকে আদম (আঃ)-এর পুত্রদ্বয়ের ঘটনা সঠিকভাবে পাঠ করে শুনিয়ে দিন। যখন তারা উভয়েই আল্লাহ তায়ালার দরবারে কিছু হাদিয়া পেশ করল, তখন একজনের (হাবিলের) হাদিয়া কবুল হলো এবং অন্য জন থেকে (কাবিলের) কবুল হলোনা। সে বলল, আমি অবশ্যই তোমাকে (অর্থাৎ প্রথম জনকে) হত্যা করব। (প্রথম জন) বলল, (এ ব্যাপারে আমারতো কোন দোষ নেই, কারণ) আল্লাহ তায়ালা হাদিয়া শুধু পরহেযগার লোকদের তরফ থেকেই কবুল করেন।

(২৮) যদি তুমি আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আমার দিকে স্বীয় হস্ত প্রসারিত কর তবে আমি তোমাকে হত্যা করার জন্যে তোমার দিকে হস্ত প্রসারিত করবো না। (কারণ) আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করি।

(২৯) আমার একান্ত ইচ্ছা যে, তুমি আমার এবং তোমার সমস্ত গুনাহর বোঝা মাথায় তুলে লও, অতএব তুমি দোযখবাসী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, আর এটিই হয় অত্যাচারীদের পরিণাম।

(৩০) অতঃপর তার নফ্স (কুপ্রবৃত্তি) তাকে স্বীয় ভ্রাতাকে হত্যা করার জন্যে উত্তেজিত করে তুলল। পরে সে তাকে হত্যা করল। পরিণামে সে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আহলে কিতাবদের একটি মিথ্যা দাবী খণ্ডন করা হয়েছে তা হলো–

نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ

"আমরা আল্লাহর পুত্র ও বন্ধু (নাউযুবিল্লাহ)"। এ আয়াতে আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-এর পুত্রদ্বয় হাবিল ও কাবিলের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হাবিল ও কাবিল হযরত আদম (আঃ)-এর দু' পুত্র ছিল। একজন আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। তাই আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য হয়েছে আর অন্য জন আল্লাহর নাফরমান ও অবাধ্য হয়েছে, তাই শাস্তি যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আহলে কিতাবদের এই দাবী "আমরা আল্লাহর পয়গম্বরদের বংশধর" তাদের জন্যে উপকারী হবে না। যদি বংশগত সম্পর্ক কারো জন্যে উপকারী হতো তবে হযরত আদম (আঃ)-এর পুত্র কাবিলের জন্যে হতো। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। আখেরাতে কর্মেরই গুরুত্ব হবে, সৎ কর্মের শুভ পরিণতি অবশ্যম্ভাবী, আর অসৎ কর্মের শাস্তি অবধারিত।[১]

### হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার কর

দ্বিতীয়ত, এ ঘটনা দ্বারা বিশেষতঃ বনী ইসরাঈলকে নসিহত করা এবং সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্ব মানবকে হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা এবং অহংকার ও আত্মম্ভরীতার কুফল সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

বনী ইসরাঈলকে বিশেষভাবে নসিহত করা হয়েছে এজন্যে যে, মদীনা তৈয়্যেবায় যেসব ইহুদী নাসারা ছিল তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত বেশী হিংসা করতো। তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে বিশেষ ভাবে নসিহত করেছেন যে, তোমরা সর্ব শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হিংসা করোনা। লক্ষ্য কর কাবিল হাবিলকে হিংসা করে ধ্বংস হয়েছে। কাবিল উপকৃত হয়নি, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অতএব, তোমরাও যদি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে হিংসা কর তবে কাবিলের মত তোমরাও ধ্বংস হবে। তোমরা কোন নবীর বংশধর- একথা তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না।

১। তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন কৃত- আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩২১
তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা২০৩

এতদ্ব্যতীত, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উম্মী নবী। তিনি কোন বই-পুঁথি পাঠ করেননি। এতদসত্ত্বেও তোমাদের সম্মুখে তৌরাত ও ইঞ্জিলের সে সব কথা প্রকাশ করে দিচ্ছেন যা তোমরা গোপন করছো এবং অতীত কালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন, যা তোমাদের ধর্মযাজকরা অস্বীকার করতে পারছে না। অতএব, এ সত্য মেনে নাও যে, এসব কিছু সর্বশক্তিমান, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত আল্লাহ পাকই তাঁকে জানিয়েছেন। অতএব, তাঁর প্রতি ঈমান আন, তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ কর, তাঁর সাথে শত্রুতা এবং হিংসা বর্জন কর।

## হাবিল কাবিলের ঘটনা

হযরত আদম (আঃ)-এর ঔরষজাত সন্তান হাবিল কাবিলের ঘটনা বিশ্ব মানবের জন্যে বিশেষভাবে শিক্ষণীয়। তাই আল্লাহ পাক এ ঘটনাটিকে আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন। হযরত আদম (আ)-এর স্ত্রী হাওয়া (আঃ)-এর তরফ থেকে প্রত্যেকবার এক পুত্র ও এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করতো। এভাবে বিশবারে ৪০টি সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

তখন আল্লাহর বিধান এই ছিল যে, প্রথম বারের পুত্র এবং দ্বিতীয় বারের কন্যার মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হতো। অর্থাৎ একই সঙ্গে যে ভাই বোন জন্মগ্রহণ করতো, তাদের মধ্যে বিবাহ বৈধ ছিল না। উল্লেখ্য, হযরত আদম (আঃ)-এর জীবদ্দশায়ই তাঁর বংশধরদের সংখ্যা হয়েছিল ৪০ হাজার।[১]

হযরত আদম (আঃ)-এর সর্বপ্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করলো পুত্র কাবিল এবং কন্যা একলিমা এবং দ্বিতীয় বার জন্মগ্রহন করলো হাবিল এবং তার ভগ্নি আল বাওদা। সর্বশেষ জন্মগ্রহণ করেছে আবুল মুগীস ও উম্মুল মুগীস। কাবিলের ভগ্নি একলিমা ছিল অত্যন্ত সুন্দরী। বিধি মোতাবেক হযরত আদম (আঃ) ইচ্ছা করলেন কাবিলের সঙ্গে হাবিলের বোনের বিয়ে অনুষ্ঠিত হোক আর হাবিলের সঙ্গে হোক কাবিলের বোনের বিয়ে। কিন্তু এ প্রস্তাবে কাবিল রাজি হলোনা এবং বললো, আমি আমার বোন একলিমাকে বিয়ে করবো।

হযরত আদম (আঃ) বললেন, সে তোমার জন্যে হালাল নয় কিন্তু কাবিল এ সত্য উপলব্ধি করতে রাজি হলোনা। তখন আদম (আঃ) বললেন, এ বিষয়টির মীমাংসার জন্য একটি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। তোমরা উভয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে নজরানা পেশ কর। যার নজরানা আল্লাহ পাক কবুল করবেন তার সঙ্গেই বিয়ে হবে একলিমার। ভাই হাবিল কাবিল উভয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৯
তফসীরে মা'আরেফুল.কোরআন কৃত- আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খণ্ড পৃষ্ঠা ৩২২

নজরানা পেশ করলো। হাবিলের কাছে ছিল গৃহপালিত পশু যেমন বকরী, দুম্বা প্রভৃতি। তাই সে একটি অতি উত্তম মোটা তাজা দুম্বা কোরবানী করলো এবং তা নিয়াজ বা নজরানা স্বরূপ পাহাড়ের উপর রেখে দিল। আর কাবিল ছিল ক্ষেত-খামারের মালিক তাই সে সামান্য নিকৃষ্ট ফসল নিয়ে রেখে দিল।

সে যুগে কোন নজরানা আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হলো কি-না তা প্রমাণিত হতো একটি পন্থায় আর তা ছিল এই, আসমান থেকে অগ্নি আসতো এবং যার নজরানা কবুল হতো তাকে জ্বালিয়ে ফেলতো- এটিই ছিল সে যুগে আল্লাহ পাকের দরবারে কবুলিয়তের নিদর্শন। যাহোক, আসমান থেকে অগ্নি আসলো এবং হাবিলের নজরানাকে জ্বালিয়ে ফেললো, আর কাবিলের নজরানাকে স্পর্শও করলো না। অর্থাৎ হাবিলের নজরানা কবুল হলো কিন্তু কাবিলের নজরানা কবুল হলোনা। তখন কাবিল ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়। ঠিক ঐ মুহূর্তে কাবিলের অন্তরে হাবিলের প্রতি হিংসা সৃষ্টি হলো।

## পৃথিবীতে সর্বপ্রথম হত্যা

কাবিলের অন্ধ আক্রোশের শিকার হলো হাবিল, কাবিল হাবিলকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। নিরীহ হাবিল এর জবাবে বলল, আমার অপরাধ কি?

আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কারো কোন জবরদস্তি চলেনা, চলতে পারে না। দরবারে এলাহীতে তাকওয়া পরহেযগারীরই গুরুত্ব। এ পরহেযগারীর কারণেই আল্লাহ পাক আমার নজরানা কবুল করেছেন আর এ পরহেযগারীর অভাবেই তোমার নজরানা কবুল হয়নি। যদি তুমি তাকওয়া পরহেযগারীর নীতি অবলম্বন কর তবে তুমিও আল্লাহ পাকের মহব্বত এবং মকবুলিয়ত পেতে পার।

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

অর্থাৎ- আল্লাহ পাক শুধু পরহেযগারদের নজরানাই কবুল করেন।

## মোত্তাকী কারা?

প্রশ্ন হল পরহেযগার কারা? এ প্রশ্নের জবাবে এবনে আবি শায়বা, তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এখানে মোত্তাকী অর্থ সে সব লোক যারা শেরক থেকে আত্মরক্ষা করে। মূসা এবনে আইয়ুন (রঃ)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হলে তিনি বলেছেনঃ মোত্তাকীন অর্থ সে সব লোক, যারা কোন হারাম বস্তু গ্রহণের আশঙ্কায় হালাল থেকেও বেঁচে থাকেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হল আল্লাহ পাক সে ব্যক্তির নজরানাই কবুল করেন যে হক্ব পন্থী, বাতিল পন্থী নয়। এবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত আলী (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ তাকওয়া পরহেযগারীর সঙ্গে যে আমলই করা হোক আর সে আমল যত সামান্যই হোক না কেন, যদি তা কবুল হয়ে যায় তবে তা আর ক্ষুদ্র বা সামান্য থাকে না।

হযরত ওমর এবনে আবদুল আযীয (রঃ) এক ব্যক্তিকে লিখেছিলেনঃ আমি তোমাকে সেই তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের নসিহত করছি যা ব্যতীত কোন আমল কবুল হয় না, আর শুধু তাদের প্রতিই দয়া করা হয় যারা মোত্তাকী বা পরহেযগার! আর শুধু তাকওয়ার ভিত্তিতেই সওয়াব দান করা হবে, কেননা তাকওয়া ব্যতীত কোন আমলের সওয়াব পাওয়া যায় না। তাকওয়া পরহেযগারীর অবলম্বনের জন্যে আদেশদাতা অনেক আছে কিন্তু তার ওপর আমলকারীর সংখ্যা নগণ্য।

এবনে আবি হাতেম বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেছেন, যদি একথা প্রমাণ হয়ে যায় যে, আল্লাহ পাক আমার একটি নামাজ কবুল করেছেন, তবে তা আমার নিকট এ পৃথিবী ও পৃথীবীর যাবতীয় কিছু থেকে উত্তম হবে কেননা, আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ আল্লাহ পাক শুধু মোত্তাকীনদের আমলই কবুল করেন।

এবনে আসকের হেশাম এবনে ইয়াহয়ার কথা বর্ণনা করেছেনঃ এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর নিকট সাহায্যপ্রার্থী হল। তিনি তাঁর ছেলেকে বললেন, একটি দেরহাম দিয়ে দাও। ছেলেটি এক দেরহাম দিয়ে দিল। সাহায্যপ্রার্থী চলে গেল, তখন ছেলে বললঃ আব্বাজান! এ ব্যক্তি আপনার দেয়া একটি দেরহাম কবুল করেছে, তখন হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বললেন, যদি আমি জানতে পারি যে, আল্লাহ পাক একটি সেজদা বা একটি দেরহাম কবুল করেছেন, তবে মৃত্যুর চেয়ে আর কোন জিনিস প্রিয় থাকবে না। সারা পৃথিবী আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেও কোন দুঃখ নেই। আমি মৃত্যুর দিকে আকৃষ্ট হবো। তুমি জান আল্লাহ পাক কার আমল কবুল করেন? শুধু তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনকারীর আমলই তিনি কবুল করেন।

এবনে আসাকের বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাঊসদ (রাঃ) বলেছেনঃ যদি আমি জানতে পারি যে, আল্লাহ পাক আমার আমল কবুল করেছেন, তবে তা আমার নিকট এত প্রিয় হবে যে, সারা পৃথিবী যদি স্বর্ণ-দ্বারা পরিপূর্ণ করে আমার নিকট দেয়া হয়, তা-ও আমার নিকট তত প্রিয় হবে না।

হযরত আমের এবনে আবদুল্লাহ মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল, তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন। লোকেরা বলল- আপনি ক্রন্দন করছেন? আপনি তো অনেক বড় এবাদত গুজার লোক, তিনি বললেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ তিনি শুধু পরহেযগার লোকদের এবাদত কবুল করেন (আর জানি না তাঁর দৃষ্টিতে আমি পরহেযগার কি-না)।

যাহোক হাবিল বলল, আল্লাহ পাক শুধু পরহেযগার লোকদের নজরানাই কবুল করেন। তোমার নজরানা কবুল হয়নি এতে আমার কি দোষ? এরপর হাবিল আরো বললেনঃ পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

لَئِنْ بَسَطْتَّ اِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِىْ مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِىَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ

অর্থাৎ- যদি তুমি আমাকে হত্যা করার জন্যে হস্ত প্রসারিত কর তবে আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য আমার হস্ত প্রসারিত করব না। কেননা, (পবিত্র কোরআনের ভাষায়)

اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

(আমি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাককে ভয় করি)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহর শপথ করে বলছি, নিহত ব্যক্তি হাবিল ঘাতক কাবিলের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল। কিন্তু আল্লাহর ভয় প্রতিশোধ বা প্রতিরক্ষা থেকে তাঁকে বিরত রেখেছে। এর একটি কারণ হয়তো এই ছিল যে, তখন প্রতিরক্ষা বৈধ ছিল না।

মুজাহেদ (রঃ) বর্ণনা করেন, সে যুগে আদেশ ছিল এই যে, যদি কেউ কাউকে হত্যা করতে চায় তখন বিপক্ষ দল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করবে না, সবর অবলম্বন করবে, অথবা কারণ ছিল এই যে, হাবিল উত্তম পন্থা অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে কাবিলকে হত্যা করা বৈধ ছিল, কিন্তু হত্যাকারী হবার চেয়ে নিহত হওয়া উত্তম ছিল, তাই তিনি নিহত হওয়া পছন্দ করেছেন।

প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহর নিহত বন্দা হও, হত্যাকারী বন্দা হয়োনা। (তবকাত এবনে সাদ)

আমাদের শরীয়তে প্রতিরক্ষা গ্রহণ না করা বৈধ। যেমন তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) করেছেন। এবনে সা'দ লিখেছেন, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন হযরত ওসমান (রাঃ)-কে দুশমন অবরুদ্ধ করে রেখেছিল তখন আমি তাঁর খেদমতে হাযির হলাম এবং আরজ করলাম, আপনার সাহায্যের জন্য হাযির হয়েছি। তিনি বললেনঃ আবু হোরায়রা (রাঃ)! তুমি কি পছন্দ করবে যে, সব লোককে তুমি হত্যা করবে তন্মধ্যে আমিও অন্তর্ভুক্ত থাকবো। আমি আরজ করলাম, না। তখন হযরত ওসমান (রাঃ) বললেনঃ যদি একজন মানুষকেও হত্যা কর তবে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করলে। কেননা, আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে এরশাদ করেছেনঃ

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْفَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا

অর্থাৎ যে কেউ অন্য কারো জীবনের বিনিময়ে অথবা পৃথিবীতে ভীষণ গোলযোগের দরুণ ব্যতীত একজন মানুষকে হত্যা করে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করে।

আবদুর রাজ্জাক এবং এবনে জরীর হাসানের (রঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আদম (আঃ)-এর দু' পুত্রকে এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। এদের মধ্যে যে উত্তম তোমরা তারই অনুকরণ কর।

আবদ এবনে হোমায়েদের বর্ণনায় একটি পার্থক্য রয়েছে যে, তাদের উভয়ের মধ্যে যে উত্তম ছিল তোমরা তার মত হও, আর যে মন্দ ছিল তার মত হয়োনা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ হাবিল কাবিলের কথার জবাবে বলেছেন, যদি তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য হাত বাড়াও তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করার জন্যে হস্ত প্রসারিত করবো না। এ বাক্যটির উদ্দেশ্যে হলো- এমন মন্দ কাজের প্রতি তার পূর্ণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা শুধু তাই নয়, বরং হত্যাকারী হওয়ার সম্পর্ক থেকেও আত্মরক্ষা করা। এজন্যে তিনি একথা বলেননি যে, আমি তোমাকে হত্যা করবো না, বরং তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, তোমাকে হত্যা করার কোন ইচ্ছা আমার নেই, শুধু তাই নয় যে কর্মের মাধ্যমে তোমাকে হত্যা করার ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হতো, তাতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছি এবং তিনি বলে দিয়েছেন- আমি হত্যার করার ইচ্ছায় তোমার দিকে হাতই প্রসারিত করবো না।[১]

إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنْ تَبُوٓأَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ

অর্থাৎ আমি চাই যে, তুমি আমার গুনাহ এবং তোমার গুনাহর বোঝা নিয়ে আল্লাহ পাকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। যখন তুমি আমাকে হত্যা করবে তখন আমার গুনাহর বোঝাও তোমাকে বহন করতে হবে।

فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ

তখন তুমি দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, আর এটি জালেমের শাস্তি। কেয়ামতের দিন মজলুমকে জালেমের নেকী সমূহ বিনিময়ে দিয়ে দেয়া হবে। যদি জালেমের কোন নেকী না থাকে অথবা মজলুমের হক্ব আদায়ের জন্যে যথেষ্ট না হয় তবে জালেমের উপর মজলুমের গুনাহর বোঝা রেখে দেয়া হবে এবং তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৪২

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন আমার উম্মতের কাঙ্গাল সে হবে যে নামাজ, রোজা, যাকাত সব নিয়ে হাযির হবে (কিন্তু) সে কাউকে গালি দিয়েছে, কারো অর্থ-সম্পদ হজম করেছে, কাউকে খুন করেছে, কাউকে প্রহার করেছে এ অবস্থায় তার কিছু নেকী এদিকে যাবে, কিছু ওদিকে যাবে কিন্তু মানুষের হক্ব আদায় করা সম্ভব হবে না। এদিকে নেকীও বাকী থাকবে না, তখন হক্বদারের গুনাহর বোঝা তার উপর রেখে দেয়া হবে এবং তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম শরীফ)

فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ

এরপর তার কুপ্রবৃত্তি তাকে তার ভাইকে হত্যা করতে প্ররোচিত করলো। বর্ণিত আছে, কাবিল যখন হাবিলকে হত্যা করার ইচ্ছা করলো তখন সে জানতো না কিভাবে হত্যা করবে।

এবনে জোরায়েয বর্ণনা করেন, শয়তান তার সম্মুখে হাযির হলো, একটি পাখীকে ধরে তার মাথা একটি পাথরের উপর রাখলো এবং অন্য পাথর দিয়ে তাকে হত্যা করলো। কাবিল এ দৃশ্য দেখে হাবিলকে এভাবে হত্যা করলো।

فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

এরপর কাবিল হাবিলকে হত্যা করলো এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হলো। পৃথিবীতে তার জীবন হয়েছে দুর্বিষহ আর আখেরাতে দোযখের শাস্তি হলো অবধারিত।

বর্ণিত আছে যে, হাবিলের বয়স তখন ২০ বছর হয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ কাবিল হাবিলকে সওর পাহাড়ের উপর হত্যা করেছিল। আর কারো মতে, তাকে হেরা নামক পাহাড়ে হত্যা করেছে।

فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

অর্থাৎ-সে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হলো। এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, কাবিল দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুনিয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ব্যাপারটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট কেননা, সে তার পিতা-মাতা আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-কে অসন্তুষ্ট করেছিল। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম একজন মানুষকে যে হত্যা করেছে কেয়ামত পর্যন্ত সে অভিশপ্ত থাকবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন মানুষকে যদি নির্যাতন করে হত্যা করা হয় তবে তার খুন হওয়ার কিছু দায়িত্ব হযরত আদম (আঃ)-এর পুত্র কাবিলের উপর বর্তায়। কেননা, পৃথিবীতে সে-ই সর্বপ্রথম মানুষ হত্যা করেছে আর আখেরাতেও সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এজন্যে যে তার জন্যে রয়েছে কঠিন কঠোর শাস্তি।

বর্ণিত আছে যখন কাবিল হাবিলকে হত্যা করলো তখন কাবিলের দেহ কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করলো। অথচ ইতিপূর্বে সে ছিল শ্বেত বর্ণের। কাবিলকে হযরত আদম (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমার ভাই কোথায়? সে বললো, আমি তো তার নেগেহবান বা রক্ষাকারী ছিলাম না। তখন হযরত আদম (আঃ) বললেনঃ প্রকৃত অবস্থা এই, তুমি তাকে হত্যা করেছ এজন্যে তোমার দেহ কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করেছে। এ ঘটনার পর হযরত আদম (আঃ) ১০০ বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু হাবিল নিহত হওয়ার কারণে তিনি এত ব্যথিত হয়েছিলেন যে, তাঁর মুখে কেউ কোন দিন হাসি দেখেনি।

বর্ণিত আছে, কাবিল যখন তার ভাই হাবিলকে হত্যা করল তখন সে ইয়ামন থেকে এডেনের দিকে পলায়ন করলো। সেখানে তার নিকট আসলো ইবলিস, সে বললো, হাবিলতো অগ্নিপূজক ছিল। তুমি যদি অগ্নি পূজা কর তবে তোমার মকসুদ হাসিল হবে, তখন সে অগ্নি পূজা শুরু করলো। আর কাবিলই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে অগ্নি পূজা করেছে।[১]

فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِي الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِيْ
سَوْءَةَ اَخِيْهِ ؕ قَالَ يٰوَيْلَتٰٓى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا
الْغُرَابِ فَاُوَارِيَ سَوْءَةَ اَخِيْ ۚ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ۚ ﴿٣١﴾
مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ
نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ
وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ۫ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ
بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ﴿٣٢﴾

তরজমা

(৩১) অতঃপর আল্লাহ তায়ালা একটি কাক প্রেরণ করলেন, সে জমিন খুড়তে লাগল একথা শিক্ষা দেয়ার জন্যে যে, সে কিভাবে ভ্রাতার লাশ গোপন করবে। সে

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২০৮

আক্ষেপ করে বলল, হায়! আমার এমন ক্ষমতাও নেই যে একটি কাকের সমান হই এবং আমার ভাইয়ের লাশটি গোপন করতে পারি। অতঃপর সে লজ্জিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

(৩২) এজন্যেই আমি বনী ইসরাঈলদের লিখে দিয়েছি যে, কেউ অন্য কারো জীবনের বিনিময় অথবা পৃথিবীতে ভীষণ গোলযোগের দরুণ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলো সে যেন সমগ্র মানব মণ্ডলীকে হত্যা করলো। পক্ষান্তরে, যে কেউ একটি প্রাণ রক্ষা করবে সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে রক্ষা করলো এবং নিশ্চয় আমার বহু রসূল তাদের নিকট দলিল প্রমাণ নিয়ে এসেছে। কিন্তু এরপরও তাদের মধ্যে অনেকেই পৃথিবীতে বাড়াবাড়ি করেছে।

## তফসীরুল কোরআন

যেহেতু ইতিপূর্বে পৃথিবীতে কারো মৃত্যু হয়নি, তাই কাবিল তার ভাইকে হত্যা করার পর তার ভাইয়ের লাশ নিয়ে পড়েছিল মহা বিপাকে। সে বুঝতে পারছিল না কি করবে। বর্ণিত আছে যে, একটি বছর যাবত কাবিল তার ভাইয়ের লাশ কাঁধে নিয়ে ঘুরেছে। এমনকি, লাশটি বিকৃত হয়ে গেছে। এমন সময় আল্লাহ্ পাক তাকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে একটি কাক প্রেরণ করেছেন, তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا

অর্থাৎ- আল্লাহ্ পাক একটি কাক প্রেরণ করলেন।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ কাক প্রেরণের ব্যাপারেও কয়েকটি কথা আছে-

(১) আল্লাহ্ পাক দু'টি কাক প্রেরণ করেছেন। তন্মধ্যে একটি আরেকটিকে হত্যা করে। এরপর তার ঠোঁট এবং পা দিয়ে মাটিতে গর্ত করে এবং সে গতে নিহত কাকটিকে রেখে দেয়। এভাবে কাবিল একটি নগণ্য পাখি থেকে এ শিক্ষা গ্রহণ করলো যে, কিভাবে লাশ দাফন করতে হবে।

(২) হযরত আসআম (রাঃ) বলেছেনঃ যখন কাবিল হাবিলকে হত্যা করলো তখন তার লাশ নিয়ে মহা ফাঁপড়ে পড়ল। এমন সময় আল্লাহ্ পাক একটি কাক প্রেরণ করলেন। কাকটি হাবিলের লাশের উপরে মাটি ফেলতে লাগলো। ঘাতক কাবিল যখন দেখলো যে, কিভাবে নিহত হওয়ার পর আল্লাহর পাক হাবিলকে সম্মানিত করছেন তখন সে লজ্জিত হলো এবং বললো, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

يٰوَيْلَتٰى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-৬ খন্ড-৭ পৃষ্ঠা-৮১
তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২০৯

তখন কাবিল বললো, "হায় আক্ষেপ! একটি কাকের কাছে আমি বুদ্ধিতে হেরে গেলাম। এ সময় তার অন্তরে অন্তহীন অনুতাপ হয়"।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ কাবিল জানত না কিভাবে নিহত ব্যক্তিকে দাফন করতে হয়। তাই তাকে শিখতে হলো একটি নগণ্য পাখি কাক থেকে। এতে সে একথা উপলব্ধি করলো যে, কাকের জ্ঞান তার চেয়ে অনেক বেশী। এতদ্ব্যতীত, সে এ সত্যও উপলব্ধি করলো যে, নিতান্ত মূর্খতার কারণেই সে ভ্রাতৃ হত্যার মত মন্দ কাজ করেছে। তাই সে লজ্জিত হয়েছে এবং আক্ষেপ করেছে।

এর আরও একটি ব্যাখ্যা হলো কাবিল দাফনের পন্থা জানতো কিন্তু হাবিলকে অসম্মান করার লক্ষ্যে তার লাশটি ফেলে রেখেছিল। যখন সে দেখলো একটি কাক আরেকটিকে দাফন করছে তখন তার মন বিনম্র হলো। সে মনে মনে ভাবলো, একটি কাক অন্য একটি কাককে তো মাটির অভ্যন্তরে ফেলে তাকে গোপন করলো। আমার অন্তরে কাকের মায়ার সমানও মায়া নেই? যা আমি আমার ভ্রাতার লাশের প্রতি প্রদর্শন করতে পারি।

এ পর্যায়ে ব্যাখ্যাকারগণ একথাও বলেছেন, যখন কাকটি আসল এবং নিহত হাবিলের উপর মাটি ফেলতে লাগল তখন কাবিল উপলব্ধি করলো যে, আল্লাহ পাক হাবিলকে অনেক সম্মান দিয়েছেন। তার জীবদ্দশায় তার কোরবানী কবুল করে আল্লাহ পাক তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন, আর মৃত্যুর পর কাক প্রেরণ করে তাকে মাটি দ্বারা ঢেকে দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাকে সম্মানিত করেছেন। এতে কাবিল উপলব্ধি করলো যে, আল্লাহ পাকের দরবারে হাবিলের মর্তবা অনেক বেশী। তখন সে লজ্জিত হলো এবং তাকে দাফন করলো এবং বললো, "হায় আক্ষেপ! এ কাকটির সমান বুদ্ধিও আমার নেই"।[১]

فَأَصْبَحَ مِنَ النَّدِمِيْنَ

অর্থাৎ– কাবিল লজ্জিত হলো, কিন্তু এ লজ্জা বা অনুতাপ ভ্রাতৃ হত্যার জন্যে নয় যা তওবার অর্থ ব্যবহৃত হতে পারতো; বরং এ লজ্জা ছিল এজন্যে যে, লাশকে সে কি করবে তা জানতো না। বিশেষতঃ একটি কাক যা সাধারণত মৃত জন্তুর গোশ্ত খেতে অভ্যস্ত, এমন একটি নগণ্য পাখি থেকে দাফন প্রক্রিয়া শেখার পর তার লজ্জাবোধ এবং অনুতাপ জাগ্রত হলো। এ কারণেই বিখ্যাত তফসীরকার ইমাম কুরতবী (রঃ) লিখেছেনঃ

ولم يكن ذالك ندم توبة

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২০৯

অর্থাৎ– কাবিলের এ লজ্জাবোধ বা অনুতাপ তওবার উদ্দেশ্যে ছিল না। আর ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ

مكان ندمه لاجل هذه الاسباب لا يكونه معصية

আর এসব কারণেই হয়েছিল তার লজ্জা। কিন্তু সে যে পাপ কার্যে লিপ্ত হয়েছে তার জন্যে সে লজ্জিত হয়নি।[১]

হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানবী (রাঃ) এ সম্পর্কে লিখেছেন, কাবিলের এ লজ্জাবোধ এহেন নিন্দনীয় কাজের তথা ভ্রাতৃ হত্যার জন্যে নয়, বরং হত্যার পর যে সব অসুবিধা হয়েছে সেজন্যে। যেমন লাশ দাফনের ব্যাপারে জ্ঞানের অভাবের কারণে, কাকের শিক্ষার মুখাপেক্ষী হওয়ার কারণে এবং চেতনা শূণ্য হওয়ার কারণে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন যে, কাবিলের দেহ যেহেতু কালো হয়ে গিয়েছিল এবং যেহেতু আদম (আঃ) তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এজন্যে সে লজ্জিত হয়েছে।

হযরত থানবী (রাঃ) আরো লিখেছেন, যদি ভ্রাতৃ হত্যার কারণেও সে লজ্জিত হয় তবুও তাতে তওবা সম্পর্কে সন্দেহ করা যায় না। কেননা লজ্জাবোধ মাত্রই তওবা নয়, বরং যে লজ্জাবোধের পর আক্ষেপ, বিনয় এবং ক্ষতিপূরণের চিন্তা থাকে তাকেই তওবা বলা হয়।[২]

অতএব, কাবিলের এ লজ্জাবোধ বা অনুতাপ ও আক্ষেপ সম্পূর্ণ বৃথা অসময়ের ফরিয়াদ মাত্র। কোন পাপ কার্যের পর অন্তরে ত্রুটি স্বীকার করা, অনুতপ্ত হওয়া নিঃসন্দেহে উপকারী কাজ। কিন্তু তা সময় মত হতে হবে, আর তা তওবা করার উদ্দেশ্যে হতে হবে। বস্তুত কাবিলের এ অনুতাপ বা লজ্জাবোধ আল্লাহর ভয়ে নাফরমানী ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে নয়; বরং ভ্রাতৃ হত্যার পর তার যে দুর্গতি বা দুর্দশা হয়েছিল সে কারণেই হয়েছে তার অনুতাপ।[৩]

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৪৯
২। বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-২৩৩
৩। ফওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১৪৫

## পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে একটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে এমনি অন্যায়-অনাচার এবং অপরাধের কারণেই আল্লাহ পাক শরীয়তে শাস্তির বিধান প্রবর্তন করেছেন, যাতে করে অন্যায় অশান্তি-অকল্যাণের মূলোৎপাটন হয়। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ

অর্থাৎ– পূর্ববর্তী আয়াতে একজন নিঃষ্পাপ মানুষকে হত্যাকাণ্ডের যে ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে আমি বিশেষভাবে বনী ইসরাঈল এবং সমগ্র মানব জাতির ব্যাপারে সাধারণ ভাবে এ আদেশ জারী করেছি, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে অথবা পৃথিবীতে অশান্তি ভিন্ন একটি প্রাণও হত্যা করলো যে যেন সমগ্র মানব জাতিকেই হত্যা করলো।

এখানে উল্লেখ্য, না-হক্ব বা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে তার পরিণাম হয় অত্যন্ত শোচনীয়। দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানে ভয়াবহ পরিণাম অনিবার্য। ঘাতক নিজেই আক্ষেপ-অনুতাপের অনলে আজীবন জ্বলে পুড়ে মরে। যে ব্যক্তি এমন কাউকে হত্যা করে সে কোন লোককে হত্যা করেনি অথবা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করেনি, সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যা করেছে। যে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে সে যেন অন্যদের জন্যে এমন মহাপাপের দ্বার খুলে দেয়। এতে কাউকে হত্যা করার জন্য দুটি পথ বৈধ বলে ঘোষিত হয়েছে–

(১) যে অন্যায়ভাবে কোন লোককে হত্যা করে, খুনের বদলা খুন-এ রীতি মোতাবেক তাকে হত্যা করা বৈধ হবে।

## 'ফাসাদ' শব্দের তাৎপর্য

(২) যদি সে ফাসাদ করে। তফসীরকারগণ এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা, নেককার লোকদেরকে নির্যাতন করা, দ্বীন ইসলামের প্রচার প্রসারে বাঁধা সৃষ্টি করা, পয়গম্বরগণকে অপমান করা, মুরতাদ হওয়া তথা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করা। এসবই ফাসাদের অন্তর্ভুক্ত। এসব কারণ যার মধ্যে নেই, এমন লোককে যদি হত্যা করা হয়, তবে সে যেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে হত্যা করল।

## একজন মানুষকে হত্যা করা সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করার নামান্তর

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতের একাধিক অর্থ বর্ণিত হয়েছে। একরামার সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন নবী অথবা সে সময়ের খলীফাকে (মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানকে) হত্যা করে, সে যেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। হযরত সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বর্ণনা করেন, একজন মুসলমানকে হত্যা করা দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে হত্যা করার সমান। আর যে একজন মুসলমানের প্রাণ রক্ষা করে সে যেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষের প্রাণ রক্ষা করে।

মুজাহেদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, কোন মোমেনকে শরীয়তে বর্ণিত কারণ ব্যতীত যে হত্যা করে সে দোযখী, আল্লাহর দুশমন, অভিশপ্ত এবং শাস্তির যোগ্য। সে যদি সমস্ত মানুষকে হত্যা করত, তবে এর চেয়ে বেশী শাস্তি আর কি হত?

আলোচ্য আয়াতের এ অর্থ বর্ণিত হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো, যেমন নিমজ্জিত অবস্থায় তাকে পানির ভেতর থেকে বের করে আনল, অথবা জ্বলন্ত অবস্থা থেকে রক্ষা করল অথবা নিশ্চিত ধ্বংস থেকে বাঁচিয়ে দিলো সে যেন সমস্ত মানুষকে রক্ষা করলো।

এ পর্যায়ে মুজাহেদ (রহঃ) আরো বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে, সে এভাবে দোযখে যাবে যেভাবে দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে হত্যা করলে দোযখে যেত। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি একজনকে হত্যা করার ব্যাপারে নিজেকে রক্ষা করে সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করার ব্যাপারে নিজেকে রক্ষা করলো।[১] ইমাম কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ পাক এ আয়াতে একজন মানুষের হত্যার ভয়াবহ পরিণতি বর্ণনা করেছেন এবং হত্যা না করার মাহাত্ম ঘোষণা করেছেন।

হযরত বরা এবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, একজন মোমেনের না-হক্ব হত্যার মোকাবেলায় সারা পৃথিবীকে ধ্বংস করা আল্লাহ পাকের নিকট সামান্য জিনিস।

বায়হাকীর বর্ণনায় নিম্নোক্ত বাক্যটি সংযোজিত হয়েছে যে, আসমানের সমস্ত অধিবাসী এবং জমীনের অধিবাসী যদি একজন মুসলমানের হত্যাকাণ্ডে শরীক হয় তবে আল্লাহ পাক সকলকে দোযখে প্রেরণ করবেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, একজন মোমেনকে হত্যা করা আল্লাহ পাকের নিকট সারা বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চেয়েও বড় বিষয়।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৬ খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৮২-৮৩

এবনে মাজা শরীফে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, আমি দেখেছি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফে তওয়াফ করছিলেন এবং বলছিলেন, (হে কাবা) তুমি কত পবিত্র, তোমার সুগন্ধ কত উত্তম, তোমার মাহাত্ম কত বেশী, তোমার সম্মান কত অধিক, কিন্তু শপথ সেই আল্লাহ পাকের যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ! একজন মোমেনের ধন-সম্পদ ও রক্তের সম্মান তোমার সম্মানের চেয়ে অধিক।

সোলেমান এবনে আলী বলেন, আমি হাসান বসরী (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এ আয়াত কি শুধু বনী ইসরাঈলের জন্যে নাকি আমাদের জন্যেও? তিনি বললেন, অবশ্যই আমাদের জন্যেও। আল্লাহর শপথ! বনী ইসরাঈলের রক্তের সম্মান আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে আমাদের রক্তের চেয়ে অধিকতর নয়।[১]

وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ

অর্থাৎ-নিশ্চয় আমার রসূলগণ সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ এবং প্রকাশ্য নির্দশন সহ এসেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বনী ইসরাঈলের বহু লোক আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ এবং নাফরমান হয়। তারা বহু নবীগণকে এবং নিজেদের হত্যা করেছে। এমনকি, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে। মুসলমানদের উপর তারা অকথ্য নির্যাতন করেছে বছরের পর বছর। তারা সীমালঙ্ঘন করেছে। আল্লাহর পেয়ারা নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তারা অনেক চক্রান্ত করেছে। এর পরিণাম কত ভয়াবহ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। তারাই পৃথিবীতে উপদ্রব সৃষ্টিকারী এবং অশান্তি সৃষ্টিকারী হিসেবে কুখ্যাত হয়েছে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৪৭-৪৮

إِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ
يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ
يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ
خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۭ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى
الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ
تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

## তরজমা

(৩৩) যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করে তাদের শাস্তি এই হবে তাদেরকে হত্যা করা হবে, অথবা তাদের ফাঁসি দেয়া হবে, অথবা তাদের হাত পা বিপরীতভাবে কেটে দেয়া হবে। অথবা তারা সেখান থেকে বিতাড়িত হবে, এ হলো দুনিয়াতে তাদের অপমান এবং আখেরাতে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(৩৪) কিন্তু যারা এরূপ যে, তোমরা তাদেরকে পাকড়াও করার পূর্বেই তারা তওবা করে (তাদের ভয় নেই) একথা জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তা আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি এবং অন্যায়ভাবে হত্যা করার পরিণাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির আরেকটি পন্থা হলো ডাকাতি ও রাহজানি। এ অপরাধের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

যারা আল্লাহ পাক ও তার রসূলের সঙ্গে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি হলো তাদেরকে হত্যা করা বা ফাঁসি দেয়া প্রভৃতি।

ইমাম রাজী (রঃ) এ পর্যায়ে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, আল্লাহ পাকের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়। এমনকি, তা চিন্তাও করা যায় না।

অতএব, এখানে একটি বাক্য উহ্য রয়েছে মেনে নিতে হবে তা হলো–

المحاربة مع اولياء الله

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সঙ্গে যুদ্ধ করার তাৎপর্য হলো আল্লাহর ওলীদের সঙ্গে যুদ্ধ করা আর আল্লাহর রসূলের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। অতএব, যখন যুদ্ধের সম্পর্ক আল্লাহ পাকের সঙ্গে করা হয় তখন এর রূপক অর্থ হবে। আর এর তাৎপর্য হবে আল্লাহর ওলীদের সঙ্গে যুদ্ধ করা।

এর আরও একটি অর্থ হতে পারে, আল্লাহ পাকের সঙ্গে যুদ্ধ করার অর্থ আল্লাহর পাকের বিধি-নিষেধ অমান্য করা। তখন আয়াতের অর্থ হবে যারা আল্লাহ পাকের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং তাঁর রসূলের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে। এর তাৎপর্য হবে যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিধি-নিষেধ অমান্য করে এবং পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি করে। আর পূর্ববর্তী ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হলে এর তাৎপর্য হবে এই, যারা যুদ্ধ করে আল্লাহর ওলীদের সঙ্গে এবং আল্লাহর রসূলের বন্ধুদের সঙ্গে তাদের ভয়াবহ পরিণাম হলো এই (যা পরবর্তী বাক্যে বর্ণিত হয়েছে)।

## শানে নুযুল

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, কোরায়না গোত্রের কিছু লোক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয় এবং ইসলাম কবুল করে। কিন্তু মদীনা শরীফের আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের অনুকূলে ছিল না, তাই তাদের হাত পা শুকিয়ে গেল, চেহারার রঙ হলুদ হয়ে গেল এবং পেট বড় হয়ে গেল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সদকাহর উষ্ট্রের সঙ্গে জঙ্গলে থাকার আদেশ দিলেন যেন সেখানে তারা উষ্ট্রের প্রশ্রাব এবং দুধ পান করে। তারা যথারীতি সেখানে চলে গেল এবং দুধ পান করে শুধু স্বাস্থ্যই ফিরে পেল না, বরং বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট হলো। এরপর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রের রাখালকে হত্যা করে উষ্ট্রগুলো লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল এবং মুরতাদ হলো (ইসলাম ছেড়ে দিল)।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে জীব্রাঈল (আঃ) এসে এ ঘটনার বিবরণ দান করলেন এবং পরামর্শ দিলেন যে, কাউকে তাদের পাকড়াও করার জন্যে প্রেরণ করুন। প্রিয়নবী সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে তাদের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। জীব্রাঈল (আঃ) একথাও বললেন,

আপনি এ ভাষায় দোয়া করুন, "হে আল্লাহ! আসমান তোমার আসমান, জমিন তোমার জমিন, পূর্ব তোমার, পশ্চিম তোমার"।

হে আল্লাহ! জমিন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও এ লোকদের উপর জমিন সংকীর্ণ করে দাও এবং এই লোকদের আমার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাও। অবশেষে ঐ লুণ্ঠনকারী মুরতাদ লোকদের গ্রেফতার করে আনা হয়। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

হযরত জীব্রাঈল (আঃ) একথাও বলেছিলেন, যে হত্যা করেছ এবং সম্পদ লুণ্ঠন করেছে তাকে ফাঁসি দেয়া হোক, যে শুধু হত্যা করেছে তাকে শুধু হত্যা করা হোক, আর যে শুধু অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, হত্যা করেনি, তার হাত পা কেটে দেয়া হোক। কিন্তু একদিকের নয়, বরং একটি ডানের দ্বিতীয়টি বামের।[১]

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, আহলে কিতাবদের একটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শান্তি চুক্তি ছিল। কিন্তু তারা সে চুক্তি ভঙ্গ তরে, মানুষের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে অশান্তি সৃষ্টি করে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

কালবী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হেলাল এবনে উয়াইমেরের গোত্র সম্পর্কে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ গোত্রের আবু বারজাহ আসলামীর সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন যে, তাদের সম্প্রদায় হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কোন সাহায্য করবে না এবং তাঁর বিরুদ্ধে কোন দুশমনকেও সাহায্য করবে না। আর এ গোত্রের কেউ যদি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আসে তবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে তথা তার কোন ক্ষতি করা হবে না।

একবার কানানা গোত্রের কিছু লোক ইসলাম কবুল করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। পথে আসলাম গোত্রের কিছু লোকের সঙ্গে দেখা হয়। এ গোত্রটি ছিল হেলাল এবনে উমাইমেরের। হেলাল তখন উপস্থিত ছিল না।

বনী আসলাম বনী কানানার লোকদের উপর হামলা করে এবং তাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়। তাদেরকে হত্যা করে। এ খবর নিয়ে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[২]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, আলোচ্য আয়াতে 'মহারেবীন', 'মুফসেদীন' অর্থ ডাকাত, ছিনতাইকারী। তারা মুসলমান হোক বা অমুসলিম, আর এ বিষয়েও ওলামায়ে কেরাম

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৪৯
তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২১৪
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৫০-৫১
তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২১৪

একমত যে, কোন ব্যক্তি যদি শহরের বাইরে মানুষকে ভয় প্রর্শনের জন্যে হাতিয়ার বের করে যেখানে সরকারের বা পথিকদের কোন সাহায্য পৌঁছতে না পারে- এমন ব্যক্তিকে মোহারের বা ডাকাত বলা হবে এবং আলোচ্য আয়াতে ঘোষিত শাস্তি তাকে দেয়া হবে।

শহরের বাইরে অথবা দুটি জনবসতির মধ্যবর্তী স্থানে যদি কোন ব্যক্তি লুণ্ঠন করে তবে তার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের একাধিক মত রয়েছে। ইমাম মালেক (রঃ), ইমাম শাফেঈ (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর মতে সে ব্যক্তিকে মোহারেব বা ডাকাত বলা হবে। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন, তাকে ডাকাত বলা হয়, যখন শহরের বাইরে এতদূরে ডাকাতি করা হবে সেখানে সাহায্য পৌঁছানো সম্ভব নয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, শহরের ভেতর যারা লুণ্ঠন এবং রাহজানি করে তাদেরকেও এ আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এ মত পোষণ করতেন, ইমাম মালেক, লাইস এবনে সাআদ এবং ইমাম শাফেঈ (রহঃ)।

এবনে হুমাম লিখেছেন, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এ মতই পোষণ করতেন।

اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْتُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ

অর্থাৎ– পূর্ববর্তী আয়াতে যেসব অপরাধের কথা বর্ণিত হয়েছে সেসব অপরাধে যারা অপরাধী হবে, তাদেরকে হত্যা করা হোক, তাদের ফাঁসি দেয়া হোক, অথবা তাদের হাত কেটে দেয়া হোক।

অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এ আয়াতের যে ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন, তা হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যদি ডাকাতরা হত্যা করে, সম্পদ লুণ্ঠন করে তবে তাদেরকে হত্যা করা হোক, ফাঁসি দেয়া হোক, আর যদি তারা শুধু হত্যা করে ধন-সম্পদ লুণ্ঠন না করে তবে তাদেরকে হত্যা করা হোক। এমন অবস্থায় তাদেরকে ফাঁসি দেয়া হবে না। আর যদি শুধু ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে, হত্যা না করে, তাদেরকে হত্যা করা হবে না; বরং হাত পা কেটে দেয়া হবে। ডান দিকের হাত হলে বাঁ দিকের পা হবে। যদি পথিকদেরকে শুধু ভয় প্রদর্শন করে বা লুণ্ঠন বা হত্যা না করে তবে তাদেরকে দেশ থেকে বহিঃষ্কার করা হবে।[১]

আলোচ্য আয়াতে ফাসাদ বা অশান্তি সৃষ্টির যে কথা রয়েছে অনেক তফসীরকারের মতে, তার অর্থ হলো রাহজানি বা ডাকাতি, যা বর্তমান যুগে অহরহ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৫৫

হতে দেখা যায়। পবিত্র কোরআন এ আয়াতে এমন অপরাধের শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে। যেহেতু ডাকাতদের অবস্থা চার প্রকার হয় তাই শাস্তিও বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন রকম ঘোষণা করা হয়েছে (১) ডাকাতরা মানুষকে হত্যা করেছে কিন্তু ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করেনি (২) হত্যা করেছে ধন-সম্পদও লুণ্ঠন করেছে (৩) ধন-সম্পদ লুট করেছে, কিন্তু হত্যা করেনি (৪) ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করতে পারেনি এবং হত্যাও করতে পারেনি। উভয় অপরাধেরই অপচেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে এবং ধরা পড়ে গেছে।

এসব অপরাধের শাস্তি যথাক্রমে হত্যা, ফাঁসি, বিপরীতভাবে হস্তপদ কর্তন, অন্যত্র নির্বাসন ও কারাগারে বন্দী রাখা নির্ধারিত হয়েছে।

ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

অর্থা– পূর্ববতী আয়াতে যে শাস্তি ঘোষণা রয়েছে, তাতে অপরাধীর জন্যে দুনিয়াতে অপমান এবং আখেরাতে রয়েছে তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ

কিন্তু যারা তোমাদের হাতে ধরা পড়ার পূর্বে তওবা করে তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ যে, আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়।

যেহেতু আল্লাহর হক্বের কারণেই শাস্তির বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে, আর তওবা করার কারণে আল্লাহর হক্ব মাফ হয়ে যায়, তাই তারা মাফ পাবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই বন্দার হক্ব মাফ হবে না। তাই কারো ধন-সম্পদ আত্মসাত করা হলে তা ফেরত দিতে হবে। হত্যা করা হলে তার কেসাস নেয়া হবে তথা খুনের বদলা খুন দিতে হবে। অবশ্য সম্পদের মালিক এবং নিহত ব্যক্তির ওলির মাফ করার অধিকার সংরক্ষিত থাকবে এবং অন্যান্য অপরাধের শাস্তি যথারীতি তওবা করলেও জারী হবে।

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেন, তফসীরকারদের মধ্যে যাদের মতে এ আয়াত কাফেরদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে তাদের মতে আয়াতের অর্থ হবে, যে সব (অপরাধী ঘাতক, ডাকাত) কাফের মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ার পূর্বে শেরক থেকে তওবা করে আর মুসলমান হয়ে যায় তবে তাকে মাফ করা হবে।

## মানব কল্যাণ সাধনের পন্থা

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ইসলাম সমাজ ও জাতীয় জীবনে শান্তি শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে। মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করে, এক কথায় বিশ্ব মানবের কল্যাণের পরিপূর্ণ, নিখুঁত এবং বাস্তব পরিকল্পনা পেশ করে। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অপরাধীদের শাস্তির বিধান পেশ করা হয়েছে। বর্তমান

দুনিয়ায় যেভাবে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে তা ইতিপূর্বে কখনও পরিলক্ষিত হয়নি। অপরাধ প্রবণতা প্রতিরোধে সর্বাধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও অপরাধের হার উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। অপরাধ প্রতিরোধ যত আধুনিকই হোক না কেন তার চেয়েও আধুনিকতর পন্থায় অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে।

এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে, মানব সমাজকে অপরাধ মুক্ত করতে হলে, সমাজ জীবনের শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হলে মানব সৃষ্ট কার্যক্রম যথেষ্ট নয়, বরং স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ রব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে যে বিধান ঘোষণা করেছেন তার বাস্তবায়ন একান্ত জরুরী।

বর্তমান যুগের অপরাধ প্রবণতার ভয়াবহ অবস্থা একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, পবিত্র কোরআন ঘোষিত শাস্তি ব্যবস্থা প্রবর্তন না করলে মানব সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়। যদিও পবিত্র কোরআনে ঘোষিত বিধান আপাতঃ দৃষ্টিতে কঠিন মনে হয় কিন্তু মানব সৃষ্ট বিধানে অপরাধ প্রবণতা বন্ধ করা সম্ভব হয় না। অথচ পবিত্র কোরআনে ঘোষিত শাস্তি ব্যবস্থা অপরাধ প্রবণতাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। অতএব, শান্তি, কল্যাণ এবং সাফল্য লাভ করতে হলে বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ রব্বুল আলামীনের বিধি-নিষেধ অবশ্যই পালন করতে হবে।

আত্মসংশোধন এবং নসিহত গ্রহণের জন্যে অপরাধীকে শুধু শারীরিক শাস্তি দেয়া যথেষ্ট নয়, বরং অপরাধের ভয়াবহতার প্রেক্ষিতে প্রদত্ত শাস্তির প্রচারও জরুরী। এ কারণেই হত্যাকাণ্ডের অপরাধীকে শুধু হত্যা করা যথেষ্ট মনে করা হয়নি, বরং তাকে ফাঁসি দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এজন্যেই যে, ডাকাত লুণ্ঠন করে এবং হত্যা করে তাকে শুধু হত্যা করলে চলবে না-বরং ফাঁসি দিতে হবে যাতে করে শাস্তির প্রচার হয় এবং অন্যরা সতর্ক হয়। এ সম্পর্কে ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) বলেছেনঃ লুণ্ঠনকারী ঘাতককে হত্যা করা হবে এবং ফাঁসিতে ঝুলানো হবে যাতে করে এ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি অপরাধ প্রবণতার মূলোৎপাটনে সহায়ক হয় কেননা, পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে এ সম্পর্কে বিশেষ তাগিদ রয়েছে।

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য, ডাকাতি-রাহজানি, ছিনতাই, হত্যা, খুন, জখম- এসব জঘন্য অপরাধ যদি ব্যক্তিগতভাবে না করে দলগতভাবে করা হয় তবে ব্যক্তি হিসেবে কাউকে অপরাধী করা হবে না, বরং দলের সকল সদস্যকে অপরাধী হিসেবে শাস্তি ভোগ করতে হবে কেননা, যদিও জঘন্য অপরাধ কোন এক ব্যক্তি করে থাকে কিন্তু তা দলের বলেই করেছে। অতএব, সকলকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

অপরাধের যে শাস্তি তালিকা আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে তাকে যথেষ্ট মনে করা উচিত হবে না, বরং অপরাধীর শাস্তি এবং কঠোর শাস্তি হবে আখেরাতে। তাই এরশাদ হয়েছে–

وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

আর তাদের জন্যে রয়েছে আখেরাতে কঠিন শাস্তি। কেননা দুনিয়াতে অপরাধের যে শাস্তি বিধান করা হয়েছে তা আখেরাতের শাস্তির ব্যাপারে যথেষ্ট নয়। তাই এ সম্পর্কে রয়েছে সুস্পষ্ট ঘোষণা।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا

কিন্তু যারা ধরা পড়ার পূর্বে তওবা করে, কৃত অপরাধের জন্যে অনুতপ্ত হয়, আল্লাহ পাক তাদের তওবা কবুল করেন, কেননা তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) আলী আসাদী নামক এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছেন, সে অনেক দিন যাবত হত্যা-লুণ্ঠনের মত জঘন্য মন্দ কাজে লিপ্ত ছিল, তাকে গ্রেফতার করার অনেক চেষ্টা হয়েছে কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। একবার সে জঙ্গলে ছিল, এক ব্যক্তি পবিত্র কোরআনের এ আয়াতখানি পাঠ করছিল–

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ الايه

"(হে রসূল!) আপনি মানুষকে আমার এ ঘোষণা শুনিয়ে দিন, হে আমার গুনাহগার বন্দাগণ! তোমরা যারা অন্যায়ের কারণে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করবেন, নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান"।

এ আয়াত শ্রবণ করে আলী আসাদী নামক ঐ ডাকাত বললঃ এ আয়াতখানি আমাকে আবার শুনিয়ে দিন। তিনি আবার তেলাওয়াত করলেন। আলী আসাদী আয়াতের মর্মবাণী উপলব্ধি করা মাত্রই তার হাতের নগ্ন তরবারীটি খাপে ঢুকিয়ে দিল এবং খাঁটি তওবা করল। ঐ রাত্রেই মদীনা শরীফ রওয়ানা হল। ফজরের নামাজের পূর্বে মদীনা শরীফ পৌঁছে গেল। গোসল করল এবং ফজরের নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করল। নামাজ শেষে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর মজলিশে যারা উপবিষ্ট ছিলেন, তাদের মধ্যে আলী আসাদীও শামিল হল।

যখন ভোর হল তখন লোকেরা তাকে দেখে চিনে ফেলল যে, এখানে তো বিদ্রোহী, কুখ্যাত অপরাধী এবং ফেরারী আসামী আলী আসাদী বসে আছে, তাই

সবাই তাকে আটক করার উদ্যোগ নিল। সে বলল, ভাইয়েরা আমার কথা শ্রবণ কর, তোমরা আমাকে গ্রেফতার করতে পারবে না। কেননা, তোমাদের পাকড়াও করার পূর্বেই আমি তওবা করে ফেলেছি, বরং তওবার পর আমি তোমাদের নিকট এসে গেছি।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বললেনঃ সে ঠিক বলেছে এবং তার হাত ধরে মারওয়ান এবনে হাকামের নিকট নিয়ে গিলেন (তিনি তখন মদীনা শরীফের গর্ভণর ছিলেন)। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বললেন, এ হল আলী আসাদী, সে তওবা করে ফেলেছে। অতএব, তোমরা তার বিরুদ্ধে কোন কর্মসূচী গ্রহণ করতে পার না। তাই কেউই তার বিরুদ্ধে আর কিছু বলল না।

যখন মুজাহেদদের দল রুমী সৈন্যদের বিরুদ্ধে অভিযান করল তখন আলী আসাদীও মুজাহেদীনদের সঙ্গে শরীক হল। রুমী নৌবহরের সঙ্গে মুজাহেদীনদের লড়াই হল। আলী আসাদী রুমীদের নৌযানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ যুদ্ধে অনেক কাফের তার হাতে নিহত হয়। নৌযানটি নিমজ্জিত হয়। আলী আসাদীও নিমজ্জিত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এবং আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) এ পর্যায়ে হযরত আলী (রাঃ)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হারেসা এবনে বদর তাইমী বছরী একবার চরম অশান্তি সৃষ্টি করল, মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করল, ডাকাতি, খুন যখম, লুণ্ঠন সবই করল, কিছুদিন পর নিজেই তওবা করল এবং সাঈদ এবনে কায়েস হামদানীর নিকট হাযির হল। তিনি তাকে তার বাড়ীতে অবস্থান করতে দিলেন, এরপর হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে, দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করে, এরপর তওবা করে তার সম্পর্কে কি আদেশ?

তখন হযরত আলী (রাঃ) বললেনঃ আমি তাকে নিরাপত্তা দান করব। এরপর সাঈদ এবনে কায়েস হারেসা এবনে বদরকে সম্মুখে এনে বললেন, এ হল হারেসা এবনে বদর, হযরত আলী (রাঃ) তাকে কিছু বললেন না (এবনে আবি শায়বা, এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম)।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟
إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُوا۟ فِى سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾
إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ
جَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لِيَفْتَدُوا۟ بِهِۦ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ
ٱلْقِيَٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾
يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ
مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾

তরজমা

(৩৫) হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের জন্যে কোন প্রকার উসিলা খোঁজ কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।

(৩৬) নিশ্চয় যারা কাফের হয়েছে, দুনিয়াতে যা কিছু আছে সবই যদি তাদের হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আরো দ্রব্য-সম্ভার তাদের হয়, যদি তারা তা কেয়ামতের দিনের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের জন্যে দিতে চায় তবে তাদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের জন্যে অত্যন্ত বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

(৩৭) তারা এ আকাঙ্ক্ষা করবে যেন দোযখ থেকে বের হয়ে আসে কিন্তু কোন দিন তারা দোযখ থেকে বের হতে পারবে না এবং তাদের জন্যেও চিরস্থায়ী শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী একখানি আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, ইহুদী ও নাসারারা একথা বলে গৌরব করত যে, আমরা আল্লাহর পুত্র এবং আল্লাহর বন্ধু (নাউজুবিল্লাহ)।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন, হে মোমেনগণ! তোমাদের গৌরব হবে তোমাদের আমলের মধ্যে। তোমাদের পূর্ব পুরুষের বুজর্গীর মাধ্যমে নয়। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, আর আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হও।

ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, মানুষের যাবতীয় কর্মকে দু' ভাগে বিভক্ত করা যায় (১) মন্দ কাজ পরিহার করা, (২) ভালো কাজ করা। আল্লাহ পাক এ আয়াতে দু'টি কথার নির্দেশ দিয়েছেন (১) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তথা যাবতীয় নিন্দনীয় কাজ বর্জন কর। আল্লাহ পাকের আদেশ পালন কর এবং তাঁর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা কর। অতএব, যা বর্জনীয় তা পরিহার করা এবং যা করণীয় তা করা হলো অবশ্য কর্তব্য।[১]

বস্তুতঃ এ আয়াতে আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ হে মোমেনগণ! তোমরা বনী ইসরাঈলের মত আল্লাহ পাকের নাফরমান হয়োনা। তোমাদের একান্ত কর্তব্য হলো আল্লাহকে ভয় করা, তাকওয়া পরহেযগারীর পথ অবলম্বন করা এবং নেক আমলের মাধ্যেমে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হওয়া। তোমরা আল্লাহর রাহে জেহাদ কর, বনী ইসরাইলের মত কাপুরুষতার পরিচয় দিয়ো না।

আলোচ্য আয়াতে সর্বপ্রথম আল্লাহ পাককে ভয় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরপর আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে সচেষ্ট হওয়ার নির্দেশ রয়েছে।

## "ওয়াসিলাহ" শব্দটির ব্যাখ্যা

আলোচ্য আয়াতের "আল-ওয়াসিলাহ" শব্দটির ব্যাখ্যা সম্পর্কে তফসীরকারগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হাসান বসরী (রহঃ), মুজাহেদ (রহঃ), কাতাদা (রহঃ), আতা (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), এবনে যায়েদ (রহঃ) এবং এবনে কাসীর (রহঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে "ওয়াসিলাহ" শব্দটির অর্থ হলো, আল্লাহর নৈকট্য। এমন অবস্থায় আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে, "হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভে ধন্য হতে সচেষ্ট হও"।

আর হাদীস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে যে, "ওয়াসিলাহ" হলো জান্নাতের একটি উচ্চতর মঞ্জিল, এ স্থানকে ওয়াসিলাহ এজন্যে বলা হয়েছে যে, তা জান্নাতে আল্লাহর আরশের নিকটবর্তী স্থান, আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও একথা বর্ণিত আছে যে, "ওয়াসিলাহ" অর্থ হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। অতএব, আয়াতের তাৎপর্য হলো, তাকওয়া পরহেযগারী এবং নেক আমলকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের পন্থা ও মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ কর এবং তা অর্জনে সচেষ্ট হও।[২]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২১৮-১৯
২। তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১১১
তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রাস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩২৯

"ওয়াসিলাহ" শব্দের অর্থ হল নৈকট্য। আর নৈকট্য লাভের উত্তম পন্থা হল আল্লাহর বিধি-নিষেধ পালন করা। এজন্যে ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, এবাদত এবং আল্লাহর বিধি-নিষেধ পালনের মাধ্যমেই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। তাঁর নৈকট্য-ধন্য হওয়া যায়। আলোচ্য আয়াতে "ওয়াসিলাহ" গ্রহণের অর্থ হলো, এ নৈকট্য অর্জন করা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, হাদীস শরীফে এসেছেঃ "ওয়াসিলাহ" আল্লাহ পাকের দরবারে একটি উচ্চ মর্তবা। এর চেয়ে আর কোন উচ্চ মর্তবা নেই। "তোমরা আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া কর যেন আল্লাহ পাক আমাকে এ মর্তবা দান করেন"। এই হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)। ইমাম আহমদ (রহঃ) সহীহ সনদ সহ এই হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। এই হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন তোমরা মুয়াজ্জিনের আজান শ্রবণ কর তখন সে শব্দগুলো বলো যা মুয়াজ্জিন বলে। এরপর আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ কর, যে আমার প্রতি একবার রহমতের দোয়া করবে, আল্লাহ পাক তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করবেন। এরপর আমার "ওয়াসিলাহ" লাভের দোয়া কর। যে ব্যক্তি আমার জন্যে ওয়াসিলাহ লাভের দোয়া করবে তার জন্যে আমার শাফাআত হালাল হবে। এই হাদীস দু'খানি উল্লেখ করার পর আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) আরো লিখেছেনঃ

### একটি প্রশ্ন

বিভিন্ন হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, ওয়াসিলাহ হলো একটি উচ্চ মর্তবা যার পরে আর কোন মর্তবা নেই। আর এ মর্তবা প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে সুনির্ধারিত হয়ে আছে। এমন অবস্থায় আলোচ্য আয়াতে প্রত্যেককে ওয়াসিলাহ অন্বেষণের আদেশ কিভাবে দেয়া হয়েছে? এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, ওয়াসিলাহ তথা বিশেষ মর্তবায় পৌছা অন্যদের পক্ষেও সম্ভব।

### জবাব

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে "ওয়াসিলাহ"বা সর্বোচ্চ মর্তবা সুনির্ধারিত এবং তা সরাসরি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে, অন্য কোন মাধ্যমে নয়। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উসিলায় তথা তাঁর মাধ্যমে অন্যান্য

আউলিয়ায়ে কেরামেরও উচ্চ মর্তবায় পৌঁছা সম্ভব। উল্লেখ্য, যেসব হাদীসে ওয়াসিলাহ'র কথা বলা হয়েছে সেখানে ওয়াসিলাহকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে। কিন্তু অন্যরা এ ওয়াসিলাহ বা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারবে না, একথা ঘোষণা করা হয়নি।

এ বিষয়ের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রহঃ) "মকতুবাতে" যার সারমর্ম হচ্ছে–"ওয়াসিলাহ" শব্দটি সাধারণভাবে নৈকট্যর সকল মর্তবাকে বোঝায়। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নৈকট্যের সকল মর্তবার জন্যেই "ওয়াসিলাহ" শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে ওয়াসিলাহর কথা বলেছেন, তা আল্লাহর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মর্তবা।

এখানে উল্লেখ্য, আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের পথে যে সমস্ত স্তর বা মর্তবা রয়েছে আল্লাহর মহব্বত ব্যতীত সে সব মর্তবা অর্জন করা সম্ভব নয়। এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একথা বিশেষ তাৎপর্যবহ যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহর নৈকট্য-ধন্য হওয়ার ক্ষেত্রে এমনও সময় আসে যখন দরবারে এলাহীতে কোন ফেরেশতা বা কোন নবীও থাকতে পারেন না। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নৈকট্যের ক্ষেত্রে আমি এত উচ্চ মর্তবায় উপনীত হই, তথা তাঁর নৈকট্য লাভ করি, যেখানে কোন ফেরেশতা বা কোন নবীর পক্ষে পৌঁছা সম্ভব নয়।

বস্তুতঃ উচ্চ মর্তবা সমূহের এ ভ্রমণ শুধু মহব্বতের মাধ্যমেই সম্ভব। আর এ পর্যায়ে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করাও শুধু মহব্বতের মাধ্যমেই সম্ভব। আল্লাহ পাকের জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্তরে সর্বাধিক মহব্বত ছিল। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যেও আল্লাহ পাকের মহব্বত সর্বাধিক। তাঁকে মহব্বতের ক্ষেত্রে, নৈকট্য ও সান্নিধ্যে লাভের ক্ষেত্রে যে মকাম, যে শান এবং মর্তবা প্রদান করা হয়েছে তা অন্য সৃষ্টিকে প্রদান করা হয়নি। আর এ মহব্বত লাভের পন্থা হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসরণ তথা তাঁর মহান অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসরণ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন এ পথের সন্ধান দিয়েছেন একখানি আয়াতে। এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমার অনুসরণ করো। আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ভালবাসবেন, তথা তোমরা মহব্বত লাভে ধন্য হবে। আল্লাহ নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করবে এবং আল্লাহ পাক তোমাদের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেবেন। আর আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

অতএব, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ তথা জাহেরী ও বাতেনী অনুকরণের মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সৌজন্যে আল্লাহ পাকের মর্জি মোতাবেক তাঁর বন্দাগণ তাঁর মহব্বত লাভে ধন্য হতে পারে।[১]

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۤءُ

আর এটি হলো আল্লাহ পাকের বিশেষ দান যা তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে প্রদান করেন।

وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

আর আল্লাহ পাক মহান দানের অধিকারী।

## তাকওয়া অবলম্বনের আদেশ

আলোচ্য আয়াতে তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ পাকের নিষিদ্ধ কাজ সমূহ থেকে আত্মরক্ষা করার নামই হলো তাকওয়া। এ গুণ অর্জনের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ প্রিয় হয়। পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ আল্লাহর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হও। কেননা, যারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের সাধনা করে, যারা আল্লাহর এবাদত-বন্দেগীতে, তাঁর বিধি-নিষেধ পালনে সাধনা করে, তারাই জীবন-সাধনায় সাফল্যমণ্ডিত হয়।

এরপর এরশাদ হয়েছে–

وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর রাহে জেহাদ কর। তথা আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অর্থাৎ শয়তানের বিরুদ্ধে বা কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জেহাদ কর।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৫৯-৬০

আল্লাহর মিলন-পিয়াসী বন্দাকে তাঁর সান্নিধ্য লাভের আশায় সাধনা রত থাকতে হবে। নাফরমানীর কাজ তথা পাপাচারকে সর্বদা পরিহার করে চলতে হবে।

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

উপরোক্ত কর্মসূচীর সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমেই তোমরা সফলকাম হবে। সাফল্য তোমাদের পদ চুম্বন করবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْاَنَّ لَهُمْ مَّافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বন্দাদের অবস্থা এবং তাঁদের শুভ পরিণতির কথা ঘোষণা করেছেন। আর এ আয়াতে অবাধ্য নাফরমানদের কঠিন শাস্তির কথা ঘোষিত হয়েছে।

যারা মূর্খতার ঘন অন্ধকারে হাবুডুবু খায়, যারা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যারা অবাধ্য অকৃতজ্ঞ, কাফের তারা অনেক ভুল ধারণা পোষণ করে। তন্মধ্যে একটি হলো যেভাবে দুনিয়াতে ঘুষ প্রদান, হাদিয়া তোহ্ফা প্রেরণের মাধ্যমে অনেকেই তাদের কাজ উদ্ধার করে, আখেরাতেও হয়তো অন্যায় আচরণের মাধ্যমে নাজাত লাভ করা সম্ভব হবে।

তাই আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, যারা কাফের তারা যদি সারা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের মালিক হয় এবং এমনি আরও সম্পদ তাদেরকে প্রদান করা হয়, আর সমস্ত সম্পদ যদি আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুক্তিপণ হিসেবে দেয় তবুও তারা রেহাই পাবে না। তাদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا

অর্থাৎ-কাফেররা দোযখের আযাব থেকে নাজাত পাওয়ার লক্ষ্যে দোযখ থেকে বের হওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। কিন্তু কোনদিন দোযখ থেকে বের হতে পারবেনা, কেননা তাদের আযাব হবে চিরস্থায়ী। (তফসীরে কুরতবী)

অথবা আয়াতের অর্থ হলো কাফেররা দোযখের আযাব থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে বিনীত আরজী পেশ করবে। যেমন পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে কাফেরদের দোয়ার উল্লেখ রয়েছে–

(অর্থাৎ) "হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে নাজাত দাও", কিন্তু তাদের এ দোয়া কবুল হবে না। তাদেরকে দোযখ থেকে বের হার সুযোগ দেয়া হবে না, কেননা পরবর্তী বাক্যে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

অর্থাৎ– তাদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব। যেভাবে তাদের প্রতি আযাব কম করা হবে না ঠিক তেমনি তাদের আযাব কখনো বন্ধও হবে না।

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য, কোন কোন হাদীসে আছে গুনাহগার মোমেনদেরকে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত দোযখের শাস্তি দেয়ার পর আল্লাহর পাক দয়া করে দোযখ থেকে বের করে দেবেন, আবে হায়াতের নির্ঝরণীতে পরিচ্ছন্ন করে বেহেশতে প্রবেশের সুযোগ দান করবেন। অথচ আলোচ্য আয়াতে রয়েছে দোযখীদেরকে দোযখ থেকে বের হতে দেয়া হবে না।

এ প্রশ্নের জবাব হলো, আলোচ্য আয়াতখানি কাফেরদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। মোমেনদের সম্পর্কে এতে কোন কথা নেই, আর হাদীস সমূহে যে সুসংবাদ রয়েছে তা হলো গুনাহগার মোমেনদের জন্যে।[১]

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا
أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَنْ تَابَ مِنۢ بَعْدِ ظُلْمِهِۦ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ
يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُۥ
مُلْكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن
يَشَآءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

তরজমা

(৩৮) এবং চোর পুরুষ ও নারী উভয়েরই হাত কেটে ফেল, তা আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি স্বরূপ এবং আল্লাহ তায়ালা প্রবল পরাক্রমশালী, মহান বিজ্ঞানময়।

(৩৯) অনন্তর যে ব্যক্তি অন্যায় করার পর তওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১৪৬

করে তবে নিশ্চয় আল্লাহ পাক তার তওবা কবুল করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু।

(৪০) (হে রসূল!) আপনি কি জানেন না যে, আসমান ও জমিনের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকের। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি প্রদান করেন, যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করেন, আর আল্লাহ পাক সমস্ত কিছুর উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান।

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে ডাকাত ও লুণ্ঠনকারীদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, আর এ আয়াতে চুরির শাস্তির ঘোষণা রয়েছে। ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, পূর্ববর্তী একখানি আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে–

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

একজন মানুষকে হত্যা করা সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করার মত অপরাধ। এরপর যে সব অপরাধ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে, সমাজ জীবনের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে সেগুলোর উল্লেখ রয়েছে। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম পূর্ববতী ডাকাত ও ছিনতাইকারীদের শাস্তির কথা রয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে চুরির শাস্তির ঘোষণা রয়েছে।[১]

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, চোর পুরুষ হোক কি নারী, তার হাত কেটে ফেল। এ শাস্তি চুরি করা সম্পদের বিনিময়ে নয়, বরং চৌর্যবৃত্তির জন্যেই এ শাস্তি যেন চোর এমনি জঘন্য অপরাধ থেকে বিরত থাকে এবং তার দেখাদেখি অন্যরাও এমন নিন্দনীয় কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকে।

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে চুরি অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। ইসলাম ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলার এবং মানুষের জান মালের নিরাপত্তা বিধান করে কিন্তু চোর তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তাই আল্লাহ পাক এমন আদর্শ শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন যা শুধু চোরকেই চুরি থেকে নিবৃত্ত করবে না, বরং অন্যদের জন্যেও শিক্ষনীয় হবে।

বর্তমান যুগে কেউ কেউ এ শাস্তিকে কঠিন ও নিষ্ঠুরতা বলে মনে করে। কিন্তু দু' চারটি ক্ষেত্রে এ শাস্তির ব্যবস্থা প্রয়োগের মাধ্যমে যদি সমগ্র সমাজ ও

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২২২
তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রীস কান্দলভী (রঃ) খন্ড ২ পৃষ্ঠা-৩৩০

জাতিকে চুরির অভিশাপ থেকে রক্ষা করা যায়, তবে তা হয় অনেক বড় সাফল্য। যারা এ শাস্তিকে নিষ্ঠুরতা বলে সমালোচনা করে, তারা যে চুরিকেই প্রকারান্তরে উৎসাহিত করে তাই নয়, বরং সমাজ ও জাতির প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে, কেননা যদি পবিত্র কোরআন ঘোষিত শাস্তি প্রয়োগ না করা হয়, চোরকে শুধু কারা বন্দী রাখার বর্তমান ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয়, তবে চুরি কখনো বন্ধ হবেনা; বন্ধ করা যাবে না।

যেমন বর্তমানে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের অবস্থা আমাদের চোখের সম্মুখেই রয়েছে, মানবতার নামে লঘু শাস্তির কথা বলে চৌর্য্যবৃত্তি অব্যাহত রেখে মানবতার অবমাননা করা হচ্ছে। যদি হাত কেটে ফেলা সভ্যতা ও মানবতা বিরোধী কাজ হয় তবে চুরি কি সভ্যতা ও মানবতা বিরোধী কাজ নয়?

বস্তুতঃ চৌর্য্যবৃত্তি সভ্যতা ও মানবতা বিরোধী কাজ বলেই আল্লাহ পাক এ শাস্তির বিধান দিয়েছেন।

## কবি আবুল আলার ঘটনা

কবি আবুল আলা এ সম্পর্কে এ প্রশ্ন করেছিল যে, একটি হাতের ক্ষতিপূরণ ইসলামী আদালতে নির্ধারিত রয়েছে ৫০০ স্বর্ণমুদ্রা, যদি কেউ কারো হাত কেটে ফেলে তবে তাকে ৫০০ স্বর্ণমুদ্রা জরিমানা দিতে হয়। দু' চার টাকার কোন বস্তু চুরি করলে এমন মূল্যবান হাত কিভাবে কাটা যায়? একথার জবাবে কাজী আবদুল ওহাব মালেকী লিখেছেনঃ

مَا كَانَتْ اَمِيْنَةً كَانَتْ ثَمِيْنَةً وَلَمَّا خَانَتْ هَانَتْ

যতক্ষণ এ হাতটি আমানতদার ছিল ততক্ষণ এ হাতটি ছিল মূল্যবান, কিন্তু যখন সে খেয়ানত করেছে তখন তা অপমানিত হয়েছে।[১]

বস্তুতঃ যে হাত মানুষের সম্পদ অপহরণ করে সে হাত কেটে ফেলারই যোগ্য, আজকের দুনিয়ায় যেসব দেশ পবিত্র কোরআন ঘোষিত এ শাস্তির ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে প্রস্তুত নয়, তারা চুরির অভিশাপ থেকে মুক্তও নয়। পক্ষান্তরে, সৌদী আরবসহ যেসব দেশে পবিত্র কোরআনের এ বিধানের বাস্তবায়ন হয়, সেখানে চুরির কোন আশঙ্কা নেই। চুরির অভিশাপ মুক্ত এসব দেশের অবস্থা দেখেও অন্যান্য দেশ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং পবিত্র কোরআনের এ বিধান মেনে চলে সমাজ ও জাতীয় জীবনকে চুরির অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে পারে।

১। তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রীস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩১
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-৬ খন্ড-৭ পৃষ্ঠা-৯০

## প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদর্শ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত নাযিল হবার পর যখনই এমন ঘটনা ঘটেছে তখন চোরের হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও তাই হয়েছে এবং এর পরবর্তীতেও অনেক দিন পর্যন্ত (উমাইয়া যুগের ১০০ বছর এবং আব্বাসীয় যুগের প্রায় ৬০০ বছর) এ বিধান কার্যকর হয়েছে।

## কয়েকটি দৃষ্টান্ত

হযরত সাফওয়ান (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি মসজিদে ঘুমিয়েছিলাম। এক চোর এসে আমার মাথার নীচ থেকে আমার চাদরটি নিয়ে যায়। আমি তাকে ধরে ফেলি এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে তাকে পেশ করে আরজী করি, সে আমার চাদর চুরি করেছে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোরের হাত কেটে ফেলার আদেশ দেন। তখন আমি আরজ করি, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার এ উদ্দেশ্য ছিল না। আমি এ চাদরটি তাকে খয়রাত করে দিলাম, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আমার নিকট তাকে নিয়ে আসার পূর্বে এ কাজটি কেন করলে না? (মালেক, আহমদ, আবু দাউদ, এবনে মাজাহ এবং নেসায়ী শরীফের বর্ণনায় এ বাক্যটিও সংযোজিত হয়েছে। অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশক্রমে ঐ ব্যক্তির হাত কেটে ফেলা হয়।)

আবু দাউদ শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ (আমার নিকট হাযির করার পূর্বে) তোমরা পরস্পরের শাস্তি মাফ করে দিও। যখন আমার নিকট শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধের বিষয় পেশ করা হবে তখন শাস্তি প্রদান ওয়াজিব হবে।[১]

বনী মখজুম গোত্রের এক মহিলা চুরির অপরাধে ধৃত হল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ করা হলে এ সময় ঐ মহিলার আত্মীয়-স্বজন হযরত উসামা এবনে যায়েদের (রাঃ) নিকট এ মর্মে হাযির হল যেন তিনি চুরির অপরাধে ধৃত ঐ মহিলার পক্ষে সুপারিশ করেন। কেননা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত উসামা (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এ সম্পর্কে আরজী পেশ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৭১

করলেন। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ উসামা, আমার ধারণা ছিল তুমি আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি সম্পর্কে কোন কথা বলবে না।

অতঃপর তিনি ঘর থেকে বের হয়ে এসে ভাষণ দান করলেনঃ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এজন্যে ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোন বড় লোক যদি চুরি করত তবে তাকে ছেড়ে দেয়া হত আর যদি কোন দুর্বল লোক চুরি করত, তখন তার হাত কেটে ফেলা হত। শপথ সেই আল্লাহর পাকের! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, যদি মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কন্যা ফাতেমাও চুরি করত, তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশে উক্ত মখজুমী মহিলার হাত কেটে দেয়া হয়।[১] (মুসলিম শরীফ)

## ব্যতিক্রম

চুরির ক্ষেত্রে সর্বত্রই যে হাত কাটার নির্দেশ তা নয়, বরং এ পর্যায়ে কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে। যেমন খাদ্য-দ্রব্য চুরি করলে অথবা অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য-দ্রব্য চুরি করলে অথবা ফল-ফলারি চুরি করলে, পাখী চুরি করলে হাত কাটা হয় না। এমনিভাবে আমানতে খেয়ানতকারীর হাত কাটা হয় না।

হযরত রা'ফে এবনে খোদায়েজ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ফল চুরির ব্যাপারে হাত কাটার শাস্তি হবে না। (তিরমিজী শরীফ)

এ পর্যায়ে একথা উল্লেখ্য, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এমন ফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যা গাছে ছিল, কিন্তু যদি ফল কারো বাড়ীতে সংরক্ষিত অবস্থায় রাখা হয় আর সেখান থেকে চুরি হয়, তবে তার শাস্তি হবে হাত কেটে ফেলা।

ইমাম আবু দাউদ জরীর এবনে হাজেমের সূত্রে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি খাদ্য-দ্রব্য চুরির ব্যাপারে হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দেব না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ক্ষুধার্ত অবস্থায় যদি কেউ চুরি করে, তবে তার হাত কাটা হবে না। হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেনঃ দুর্ভিক্ষের বছর হাত কাটা হবেনা।

আবদুল্লাহ এবনে ইয়াসার হযরত ওমর এবনে আবদুল আজিজ (রঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তিকে পেশ করেছিলেন, সে মুরগী চুরি করেছিলো। হযরত ওমর এবনে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৬৬

আবদুল আজিজ (রঃ) তার হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দেয়ার কথা চিন্তা করছিলেন, তখন সালমান এবনে আবদুর রহমান বললেন, তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) বলেছেন, পাখী চুরি করলে হাত কাটার শাস্তি দেয়া হবে না। অন্য একটি ঘটনায় এক ব্যক্তিকে হযরত ওমর এবনে আবদুল আজিজ (রঃ)-এর নিকট পেশ করা হল। সে একটি পাখী চুরি করেছিলো, তিনি এ সম্পর্কে সায়েদ এবনে এজিদের নিকট ফতোয়া চাইলেন, তখন সায়েদ বললেনঃ আমি কাউকে দেখিনি যে, পাখী চুরি করার ব্যাপারে হাত কাটা হয়েছে অতএব, পাখী চুরির ব্যাপারে হাত কাটার শাস্তি হবে না।[১]

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক আদেশ দিয়েছেন, যেন চোরের হাত কেটে ফেলা হয়। কিন্তু কতখানি হাত কাটা হবে, কোন্ হাত কাটা হবে, হাতের কোন্ স্থান কাটা হবে এসব বিষয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তাঁর মহান আদর্শকে সম্মুখে রেখে ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। চোরের ডান হাতের কব্জি থেকে কাটা হবে। তবে কি পরিমাণ টাকা পয়সা চুরি করা হলে হাত কাটা হবে এ সম্পর্কে আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীনদের কিছুটা মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর মতে একটি স্বর্ণ মুদ্রার এক চতুর্থাংশ চুরি করলে হাত কাটতে হবে। আমাদের ইমাম আযম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মতে দশ দেরহাম চুরি করলে হাত কাটা হবে। ইমাম মালেক (রহঃ) এবং ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর মতে, তিন দেরহাম চুরি করলে হাত কাটা হবে।

## বার বার চুরি করার শাস্তি

কোন কোন চোরকে দেখা যায় একবার শাস্তি দেয়ার পর পুনরায় সে চুরি করে। তার শাস্তি সম্পর্কে হাদীস শরীফে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে চোরকে পেশ করা হলে তিনি তার হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দান করেন। কিছু দিন পর সে পুনরায় চুরি করল এবং ধরা পড়ল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবার পা কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। কিছু দিন পর ঐ ব্যক্তি পুনরায় চুরি করল এবং ধৃত হলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করা হলো, তখন তিনি তার দ্বিতীয় হাত কেটে ফেলবার নির্দেশ দেন। পঞ্চম বার যখন সে চুরি করে ধৃত হলো তখন তিনি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। (বর্ণনাকারী-দারে কুতনী)

ইমাম মালেক (রহঃ) "মুয়াত্তায়" আবদুর রহমান এবনে কাসেমের সূত্রে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইয়ামনের এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেদমতে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৭৫-৭৬

হাযির হল, তার এক হাত এবং এক পা কাটা ছিল। সে অভিযোগ করল, ইয়ামনের শাসনকর্তা আমার প্রতি জুলুম করেছে। এ ব্যক্তি রাতে নামাজ আদায় করত। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, "তোমার পিতার শপথ! তোমার রাত চোরের রাত্র নয়ত"?

কিছু দিন পর হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর স্ত্রী হযরত আসমা বিনতে আমীসের হার হারিয়ে গেল। লোকেরা অনুসন্ধান করতে লাগল এবং ঐ ব্যক্তিও লোকদের সঙ্গে ছিল। ঐ লোকটি বলল, "হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি এ নেককারদের ঘরে হামলা করেছে তাকে ধরিয়ে দেয়া তোমার দায়িত্ব"।

অবশেষে ঐ হারটি এক স্বর্ণকারের কাছে পাওয়া গেল। স্বর্ণকার বলল, যে ব্যক্তির হাত পা কাটা, সে-ই আমার নিকট হারটি বিক্রয় করেছে এবং সেও অপরাধ স্বীকার করল। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) তার বাম হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। এ নির্দেশ কার্যকর হলো। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তির বদদোয়া তার নিজের ব্যাপারেই কার্যকর হলো।

হাকেম হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এক চোরকে আনা হলো, সে চাদর চুরি করেছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, মনে হয় লোকটি চুরি করেনি। লোকটি বলল, আমি চুরি করেছি, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ যাও তাকে নিয়ে যাও, তার হাত কেটে নাও এবং চিহ্নিত করে দাও। নির্দেশ কার্যকর করা হলো। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আল্লাহ পাকের নিকট তওবা কর। সে বলল, আমি আল্লাহর নিকট তওবা করলাম। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আল্লাহ পাক তোমার প্রতি দয়া করে তোমার তওবা কবুল করেছেন। তোমার প্রতি রহমত নাযিল করেছেন।

جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ

অর্থাৎ– হাত কেটে ফেলার এ শাস্তি হলো আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আদর্শ শাস্তি। যাতে করে এ ব্যক্তি এবং অন্যান্যরা এ ঘটনা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে।

وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

অর্থাৎ– আল্লাহ পাক প্রবল পরাক্রমশালী, তিনি মহাজ্ঞানী, এজন্যেই তিনি এমন কল্যাণকর বিধান প্রবর্তন করেছেন। যদি চোর ডাকাতকে সঠিক শাস্তি না দেয়া হয়

তবে তাঁর বান্দাদের জীবন দুর্বিষহ হবে। তবে কাকে কি শাস্তি দিতে হবে তা তিনিই জানেন, কেননা তিনি মহাজ্ঞানী, তাঁর প্রতিটি কাজ হেকমতপূর্ণ।

## কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতের "সারাকাহ" শব্দটির আভিধানিক হলো অন্যের সম্পদ গোপনে নিয়ে যাওয়া বা অপহরণ করা। এ পর্যায়ে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-

১. অপহরণকারী হুশবহাল এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হতে হবে। অতএব, পাগল এবং শিশুর উপর আয়াতে বর্ণিত শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না।

২. অপহরণ গোপনে হয়। প্রকাশ্যে যদি কারো সম্পদ কেউ জরবদস্তি নিয়ে যায় তবে তা চুরি নয় ডাকাতি। তার জন্যে শাস্তি অন্য আয়াতে ঘোষিত হয়েছে। চুরির শাস্তির তার প্রতি প্রয়োগ করা হবে না।

৩. চুরি করা সম্পদ কারো মালিকানায় থাকতে হবে। যদি কারো মালিকানায় না থাকে তবে এমন সম্পদ অপহরণকারীর প্রতি চুরির শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না। যেমন, কাফন চোর। কাফন ওয়ারিষানদের মালিকানায় নয়, মৃত ব্যক্তিও এর মালিক নয় এবং উত্তরাধিকারীগণও নয়। অতএব, কাফন চোরকে হাত কাটার শাস্তি দেয়া হবে না, অন্য শাস্তি হবে।

৪. সম্পদ অন্যের হতে হবে। নিজেদের মধ্যে কারো হলে এমন অপহরণকে চুরি বলা যাবে না। যেমন আপন আত্মীয়-স্বজন যদি কারো কিছু নিয়ে যায়, অথবা কোন শরীকদার যদি অন্য শরীকের কিছু নিয়ে যায় অথবা স্বামী স্ত্রীর বা স্ত্রী স্বামীর কোন কিছু নিয়ে যায় তবে তাকে চুরি বলা যাবে না এবং তাকে চুরির শাস্তি যা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তা প্রয়োগ করা হবে না।

৫. সম্পদ সংরক্ষিত হতে হবে। যদি সংরক্ষিত না হয়, তবে এ অবস্থায়ও হস্ত কর্তনের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না।

৬. যদি চোরের হাত কাটা হয় আর চুরি করা সম্পদও পাওয়া যায়, তবে মালিককে তা ফেরত দেয়া হবে। কিন্তু সম্পদ যদি পূর্বেই বিনষ্ট হয়ে যায় আর চুরির শাস্তি প্রয়োগও করা হয় তবে সম্পদ ফেরত দেয়া চোরের দায়িত্ব থাকবে না। কেননা, হাত কাটার মাধ্যমেই তার চৌর্য্যবৃত্তির শাস্তি হয়েছে। চুরি একটি অপরাধ, তার জন্যে দু'টি শাস্তি হতে পারে না।

৭. কোন ব্যক্তি যদি কয়েকবার চুরির পর গ্রেফতার হয়, তবে একবারই হাত কাটা হবে, কেননা সকল অপরাধের শাস্তি একবারই হবে।

৮. বোখারী শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে, চোর যখন চুরি করে তখন সে ঈমানদার অবস্থায় থাকে না।

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ

(অতঃপর যে তওবা করে, তার জুলুমের পর এবং নিজের সংশোধন করে, তবে আল্লাহ পাক তার তওবা কবুল করেন।) আলোচ্য আয়াতে "জুলুম" শব্দের অর্থ চৌর্য্যবৃত্তি বা চুরি করা, আর "এসলাহ" শব্দটির অর্থ সংশোধন ও উপরোক্ত অপরাধ বর্জন। অতএব, আয়াতের অর্থ হলো যে চুরির নিন্দনীয় কুকর্ম বর্জন করে আত্মসংশোধনের প্রয়াস পায় এবং খাঁটি অন্তরে তওবা করে তবে আল্লাহ পাক এমন লোকের তওবা কবুল করেন, কেননা তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত একখানি হাদীসে রয়েছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, চুরির অপরাধে একজন স্ত্রীলোকের হাত কাটা হয়েছিলো। অতঃপর সে তওবা করে এবং তার বিয়ে হয়, সে আমার নিকট আসত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে তার প্রয়োজনের কথা পেশ করত। এতে দুটি বিষয় প্রমাণিত হয়ঃ

১. তওবা করলে তথা খাঁটি তওবা হলে কবীরা গুনাহ মাফ হয়।

২. যদি অপরাধী তওবা করে ফেলে তবে তাকে তিরষ্কার করা উচিত নয় কেননা, যে এসলাহ বা আত্মসংশোধন করে তাকে জালেম বলা যায় না, আর যে জালেম নয় তাকে তিরষ্কার করা যায় না। এখানে আরো উল্লেখ্য, চোর যদি কাফের হয় তবে ইসলাম কবুল করার পর তার উপর চুরির শাস্তির প্রয়োগ করা হবে না কেননা, দ্বীন ইসলাম সকল অপরাধকেই দূরীভূত করে।

এখানে আরো একটি কথা স্মরণযোগ্য, চুরির অপরাধের পর যদি কেউ সত্যিই অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং অপহৃত দ্রব্য তার মালিককে ফিরিয়ে দেয় আর যদি তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে তা পরিবর্তন কর দেয় আর অক্ষম হলে ক্ষমা চেয়ে নেয় এবং ভবিষ্যতে এমন কুকর্ম করবে না বলে শপথ নেয়, এতদ্বারা যদিও দুনিয়ার শাস্তি মুলতবী হবে না, কিন্তু আখেরাতের শাস্তি মাফ হবে বলে আশা করা যায়। কেননা, আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

বস্তুতঃ সমগ্র বিশ্বের একমাত্র মালিক আল্লাহ পাক, আসমান জমীনে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব তাঁর। তাঁর ইচ্ছা মর্জি সর্বত্র কার্যকর হয়। অতএব, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে আযাব দেবেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে মাফ করবেন। এ ব্যাপারে কারো কোনো বক্তব্য নেই। কারো কোন অধিকার নেই। কর্তব্য হলো শুধু তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। তাঁর প্রদত্ত বিধি-নিষেধ পুরোপুরি মেনে চলা। তিনি যে জীবন বিধান-প্রদান করেছেন তা যথাযথ বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করা। এটিই জীবন-সাধনার পরিপূর্ণ সাফল্য লাভের একমাত্র পন্থা।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا
يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟
ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ ٱلَّذِينَ
هَادُوا۟ ۛ سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ ۙ لَمْ
يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهِۦ ۖ يَقُولُونَ
إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟ ۚ
وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ
أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ
فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾

তরজমা

(৪১) হে রসূল! সে সব লোক যেন আপনাকে চিন্তিত না করে যারা কুফরী কাজে দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়, তারা সে সব লোকদের মধ্যেই হোক, যারা শুধু মুখে বলে যে, আমরা বিশ্বাসী। অথচ তাদের অন্তর বিশ্বাসী নয় অথবা তারা ইহুদীদের মধ্য থেকে হোক, যারা মিথ্যা শ্রবণে অভ্যস্ত, আপনার কথা অন্য সম্প্রদায়ের নিকট শ্রবণ করে আপনার নিকট আসে না। (আল্লাহ তায়ালার) পবিত্র কালামকে তারা স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে ফেলে। তারা বলে, যদি তা তোমাদেরকে দেয়া হয় তবে তা গ্রহণ কর। আর যদি তা তোমাদেরকে না দেয়া হয় তবে তোমরা তা থেকে বেঁচে

থাক। এবং যার ধ্বংস হওয়া স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার মর্জি হয়, তাকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করার কোন শক্তিই আপনার নেই। এরা সে সব লোক, যাদের অন্তর পবিত্র করতে আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন না। দুনিয়াতে তাদের জন্যে রয়েছে অপমান এবং আখেরাতে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা।

## তফসীরুল কোরআন

### শানে নুযুল

একবার খায়বরের অধিবাসী ইহুদীদের মধ্যে একটি ব্যভিচারের ঘটনা ঘটে। ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনী উভয়ই ছিল ইহুদী সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক। তৌরাতে ব্যভিচারের শাস্তি ছিল পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু ইহুদীরা এ শাস্তি প্রথা ধনী অপরাধীদের ব্যাপারে প্রয়োগ করেনি। তাই তারা তৌরাতের পরিবর্তন করে এবং নিজেদের তরফ থেকেই একটি শাস্তির প্রথা তৈরী করে। ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনীকে মুখ কালো করে গাধার উপরে আরোহন করিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করা এবং ১০০ কোড়া– এই হল তাদের বানোনো শাস্তি।

খায়বরে যখন এ ঘটনা ঘটে তখন তারা পরামর্শ করে যে, এ মোকদ্দমা চল আমরা (হযরত) মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের) নিকট নিয়ে যাই। হয়ত তাঁর শরীয়তে আরো সহজ হুকুম হবে। কেননা, তাঁর শরীয়ত তৌরাতের ন্যায় কঠিন নয়। এদিকে তাদের ধারণা ছিল তিনি তো উম্মী নবী। তিনি তো তৌরাত পাঠ করেননি, আমরা আমাদের বিধান-সম্পর্কে যা বলবো সে মোতাবেক তিনি সিদ্ধান্ত দেবেন, আর যাদেরকে অপরাধীদের সঙ্গে প্রেরণ করা হয়েছে তাদেরকে একথা বলে দেয়া হয়েছে যে, যদি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোড়া মারার আদেশ দান করেন তবে তা কবুল করে নিও। কিন্তু যদি তিনি এ আদেশ না দেন তবে আমল করোনা।

খায়বরের ইহুদীরা যখন এ মোকদ্দমা নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো তখন আল্লাহ পাক ওহীর মাধ্যমে তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, তৌরাতে ব্যভিচারের শাস্তি হলো রজম অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তৌরাতে ব্যভিচারের শাস্তি কি?

তারা মিথ্যা বললো যে, অপরাধীর মুখ কালো করে গাধার উপর আরোহন করে শহরে ঘোরানো এবং কোড়া লাগানো। তিনি একথা শ্রবণ কর নীরব হলেন এবং মসজিদে নববী থেকে উঠে সরাসরি ইহুদীদের মাদ্রাসায় তশরিফ নিয়ে গেলেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম কে? তারা বলল, এবনে সুরীয়া। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বল, তৌরাতে বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি কি?

এবনে সুরীয়া এবং তার সঙ্গীরা বললো, শাস্তি হলো মুখ কালো করে গাধার উপর আরোহন করিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করানো এবং বেত্রাঘাত করা। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তুমি ভুল বলছো। তৌরাত নিয়ে এস এবং আমার সম্মুখে পাঠ কর। তৌরাত আনা হলো এবং ব্যভিচারের শাস্তির কথা যে আয়াতে রয়েছে তার উপর হাত রেখে আগের এবং পরের আয়াত পাঠ করলো।

তখন হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! তোমার হাত উঠাও। সে তার হাত উঠিয়ে নিল। তখন তার হাতের নীচ থেকে রজমের আয়াত পাওয়া গেল। তখন তারা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সত্য। এ সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তৌরাত মোতাবেক আমি এই আদেশ দিচ্ছি, তাদের উপর রজমের শাস্তি জারি করা হোক। এ আদেশ মোতাবেক উভয় অপরাধীকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়। এ সময়ই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) এ ঘটনা সম্পর্কে ইমাম আহমদ এবং ইমাম মুসলিমের সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, হযরত বারা এবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একজন ইহুদীকে বেত্রাঘাত করে মুখ কালো করে দেয়া হয় এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখ দিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমাদের গ্রন্থে এ কি ব্যভিচারের শাস্তি?

তারা বললো জ্বী-হ্যাঁ। তখন তিনি ইহুদী ধর্মযাজককে তলব করলেন এবং এরশাদ করলেন, আমি সেই আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করি যিনি মূসা (আঃ)-এর প্রতি তৌরাত নাযিল করেছেন। তুমি বল তোমাদের গ্রন্থে ব্যভিচারের শাস্তি কি?

সে বলল, যদি আপনি শপথ না দিতেন তাহলে আমি সত্য কথা বলতাম না। আমাদের কিতাবে (তৌরাতে) ব্যভিচারের শাস্তি হলো পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া। কিন্তু যখন আমাদের বড় লোকদের মধ্যে ব্যভিচারের প্রসার ঘটল তখন আমাদের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত হয়ে গেল যে বড় কেউ ধরা পড়লে আমরা তৌরাতে বর্ণিত শাস্তি প্রয়োগ করি না। আর যখন কোন দুর্বল বা দরিদ্র কেউ ধরা পড়ে তখন তার উপর আমাদের শরীয়ত মোতাবেক শাস্তি প্রয়োগ করি। অবশেষে আমরা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, মুখ কালো করে বেত্রাঘাত করাই হলো ব্যভিচারের শাস্তি।

এ শাস্তি আমরা ধনী-দরিদ্র উভয় সমাজের উপরই প্রয়োগ করি। একথা শ্রবণ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, হে আল্লাহ! এরা

১। তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩৪
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৯২
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-৬ খন্ড-৭ পৃষ্ঠা-৯২
তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২৩২
তফসীরে কুরতবী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৭৬

তোমার আদেশকে বর্জন করেছে। আমি সর্বপ্রথম এ আদেশ জারি করছি। একথা বলে তিনি অপরাধীদের প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার আদেশ দিলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

## প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা

يَاأَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ

(হে রসূল!) যারা কুফরের দিকে ছুটে যায় তাদের অন্যায় আচরণ আপনাকে যেন চিন্তিত না করে। দুর্বৃত্ত ইহুদীদের ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং মুনাফেকদের অন্যায় আচরণ কখনো কখনো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে চরমভাবে কষ্ট দিত। মদীনা তৈয়্যেবায় এ দুটি দল সর্বদা প্রতারণা, ধোকাবাজি এবং ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে তাদের চক্রান্তের অন্ত ছিল না, এসব কারণে কোন কোন সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মর্মাহত হতেন।

এজন্যে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, (হে রসূল!) কাফের মুনাফেকদের অন্যায় আচরণে আপনি চিন্তিত হবেন না। এরা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা, স্বয়ং আল্লাহ পাক আপনার সাহায্যকারী, আপনার হেফাজতকারী। তাদের ষড়যন্ত্র যত জঘন্যই হোক না কেন তার জন্যে আপনার প্রতিপালকই যথেষ্ট। ইসলামের বিরুদ্ধে এ ষড়যন্ত্রকারী মুনাফেক হোক অথবা ইহুদী, তারা মিথ্যা কথা শ্রবণে অভ্যস্ত। তাদের তথাকথিত নেতাদের কাছে অন্যায়-অসত্য কথা শ্রবণ করে থাকে। তাই আপনার সত্য কথা এবং সত্যের দাওয়াত কবুল করতে পারে না। অতএব, তাদের জন্যে দুঃখ করে কোন লাভ নেই। তারা যদি আপনার মজলিশে আসেও তবে আপনার কথা শ্রবণের জন্যে আসে না, বরং আপনার কথা তাদের সম্প্রদায়ের অন্য লোকদের শোনাতেই আসে। শুধু তাই নয়, তৌরাতে তারা পরিবর্তন–পরিবর্ধন করে তাদের মনগড়া কথা তাতে লিপিবদ্ধ করে। তারা বলে যদি তাঁর নিকট তোমাদের পছন্দনীয় কথা শ্রবণ কর তবে তা গ্রহণ কর। আর যদি তোমাদের পছন্দনীয় কথা না হয় তবে বর্জন কর।

سَمّٰعُوْنَ এ শব্দটি আধিক্য বাচক বা মোবালেগার শব্দ। অর্থাৎ তারা অতি মাত্রায় শ্রবণ করে বা অধিকতর শ্রবণ করে, কেননা তাদের উদ্দেশ্য হলো গুপ্তচরবৃত্তি।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৯১-৯২

তারা আল্লাহর কালামকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যায়। শরীয়তকে তথা আল্লাহর বিধানকে তাদের প্রবৃত্তির অনুগত করে, নিজেদেরকে আল্লাহর বিধানের অনুগত করতে চায়না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হল ইহুদী ধর্মযাজকরা যে সব মিথ্যা কথা তৈরী করে, সেগুলোকে এরা আল্লাহর বিধান হিসেবেই গ্রহণ করে। (হে রসূল!) যারা আপনার নিকট আসে তারা আপনার কথা শ্রবণ করার উদ্দেশ্যে আসে না, বরং যেসব ইহুদী শত্রুতা অথবা অহমিকার কারণে আপনার নিকট আসে না, তাদের চর হিসেবেই বনী কোরায়জা গোত্রের গুপ্তচররা আসে এবং খায়বরের ইহুদীদের পক্ষে এরা গুপ্তচর বৃত্তি পরিচালনা করে।

আল্লাহর কালাম তৌরাতে ব্যভিচারের যে শাস্তি রজম রয়েছে তা তারা তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে পরিবর্তন করে দিয়েছে।

وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যাকে পথভ্রষ্ট করতে ইচ্ছুক হন, যাকে তিনি ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন (হে রসূল!) আপনি তাকে রক্ষা করতে সক্ষম হবেন না অর্থাৎ আল্লাহর পাকের তরফ থেকে আপনি এ শক্তি পাবেন না যে, তাকে সাহায্য করেন তথা আল্লাহ পাক যাকে ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেন তাকে কেউ সাহায্য করতে পারে না।

(হে রসূল!) যারা আপনার বিরুদ্ধে বা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাদের ধ্বংস অনিবার্য, তাদের শাস্তি অবধারিত। আপনি যতই তাদেরকে হেদায়েত করার চেষ্টা করেন না কেন, তাদেরকে হেদায়েত করতে সক্ষম হবেন না। কেননা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ব্যতীত কেউ হেদায়েত লাভ করতে পারে না।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ

"এরাই সে সব লোক যাদের অন্তরকে আল্লাহ পাক হেদায়েতের করতে ইচ্ছা করেন নাই"।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, যদি কোন রোগী ঔষধ সেবনে রাজি না হয়, অপথ্য-কুপথ্য বর্জনেও প্রস্তুত না হয়, সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাতে চাইলেও সে চিকিৎসার জন্যে প্রস্তুত না হয়, এমনকি, চিকিৎককে উপহাস করে, চিকিৎসককে গালি দেয়, তার ব্যবস্থাপত্র ফেলে দেয়, কোন ঔষধ গ্রহণ করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে, চিকিৎসককে সর্বদা কষ্ট দিতে থাকে এমন রোগীকে যদি চিকিৎসক বলে তোমার অদৃষ্টে চিকিৎসা নাই অথবা তিনি যদি বলেন, তোমার

চিকিৎসা আমার পক্ষে সম্ভব নয় তবে কি চিকিৎসককে নিষ্ঠুর, নির্দয় বলা যাবে? কখনও না। এমন রোগীর মৃত্যু হলে লোকেরা বলবে এ মৃত্যুর জন্য সে-ই দায়ী।

ঠিক এ অবস্থাই ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগের ইহুদী এবং মুনাফেকদের। আল্লাহ পাক তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে তাদের হেদায়েতের জন্যে শ্রবণ করেছেন, তাঁকে রহমতুল্লিল আলামীন রূপে প্রেরণ করেছেন। তাঁর দয়া মায়ার কোন সীমা ছিল না। কিন্তু যারা পথভ্রষ্ট, যারা ভাগ্যাহত, যারা নিজেদের কপাল নিজেই নষ্ট করেছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক যদি বলেন যে, তাদেরকে পবিত্র করার তথা হেদায়েত করার ইচ্ছা আল্লাহ পাকেরই নাই-একথা কি অযৌক্তিক? আদৌ নয়, বরং এ ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত। এজন্যেই আল্লাহ পাক পরবর্তী বাক্যে তাদের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

অর্থাৎ- তাদের জন্যে দুনিয়াতে রয়েছে অপমান, যেমন বনী কোরায়জাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল অথবা জিজিয়া আদায় করার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। আর শুধু দুনিয়ার এ অপমানই যথেষ্ট নয়, বরং তাদের জন্যে রয়েছে আখেরাতে কঠোর কঠিন শাস্তি।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এর অর্থ হলো তারা সর্বদা দোযখে থাকবে, কখনোই তারা দোযখ থেকে নাজাত পাবে না। এ পরিণতি হয় ইহুদীদের অথবা মুনাফেকদের অথবা উভয় দলের।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক অনেক স্থানেই "ইয়া আইয়্যুহান নাবিয়্যু" বলে সম্বোধন করেছেন কিন্তু শুধু দুটি স্থানে "ইয়া আইয়্যুহার রসূল" বলেছেন আর তা আলোচ্য আয়াতে এবং পরবর্তী একখানি আয়াতে। এতে তাঁর বিশেষ মর্যাদা প্রকাশিত হয়েছে।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৯৬-৯৭
২। তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-২৩১

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ
بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ
شَيْـًٔا ؕ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِيْنَ ﴿۴۲﴾ وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ
فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَآ اُولٰٓئِكَ
بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴۳﴾

তরজমা

(৪২) তারা অত্যধিক মিথ্যা শ্রবণে ও অত্যধিক হারাম ভক্ষণে অভ্যস্ত। (হে রসূল!) অতঃপর তারা যদি আপনার নিকট আসে তবে আপনি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিন। অথবা তাদের তরফ থেকে বিমুখ থাকুন। আর আপনি তাদের তরফ থেকে বিমুখ হলে তারা আপনার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আর যদি আপনি মীমাংসা করেন তবে ন্যায়-নীতি অনুসারে মীমাংসা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ন্যায়পরায়ণ লোকদেরকে ভালবাসেন।

(৪৩) এবং তারা কিভাবে আপনাকে হাকীম মানবে? তাদের নিকট তৌরাত রয়েছে, তাতে আল্লাহর হুকুম বর্তমান অথচ তারা এতদসত্ত্বেও ফিরে যায়। আর তারা আদৌ মোমেন নয়।

## তফসীরুল কোরআন

### শানে নুযুল

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে ইহুদী নেতা কা'ব এবনে আশরাফ গং-এর ব্যাপারে। তারা ঘুষ নিয়ে মোকদ্দমায় রায় দিত, আর যে ঘুষ দিত তার মিথ্যা কথা শ্রবণ করতো আর অপর পক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাতও করতো না।

হাসান (রঃ), কাতাদা (রঃ), মোকাতেল (রঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, মোকদ্দমার মীমাংসার ক্ষেত্রে যে ঘুষ গ্রহণ করা হয় তা সর্বাধিক মন্দ। হাসান (রহঃ) বলেছেন, বাতিলকে হক্ব বানাবার এবং হক্বকে বাতিল ঘোষণা করার জন্যে

বিচারককে যে ঘুষ দেয়া হয় তা অত্যন্ত কঠিন মন্দ, নিন্দনীয়। কিন্তু জুলুমকে প্রতিরোধ করার জন্যে যদি হাকীমকে ঘুষ দেয়া হয় তবে তাতে ক্ষতি নেই। অর্থাৎ জান মালের হেফাজতের জন্যে যদি হাকীমকে কোন কিছু দেয়া হয় তবে দাতার কোন গুনাহ হবে না তবে যে গ্রহণ করবে তার জন্যে যে কোন অবস্থাতেই তা হারাম হবে।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) একথাও বলেছেন যে, এ হুকুম তখনকার জন্যে যখন ফরিয়াদী হক্বের উপর থাকে, সে যদি এই আশঙ্কা করে যে, হাকীম ঘুষ না নিয়ে আমার হক্ব দেবে না এবং বিপক্ষের জুলুম দূরীভূত করবে না, এমন অবস্থায় হাকীমকে কিছু দেয়া অবৈধ হবে না। সত্যের পক্ষে রায় দেয়ার নিমিত্তে কিছু গ্রহণ করা অবৈধ হবে।

হযরত এবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, যদি কেউ কারো হক্ব দেয়ার জন্যে অথবা কারো জুলুম দূর করার জন্যে হাকীমের নিকট সুপারিশ করে আর হাকীমকে কিছু দেয় আর হাকীম তা গ্রহণ করে তবে তা হারাম হবে। লোকেরা বলল, অবৈধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে যদি কিছু গ্রহণ করা হয় তাকে সোহ্‌ত বলা হবে। তিনি বললেন, অবৈধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে কিছু গ্রহণ করা কুফর। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

অর্থাৎ- আল্লাহ পাক যা কিছু নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনা তারা কাফের।

মসরুক (রঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কোন অবৈধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে ঘুষ নেয়া সোহতের (হারাম খোরী) অন্তর্ভুক্ত কি?

তিনি বললেন না, তাতো কুফর। আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত 'সোহত' শব্দটির ব্যাখ্যা হলো- বাদশাহর নিকট কেউ নৈকট্য লাভ করে, যদি কেউ এই মোসাহেবের নিকট গমন করে আর সে কোন হাদিয়া তোহফা ব্যতীত ঐ ব্যক্তির কাজ না করে এমন অবস্থায় 'সোহত' শব্দটি ব্যবহৃত হবে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, সোহ্‌তের দুটি পন্থা যার নিকট থেকে হারাম খায় অথবা অবৈধ সিদ্ধান্তের জন্যে যে ঘুষ দেয়া হয়।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৯৭

## হযরত ওমর (রাঃ)-এর আদালত

বর্ণিত আছে যে, কোন একটি মোকদ্দমায় ফরিয়াদী এবং আসামী হযরত ওমর (লাঃ)-এর দিকে আসতে থাকে। তিনি তাদেরকে দেখে থামিয়ে দেন। তারা কিছুক্ষণ পর পুনরায় তাঁর দিকে অগ্রসর হয়। তিনি এবারও তাদের থামিয়ে দেন। কিছুক্ষণ পর তৃতীয় বার তারা তাঁর দিকে অগ্রসর হয়, তিনি তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। লোকেরা এ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ প্রথম যখন তারা আমার নিকট আসছিল তখন আমার মনের অবস্থা এই ছিল যে, আমার মন তাদের এক পক্ষের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। এজন্যে আমি ঐ অবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সমীচিন মনে করিনি।

দ্বিতীয়বার যখন তারা আমার দিকে এগিয়ে আসে তখন আমার মনের অবস্থা এমন ছিল যে, তাতে সিদ্ধান্ত নেয়া আমি উচিত মনে করিনি।

অবশেষে যখন তারা তৃতীয়বার আমার দিকে অগ্রসর হয় তখন আমি লক্ষ্য করলাম যে, আমার মনের সে অবস্থাটি দূরীভূত হয়েছে তখন আমি তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহর লা'নত সে ব্যক্তির প্রতি যে কোন মীমাংসার ব্যাপারে ঘুষ দেয় এবং নেয়। (আহমদ, তিরমিজী)

এবনে হুমাম লিখেছেন যে, ঘুষ কয়েক প্রকার হয়।

১. যদি ঘুষ দিয়ে কেউ কাজীর তথা বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত হয় তবে সে সত্যিকার অর্থে কাজী বা বিচারক হয় না (অর্থাৎ ঘুষের বিনিময়ে বিচারকের পদে অতিষ্ঠিত হওয়া বৈধ নয়)।

২. ঘুষ নিয়ে যদি বিচারক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবে তা জারী হবে না, যদিও সিদ্ধান্ত সঠিক হয় কেননা, বিচারকের কর্তব্য হলো কোন কিছু গ্রহণ না করেই সঠিক সিদ্ধান্ত দেয়া। এ পর্যায়ে কোন অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা বৈধ নয়।

৩. যদি কোন উপকার পাওয়ার জন্যে অথবা কোন ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য হাকীমের নিকট সুপারিশ করা হয় এবং কাজ উদ্ধার করা হয় তবে অর্থ সম্পদ দাতার জন্যে এ কাজটি অবৈধ না হলেও গ্রহীতার জন্যে তা হারাম। গ্রহীতার জন্যে বৈধ উপায়ে গ্রহণ করার পন্থা হলো দু' এক দিনের জন্যে পরিশ্রম করার বিনিময়ে পারিশ্রমিক এবং সময় ব্যয় করার বিনিময়ে সিদ্ধান্ত করে নেবে। এমন অবস্থায় পারিশ্রমিক হিসাবে গৃহীত টাকা ঘুষ বলে পরিগণিত হবে না। এমনিভাবে যদি জীবন ও সম্পদের ব্যাপারে কারো কাছ থেকে ভয় থাকে আর এ ভয়ের কারণে তাকে কিছু দিয়ে দেয়া হয় এমন অবস্থায় গ্রহীতার জন্যে তা হারাম, আর দাতার জন্যে বৈধ।

**এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, ঘুষ কয়েক প্রকার হয়–**

১. যদি পরস্পরের প্রীতি ও ভালবাসা বৃদ্ধির জন্যে কিছু দেয়া হয় তবে তা ঘুষ নয়, হাদিয়া তোহফা আর তা বৈধ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা পরস্পর হাদিয়া তোহফা দাও, তাহলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মহব্বত হবে।

২. কেউ যদি কোন লোককে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে এমন অবস্থায় জীবন ও সম্পদের সংরক্ষণের স্বার্থে সে তাকে কিছু দিয়ে দেয় তবে তা গ্রহণ করা হালাল নয়। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্যে দেয়া বৈধ কেননা, আত্মরক্ষা করা সবারই কর্তব্য।

৩. কোন ব্যক্তিকে এ উদ্দেশ্যে কিছু দেয়া যে, সে হাকীমের নিকট সুপারিশ করবে। যদি ঐ কাজটিই হারাম হয় তবে সুপারিশের জন্যে অর্থ সম্পদ দেয়া এবং নেয়াও হারাম হবে। আর যদি ঐ কাজটি বৈধ হয় আর অর্থ-সম্পদ এজন্যে দেয়া হয় যে, হাকীমের নিকট থেকে সুপারিশ করে তার কাজ করিয়ে দেবে- এমন অবস্থায় দেয়া বৈধ। কিন্তু গ্রহীতার জন্যে গ্রহণ করা বৈধ কি-না এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ বলেন বৈধ, কেউ বলেন অবৈধ।

এ অবস্থায় তা হালাল হওয়ার পন্থা হলো-যে ব্যক্তি কাজ করবে সে তার সময় এবং মেহনতের বিনিময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নেবে।

আর হাকীমের নিকট থেকে সুপারিশ করে কাজ উদ্ধার করার কোন বিনিময় নেবে না। এমন অবস্থায় যার কাজ সে যদি নিজের তরফ থেকে কিছু দিয়ে দেয় তবে একদল ওলামায়ে কেরাম বলেন এটা বৈধ, আর একদল বলেন এ পন্থাও অবৈধ।[১]

فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ

অর্থাৎ- (হে রসূল!) যদি ঐ ইহুদীরা আপনার নিকট তাদের মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত পাওয়ার জন্যে আসে তবে আপনি তাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত করে দিন। অথবা তাদের তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। (হে রসূল!) যদি আপনি তাদের নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন তবে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি আপনি তাদের মধ্যে বিচার করতে চান তবে ন্যায়সঙ্গত ভাবে বিচার করুন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক ন্যায় বিচারকদেরকে পছন্দ করেন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৯৯

তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ অধিকার দিয়েছেন যে, যদি অমুসলিমরা তাঁর নিকট কোন মোকদ্দমা নিয়ে আসে তবে তাদের মোকদ্দমা ফয়সালা করা না করা তাঁর ইচ্ছাধীন।

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেন, যদি জিম্মি কাফের নিজেদের মোকদ্দমার মীমাংসায় মুসলিম বিচারকের নিকট আসে তবে বিচারক কি করবেন?

অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, বিচার করা না করা মুসলিম বিচারকের ইচ্ছাধীন। ইমাম নখয়ী, ইমাম শা'বী, আতা এবং কাতাদা এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, কাফেরদের মোকদ্দমার ফয়সালা করে দেয়া মুসলিম বিচারকের কর্তব্য। এ মত পোষণ করেছেন মুজাহেদ এবং একরামা (রঃ)।

ইমাম বয়জাবী (রঃ) লিখেছেন, যদি দুজন আহলে কিতাব কাফের মুসলিম হাকীমের নিকট মোকদ্দমা নিয়ে হাযির হয় তবে তাদের মোকদ্দমার ফয়সালা করা অবশ্য কর্তব্য নয়। ইমাম শাফেঈ (রঃ) এ মতই পোষণ করেছেন। কিন্তু যদি তাদের উভয় পক্ষের মধ্যে একদল জিম্মি হয় তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়া মুসলিম হাকীমের কর্তব্য।

এ পর্যায়ে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মত হলো, মোকদ্দমার পক্ষ-বিপক্ষ যেই হোক না ফয়সালা দেয়া ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য। তবে এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের নির্দেশ হলো–

وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ

## ন্যায় বিচার কায়েম অবশ্য কর্তব্য

যদি কাফেরদের মোকদ্দমার মীমাংসা করতে হয় তবে কোন পক্ষ যত বড় জালেমই হোক না কেন বিচারের ক্ষেত্রে সুবিচার কায়েম করতে হবে। কোন অবস্থাতেই ন্যায় বা ইসনাফ বর্জন করা যাবে না। কেননা,

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক ন্যায় বিচারকারীদেরকে পছন্দ করেন"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ন্যায় বিচারকগণ আল্লাহ পাকের নিকট নূরের তৈরী মিম্বরের উপরে থাকবে। (মুসলিম শরীফ)

হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের নিকট সর্বোচ্চ মর্তবার অধিকারী হবেন নৈতিক গুণের অধিকারী সুবিচারক হাকীম। আর জালেম মূর্খ হাকীমের পরিণাম হবে ভয়াবহ।

وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰةُ

অর্থাৎ– (হে রসূল!) অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তারা আপনাকে কিভাবে নিজেদের সালিশ বা বিচারক মানে? অথচ তাদের নিকট তৌরাত রয়েছে, আর তাতে রয়েছে আল্লাহর হুকুম কিন্তু তারা মানতে রাজী নয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তারা এমন নবীর বিচার মেনে নিতে প্রস্তুত যাঁর প্রতি তাদের ঈমান নেই। অথচ তারা জানে যে, তৌরাতে ব্যভিচারের শাস্তি হলো প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড। মূলতঃ তাদের আপনার নিকট হাযির হওয়ার এবং আপনাকে বিচারক মেনে নেয়ার উদ্দেশ্য সত্য-সন্ধান নয় এবং শরীয়তের বিধান জারী করাও নয়, বরং সহজতর আদেশ লাভ করার আকাঙ্ক্ষা মাত্র।

ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۭ وَمَآ اُولٰۗىِٕكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ

আর (হে রসূল!) আপনি যখন তাদের মধ্যে তৌরাতে বর্ণিত বিধান মোতাবেক মীমাংসা করেন তখন তারা সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। মূলতঃ তারা ঈমানদারই নয়, তাদের কাছে যে কিতাব (তৌরাত) রয়েছে তার প্রতিও ঈমান নেই। আর (হে রসূল!) আপনার নিকট যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে তার প্রতিও তাদের ঈমান নেই।

إِنَّآ أَنزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيهَا هُدًى وَّنُورٌ ۚ
يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَ
الرَّبّٰنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ
وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ
وَلَا تَشْتَرُوا بِاٰيٰتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ
أَنزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾

তরজমা

(৪৪) নিশ্চয় আমি তৌরাত নাযিল করেছিলাম যাতে রয়েছে হেদায়েত এবং নূর (যা দ্বারা) আল্লাহ তায়ালার নবীগণ ইহুদীদের মধ্যে মীমাংসা প্রদান করতেন। এবং আল্লাহ ওয়ালা ও আলেমগণ (সে অনুযায়ী আদেশ করতেন) এজন্যে যে, আল্লাহ তায়ালার কিতাবের হেফাজতের দায়িত্ব তাদেরকে প্রদান করা হয়েছিল এবং তারা তার উপর সাক্ষী ছিল। অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করোনা এবং শুধু আমাকে ভয় কর আর আমার আয়াত সমূহের হীন মূল্য গ্রহণ করোনা এবং যারা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক অবতীর্ণ কিতাব অনুসারে আদেশ করে না সে সব লোকই কাফের।

## তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ এতে ইহুদীদের জন্যে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী। যারা ছিল আল্লাহর নাফরমান, যারা তৌরাতে বর্ণিত আল্লাহর বিধান সমূহ অমান্য করত, এমনকি তৌরাতে পরিবর্তন করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আমি তৌরাত নাযিল করেছি। যাতে ছিল হেদায়েত এবং নূর, বনী ইসরাঈল জাতির জন্যে তাতে ছিল শরীয়তের বিভিন্ন বিধান এবং বিধি-নিষেধ আর নূর অর্থাৎ তাতে ছিল তৌহিদের বিবরণ, নুবওয়্যতের কথা, নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান এবং পরকালীন জিন্দেগীর কথা।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে هُدًى শব্দটির তাৎপর্য হল শরীয়তের সেই বিধান যা জানার জন্যে ইহুদীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়েছিল, আর আলোচ্য আয়াতে নূর শব্দের ব্যাখ্যা হল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ সত্য .গামরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন

লোকদের জন্যে তাতে রয়েছে নূর, রয়েছে তাতে চিরশান্তি, চিরমুক্তি লাভের আলো।[১]

يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ

এই কিতাবের আলোকে নবীগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ)-এর পর যত নবী আগমন করেছেন, তারা তৌরাতের বিধান মোতাবেক বিচার ফয়সালা করতেন। হযরত মূসা (আঃ)-এর জমানার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তৌরাতই ছিল আসমানী গ্রন্থ শুধু তাই নয়, বরং আল্লাহ ওয়ালা আলেমগণ এবং সত্য-সাধকগণ এই তৌরাতের অনুসরণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, যারা ছিলেন আল্লাহর প্রতি অনুগত, যারা ছিলেন হেদায়েতপ্রাপ্ত, যারা আল্লাহর নাফরমানী থেকে তওবা করেছেন এবং আল্লাহ বিধান মেনে চলতে অভ্যস্ত হয়েছেন।

আলোচ্য আয়াতের দু'টি শব্দ বিশেষ তাৎপর্যবহ। الرَّبِّيُّوْنَ। অর্থাৎ আল্লাহ ওয়ালা সুফী, তাদের মুরীদগণের নৈতিক মানোন্নয়নকারী, তারা তৌরাতের নির্দেশ মোতাবেক জনগণের মধ্যে হুকুম জারী করতেন।

الْاَحْبَارُ

অর্থাৎ অবিকল ওলামায়ে কেরাম। 'আহবার' শব্দটি হেবরুনের বহুবচন, হেবরুন বলা হয় অভিজ্ঞ আলেমকে, কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, হেবরুন অর্থ সৌন্দর্য। হাদীস শরীফে এসেছে, দোযখ থেকে এমন একজন লোককে বের করা হবে যার সৌন্দর্য বিদায় নেবে আর ওলামায়ে কেরামকে আহবার এজন্যে বলা হয় যে, ওলামায়ে কেরাম উম্মতের সৌন্দর্য, তারা উম্মতের গৌরব, এল্‌মের সৌন্দর্যে তারা সুসজ্জিত, এজন্যে তত্ত্বজ্ঞানী আলেমদের সম্পর্কে 'আহবার শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ

এজন্যে যে, তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের তথা তৌরাতের হেফাজতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী আমল করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

আয়াতের মর্মকথা হল, যেহেতু আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাদের অনুসারীদেরকে তৌরাতের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তাই তারা মানুষকে তৌরাত মোতাবেক আদেশ দিতেন।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-২

## পবিত্র কোরআনের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ পাক গ্রহণ করেছেন

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ আল্লাহ পাক শুধু পবিত্র কোরআনের হেফাজতের দায়িত্বই গ্রহণ করেছেন, অন্য কোন আসমানী গ্রন্থের নয়। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ

অর্থাৎ-আমি কোরআন নাযিল করেছি এবং আমি তার হেফাজত করব। এভাবে অন্য কোন আসমানী গ্রন্থের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ পাক গ্রহণ করেননি। এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট উম্মতের আলেমদের ওপর। যত দিন তারা সেই কিতাবের তথা তৌরাতের হেফাজতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছেন ততদিন তা সুরক্ষিত ছিল, কিন্তু যখন তারা এ দায়িত্ব পালন করেনি; বরং তারা স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে তাতে পরিবর্তন করেছে তখন তৌরাত আর তৌরাত রয়নি, আর বনী ইসরাঈল জাতিও কোপগ্রস্ত হয়েছে। এ আয়াত দ্বারা তৌরাতের গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে, কেননা হযরত মূসা (আঃ) থেকে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত কয়েক শতাব্দী যাবত তৌরাতই আসমানী কিতাব হিসেবে মানুষের হেদায়েতের উৎস ছিল।[১]

وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ

তদানীন্তন কালের ওলামা ও মাশায়েখগণের উপর শুধু যে তৌরাতের হেফাজতের দায়িত্ব ছিল তাই নয়, বরং তারা ছিল তার উপর সাক্ষী অর্থাৎ একথার উপর সাক্ষী যে, এটি হলো সত্য আসমানী কিতাব এবং তারা মানুষকে এই কিতাবের তা'লিম দিত এবং তৌরাতের বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করতো।

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ

এ বাক্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগের ইহুদী ধর্মযাজক এবং তথাকথিত ইহুদী নেতাদের প্রতি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়নের আহবান জানিয়ে এরশাদ হয়েছে। অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করোনা ভয় কর আমাকে। তৌরাতে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে যে সুসংবাদ রয়েছে তা গ্রহণ করে সর্বশেষ নবীর প্রতি ঈমান আন। এ ভয় করোনা যে, আমরা যদি সর্বশেষ নবীর প্রতি ঈমান আনি তবে লোকজন আমাদের থেকে দূরে সরে যাবে।

১। তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫৪

তফসীরকারগণ লিখেছেন, ইহুদী ধমযাজকদের সত্য গ্রহণের পথে বড় বাধা ছিল তাদের পদ লোভ। তারা মনে করতো যদি সর্বশেষ নবীর প্রতি ঈমান আনা হয় তবে বর্তমান পদমর্যাদা তো যাবেই, মানুষের কাছ থেকে যে হাদীয়া তোহফা পাওয়া যায় তা-ও বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ তোমরা মানুষকে ভয় করোনা, শুধু আমাকে ভয় কর।

وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا

অর্থাৎ- তোমরা আমার আয়াত সমূহের বিনিময়ে নগণ্য অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করোনা। এজন্যে তাদের সম্পর্কে এ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। আর সামান্য অর্থের বিনিময়ে তৌরাতের বিধান পরিবর্তন না করার নির্দেশের প্রেক্ষিতে কেউ যেন একথা মনে না করে যে, তাহলে অগাধ সম্পদের বিনিময়ে কি এ অন্যায় কাজ করা যাবে? কখনও নয় কেননা, সারা পৃথিবী এবং পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে অতি সামান্য ও নগণ্য বিষয়। যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় একথা ঘোষণা করেছেনঃ

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ

(হে রসূল!) আপনি বলে দিন দুনিয়ার সম্পদ অতি সামান্য।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

আর আখেরাত উত্তম ও চিরস্থায়ী। অতএব, আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ হলো, এ ক্ষণস্থায়ী জগতের কোন কিছুর বিনিময়েই আল্লাহর আয়াত সমূহকে বিক্রয় করোনা। সারা পৃথিবী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু একত্রিত করলেও আল্লাহর একটি বিধানের সমতুল্য হবে না।

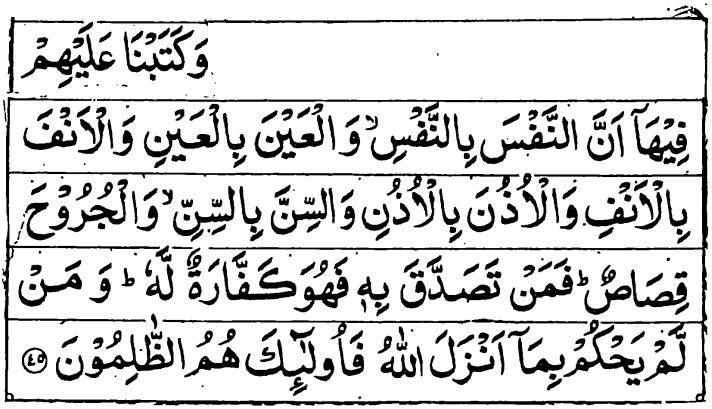
وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

অর্থাৎ- আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ বিধি-নিষেধ মোতাবেক যারা ফয়সালা না করে তারা কাফের। আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ বিধান সমূহকে অস্বীকার করা কাফের হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু ইহুদীরা তার চেয়েও বেশী অন্যায় করতো তা হলো, নিজেদের তৈরী বিধানকে তারা আল্লাহর বিধান বলে দাবী করতো, এমনি ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারীদের কাফের হবার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এবনে জরীর (রঃ) লিখেছেন–

عن ابن زيد قال من حكم بكتاب الذى كتب بيده وترك

كتاب الله وزعم ان كتابه هذا من عند الله فقد كفر

এবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেছেনঃ যে নিজের হাতের লেখা কিতাব দ্বারা ফয়সালা করে এবং আল্লাহর কিতাবকে পরিত্যাগ করে আর মনে করে তার রচিত কিতাবই আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে তবে সে অবশ্যই কাফের হয়েছে।


وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ
فِيهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ
بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَالْجُرُوْحَ
قِصَاصٌ ؕ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ؕ وَمَنْ
لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٥﴾

## তরজমা

(৪৫) এবং আমি তৌরাতে তাদেরকে এ আদেশও দিয়েছিলাম যে, জীবনের বিনিময়ে জীবন এবং চক্ষু, নাসিকা ও কর্ণের বিনিময়ে চক্ষ নাসিকা ও কর্ণ। এবং দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং আঘাতেরও বিনিময় রয়েছে। অতঃপর যে কেউ মাফ করে দেয়, সে গুনাহ থেকে পাক হয়ে যায়। আর যারা আল্লাহ পাকের অবতীর্ণ বিধান অনুসারে হুকুম করে না তারাই তো জালেম।

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী একখানি আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, ইহুদীরা তৌরাতে বর্ণিত ব্যভিচারের শাস্তি 'রজমকে" পরিবর্তন করেছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশি মোতাবেক শাস্তির বিধান প্রয়োগ করেছে।

আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, ইহুদীরা অনুরূপভাবে হত্যা বা খুন-জখমের শাস্তির ব্যাপারে তৌরাতে বর্ণিত বিধান অমান্য করেছে। বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ এই, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে মদীনা মোনাওয়্যারায় ইহুদীদের দু'টি গোত্র ছিল। বনু কোরায়জা এবং বনু নজির। বনু নজির ছিল অবস্থাসম্পন্ন। অর্থ-সম্পদে, জ্ঞানে-গুণে বনু কোরায়জার মোকাবেলায় বনু নজীর ছিল প্রভাবশালী। এজন্যে বনু নজীরের কেউ যদি বনু কোরায়জার কোন লোককে হত্যা

করতো তবে তার কেসাসের আদেশ দেয়া হতো না অর্থাৎ প্রাণের বদলা প্রাণের বিধান প্রয়োগ করা হতো না, বরং অর্ধেক দিয়ত আদায়ের পন্থা অবলম্বন করা হত কেননা, বনু কোরারজা ছিল দারিদ্র-প্রপীড়িত।

পক্ষান্তরে, যদি বনু কোরায়জার কাউ বনু নজীরের কাউকে হত্যা করতো তবে কেসাস বা প্রাণের বদলা প্রাণ দিতে হতো। এ সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الاية

## কেসাসের আদেশ

আমি তৌরাতে লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বদলে প্রাণ দিতে হবে, আর চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান এবং দাঁতের বদলে দাঁত দিতে হবে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ ছিল এই, তখন বনু কোরায়জার এক ইহুদী বনু নজির গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলে। সাবেক রেওয়াজ মোতাবেক বনু নজীর নিহত ব্যক্তির পূর্ণ দিয়তের জন্যে বনু কোরায়জার নিকট দাবী করে। কিন্তু বনু কোরায়জা তখন এ দাবী মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং বলে, সেদিন চলে গেছে যখন তোমরা আমাদের প্রতি জুলুম করতে। আমরা দুর্বল ছিলাম, তোমরা ছিলে সবল। তাই তোমাদের অত্যাচার আমাদের মাথা পেতে নিতে হতো। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, তোমরা যা দেবে আমরাও তার সমানই দেব, এর বেশী আমরা কোন অবস্থাতেই দেবনা।

হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্য ও ন্যায়ের যুগে, তাঁর ইনসাফ বা সুবিচারের আমলে আর দুর্বলকে নিষ্পেষিত করা চলবে না। তিনি সাম্য মৈত্রী এবং ন্যায় বিচার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলকে জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমকে সাহায্য করেন।

## বিস্ময়কর বিষয়

এখানে বিস্ময়কর বিষয় এই, বনু কোরায়জাও ইহুদী এবং বনু নজীরও ইহুদী। সবল বনু নজীর গোত্র দুর্বল বনু কোরায়জার উপর জুলুম করতো। মজলুম বনু কোরায়জা ইহুদী হওয়া সত্ত্বেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ন্যায় পরায়ণতার মহান আদর্শে বিশ্বাসী ছিল এবং তাঁর নিকট তারা সুবিচার প্রত্যাশা করতো। অথচ তাদের আপন লোকদের কাছে সে আশা করতো না। সে কারণেই অবশেষে দু' ইহুদী গোত্রের এ মোকদ্দমা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে নিয়ে আসা হয়। তিনি তাদের মধ্যে সুবিচার কায়েম করেন এবং তৌরাতে হত্যার যে বিধান রয়েছে, 'প্রাণের বদলা প্রাণ'- এ নীতি অনুসারে মোকদ্দমার রায় দান করেন।[১]

১। কেসাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১৩৬-৩৮

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে কয়েকখানি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। হযরত আনাস এবনে নাজার (রাঃ)-এর আত্মীয়া রবী জনৈকা বাঁদীর দাঁত ভেঙে দেয়। লোকেরা ঐ বাঁদীর নিকট মাফ চাইলেন কিন্তু সে মানলো না। অবশেষে বিষয়টি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ করা হলো। তিনি বদলা নেয়ার আদেশ দিলেন। তখন হযরত আনাস (রাঃ) বললেনঃ একজন স্ত্রীলোকের দাঁত ভেঙ্গে দেয়া হবে?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ হে আনাস! তাই হবে। এটি আল্লাহর কিতাবের আদেশ। হযরত আনাস (রাঃ) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তাঁর দাঁত কোন অবস্থাতেই ভাঙা হবে না। অবশেষে তাই হয়েছে। বিপক্ষ দল রাজী হয়েছে কেসাসের দাবী পরিত্যাগ করেছে, বরং তারা মাফ করে দিয়েছে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহর কিছু এমন বন্দা রয়েছে যদি তারা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করে তবে আল্লাহ পাক তাদের শপথ পূর্ণ করে দেন।[১]

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ

অর্থাৎ– যে সদকাহ স্বরূপ তার প্রাপ্য বদলাকে মাফ করে দেয়, তবে যে আহত করেছে তার জন্যে কাফ্ফারা হবে। আর যে আহত হয়েছে তার সওয়াব হবে। যা আল্লাহ পাক তাঁর নিজের দায়িত্বে রেখেছেন। কেউ কেউ এ বাক্যের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন এই, যদি মাফ করে দেয়া হয় তবে তা কাফ্ফারা হবে আহত ব্যক্তির জন্যে। অর্থাৎ জখমের পরিমাণ মোতাবেক তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

হযরত ওবায়দা এবনে সাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে তার নিজের দেহের কোন কষ্টকে মাফ করে দিল আল্লাহ পাক তার সে কষ্টের পরিমাণ গুনাহ মাফ করে দেবেন।

অন্য একখানি হাদীসে আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যার প্রতি জুলুম করা হয়েছে আর সে মাফ করে দিয়েছে। আর যে জুলুম করেছে এবং ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছে- এসব লোকের জন্যে আখেরাতের আযাব থেকে নিরাপত্তা রয়েছে।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট শ্রবণ করেছি, যদি কোন মুসলমানকে কোন দৈহিক

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৬ খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৯৬-৯৭

কষ্ট দেয়া হয় আর সে সবর করে এবং প্রতিশোধ গ্রহণ না করে তবে আল্লাহ পাক তার মর্তবা বৃদ্ধি করেন এবং তার গুনাহ সমূহ মাফ করে দেন।

একজন কোরায়শী একজন আনসারীকে ধাক্কা দিয়ে তাঁর সম্মুখের দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিল। তিনি বিষয়টি হযরত মাবিয়া (রাঃ)-এর নিকট পেশ করেছিলেন। এমন সময় হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস শ্রবণ করে তিনি বললেনঃ আপনি নিজেই শুনেছেন এই হাদীস? তখন হযরত আবু দারদা (রাঃ) বললেনঃ হ্যাঁ, আমি আমার কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করেছি এবং আমার মন তা স্মরণ রেখেছে। তখন ঐ আনসারী বললেনঃ তাহলে আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি অপরাধীকে মাফ করে দিয়েছি। হযরত মাবিয়া (রাঃ) একথা শ্রবণ করে অত্যন্ত খুশী হলেন এবং তাঁকে পুরস্কার দিলেন।[১]

## বর্তমানে তৌরাতের অবস্থা

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আহলে কিতাবদের নিকট বর্তমানে যে তৌরাত রয়েছে তা সেই কিতাব নয়, যা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হযরত মূসা (আঃ)-কে দেয়া হয়েছিল। বরং এই কিতাব হযরত মূসা (আঃ)-এর জমানার বহু দিন পর রচিত হয়েছে। বর্তমানে তৌরাত এমন নয় যে এতে সবই ইহুদী ধর্মযাজকদের রচনা রয়েছে। বরং তাতে মূল তৌরাতেরও কোন কোন অংশ স্থান পেয়েছে তা ইহুদীরা গোপন রাখতো, যেমন রজমের কথা, ব্যভিচারের শাস্তি রজম এবং হত্যাকাণ্ডের শাস্তি কেসাস-এসব বিষয় তৌরাতে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও ইহুদীরা তা গোপন করতো।

আল্লামা রহমাতুল্লাহ সাহেব কিরানবী তাঁর "এজহারুল হক্ব" নামক গ্রন্থে লিখেছেন, মূল তৌরাত এবং মূল ইঞ্জিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বেই হারিয়ে যায়। এরপর তার বদলে দুটি গ্রন্থ তৈরী করা হয়, এর মধ্যে শুদ্ধ অশুদ্ধ উভয় প্রকার বর্ণনা স্থান পেয়েছে।[২]

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

অর্থাৎ– যারা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ বিধান মোতাবেক আদেশ দেয় না তারা জালেম। আল্লাহর বিধানের স্থলে নিজেদের বক্তব্য পেশ করা এবং সে অনুযায়ী হুকুম দেয়া নিঃসন্দেহে জুলুম। ইচ্ছাকৃত আল্লাহর আদেশকে বর্জন করে তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে এবং নিজেদেরকে আযাবে ফেলেছে।

এখানে উল্লেখ্য, কোন ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করে বা ভুল মনে করে অথবা সময়োপযোগী নয় মনে করে যদি অস্বীকার করে এবং শরীয়তের

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৬ খন্ড-৭,পৃষ্ঠা-৯৮
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৪৯

২। তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন কৃত- আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৪০
এজহারুল হক খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৪২

বিধানকে পরিবর্তন করে নিজের তরফ থেকে কোন হুকম প্রস্তাব করে তবে সে কাফের হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে, যদি অন্তরে আল্লাহর হুকুমের প্রতি ঈমান থাকে এবং সত্যতাকে স্বীকার করে এবং শুধু কুপ্রবৃত্তির প্রাধান্যের কারণে অথবা জাগতিক কোন অসুবিধার কারণে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহর হুকুমের বরখেলাফ ফয়সালা করে তবে সে কাফের হবে না, বরং গুনাহগার হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও এ মর্মে একটি বিবরণ রয়েছে। তিনি বলেছেনঃ এমন অবস্থায় আলোচ্য আয়াতের "কাফেরুন" শব্দের মধ্যে যে কাফের রয়েছে তার অর্থ এই নয় যে, তারা মিল্লাতে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে তথা আল্লাহ পাক এবং আল্লাহর রসূলকে অস্বীকারকারী কাফেরদের মত তারা হবে না। কেননা, কুফর, জুলুম ও ফেসকের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কোন কোন কুফর এ'তেকাদ বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হয় আর ক্ষেত্র বিশেষে বিশ্বাস বা এ'তেকাদ ঠিকই থাকে কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে গরমিল হয়। এসব স্তরের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন হুকুম রয়েছে। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এবং ইমাম কুরতবী (রঃ) এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। আরো বেশী বিস্তারিত লিখেছেন হাফেজ এবনে তাইমিয়া (রঃ) তাঁর "কিতাবুল ঈমান" গ্রন্থে।[১]

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ۖ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ وَّ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً
لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ۭ وَمَنْ
لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤٧﴾

## তরজমা

(৪৬) এবং আমি বনী ইসরাঈলের পশ্চাতে ঈসা এবনে মরয়মকে প্রেরণ করলাম তার পূর্বে অবতীর্ণ তৌরাতের সমর্থক রূপে, আর আমি তাকে হেদায়েত এবং

১। তফসীরে কুরতবী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৯০
তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন কৃত- আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৪৮

নূর সম্বলিত ইঞ্জিল দান করি যা তৎপূর্ববর্তী তৌরাতের সত্যতা প্রমাণকারী ও পরহেযগারী লোকদের জন্যে হেদায়েত ও নসিহতের সামগ্রী।

(৪৭) এবং যাদেরকে ইঞ্জিল দান করা হয়েছে যেন যা আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছেন সে অনুসারে আদেশ করে এবং যে কেউ আল্লাহ পাকের অবতীর্ণ বিধান মোতাবেক হুকুম না করে তারাই ফাসেক।

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে ইহুদীদের কুকীর্তি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে আর আলোচ্য আয়াতে নাসারাদের নাফরমানীর (অবাধ্যতা) বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। যেভাবে দূরাত্মা ইহুদীরা তৌরাতের শিক্ষাকে উপেক্ষা করে শুধু তাই নয়, তৌরাতের অনেক বিষয়কে তারা পরিবর্তন করেছে। এমনকি, অনেক বিষয় তারা গোপনও করেছে। যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর আগমনের সুসংবাদের কথা তৌরাতে ছিল কিন্তু ইহুদীরা তা গোপন করেছে। এমনিভাবে ব্যভিচারের শাস্তি রজমের কথাও তারা গোপন করেছে। তাদের এসব কুকর্মের বর্ণনার পর আহলে কিতাবদের আরেকটি অংশ নাসারাদের অন্যায় অনাচারের কথা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

এবং আমি বনী ইসরাঈলের পশ্চাতে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে ঈসা এবনে মরয়মকে প্রেরণ করেছি। এতে একথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) ঠিক সেভাবেই একজন নবী ছিলেন যেভাবে ইতিপূর্বে নবীগণ আগমন করেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর নিকট প্রেরিত ওহীর মধ্যে এবং অন্যান্য নবীগণের ব্যক্তিত্ব ও ওহীর মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য ছিল না। এতদ্বারা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, খৃষ্টানরা মরয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) সম্পর্কে যেসব ভিত্তিহীন, অমূলক তথা মিথ্যা কথা বলে তা তাদের পথভ্রষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আলোচ্য আয়াতের শুরুতেই হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট অবতীর্ণ গ্রন্থ ইঞ্জিলের প্রশংসা করা হয়েছে, যাতে করে যারা ইঞ্জিলকে অমান্য করেছে তাদের পথভ্রষ্টতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। আর একথাও এরশাদ হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট অবতীর্ণ তৌরাতের সত্যতা ঘোষণা করেছেন। এরপর এরশাদ হয়েছেঃ

وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ

অর্থাৎ– আমি ঈসা এবনে মরয়মকে দান করেছি ইঞ্জিল, তাতে রয়েছে হেদায়েত এবং নূর।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, হেদায়েত এ অর্থে যে, ইঞ্জিল কিতাবে আল্লাহ পাকের তৌহিদ বা একত্ববাদের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে শেরক থেকে পবিত্রতা অর্জনের পথ নির্দেশনা, আল্লাহর নবীর কথা, নবুওয়্যতের কথা এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কথা।

আর ইঞ্জিলে নূর রয়েছে একথার তাৎপর্য হচ্ছে এই, তাতে শরীয়তের বিধি-নিষেধ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।[১]

وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ

অর্থাৎ- যেভাবে হযরত ঈসা (আঃ) তৌরাতের সত্যতা ঘোষণা করেছেন ঠিক তেমনি ইঞ্জিলও তৌরাতের সত্যতা ঘোষণাকারী, আর তাতে হেদায়েত এবং নসিহত রয়েছে পরহেযগার লোকদের জন্য।

## ইঞ্জিল গ্রন্থের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন এ আয়াতে ইঞ্জিল গ্রন্থের পাঁচটি গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন-

১. তাতে রয়েছে হেদায়েত অর্থাৎ আকীদা ও বিশ্বাস এবং আমলের ব্যাপারে গোমরাহী সম্পর্কে এতে সতর্কবাণী রয়েছে। তৌহিদ বা আল্লাহ একত্ববাদের প্রতি এই আসমানী গ্রন্থ পথ-নির্দেশ করে যাতে করে মানুষ মূর্তি পূজা, ত্রিত্ববাদের মত শেরক না করে।

২. এতে রয়েছে নূর অর্থাৎ ইঞ্জিলে রয়েছে আলো, যদ্বারা মানুষ সঠিক পথ পায় এবং সকল সন্দেহের অন্ধকার দূরীভূত হয়।

৩. ইঞ্জিল তার পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থের সত্যতা ঘোষণা করে তথা তৌরাতও আসমানী গ্রন্থ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ, একথা বর্ণনা করে।

৪. যারা মোত্তাকী পরহেযগার তাদের জন্যে ইঞ্জিলে রয়েছে হেদায়েত।

৫. রয়েছে তাতে নসিহত।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৯

প্রথম আয়াতে যে হেদায়েতের কথা রয়েছে তা হলো সাধারণ হেদায়েত। আর দ্বিতীয়বার যে হেদায়েতের কথা রয়েছে তা হলো মোত্তাকী পরহেযগারদের জন্যে বিশেষ হেদায়েত।

অর্থাৎ– তৌরাতে যেমন হেদায়েত রয়েছে ঠিক তেমনি ইঞ্জিলেও রয়েছে হেদায়েত। তবে এতে একজন বিশিষ্ট হাদী বা পথ প্রদর্শকের আগমনের সুসংবাদ রয়েছে যাঁর হেদায়েত হবে পরিপূর্ণ, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক অর্থাৎ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণের তাগিদ রয়েছে ইঞ্জিলে। এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক ইঞ্জিলের অনুসারীদের বিশেষ নির্দেশ প্রদান করে এরশাদ করেছেনঃ

وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ

অর্থাৎ– অতএব, যারা ইঞ্জিল গ্রন্থের ধারক তাদের কর্তব্য হলো ইঞ্জিলে বর্ণিত আল্লাহর বিধান মোতাবেক হুকুম করা। কেননা, তাতে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে গেছেনঃ যখন ঐ পূণ্যাত্মা আগমন করবেন তখন তিনি তোমাদেরকে সত্যের পথ শিক্ষা দেবেন। এমনকি, তিনি একথাও বলেছেন পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

يَاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِ اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ

তাঁর পরে যিনি আসবেন তাঁর নাম হবে আহমদ। অতএব, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমনের পর তাঁর বিরোধিতা করার চেয়ে অন্যায় অবিচার আর কিছুই হতে পারেনা, তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

অর্থাৎ– আল্লাহ পাক যে বিধান নাযিল করেছেন সে মোতাবেক যে হুকুম করে না তারাই তো অবাধ্য নাফরমান।

বস্তুতঃ হযরত মূসা (আঃ)-এর জমানায় তৌরাতের অনুসরণ এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর জমানায় ইঞ্জিলের অনুসরণ ছিল হেদায়েত। আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর, পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার পর তৌরাত ইঞ্জিল অনুসরণের কথা বলা হলো গোমরাহী।

কেননা, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর আগমনের পরে শুধু তাঁকেই অনুসরণ করতে হবে। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অবতরণের পর শুধু তাঁকেই মেনে চলতে হবে।

আলোচ্য আয়াত সমূহে একটি কথাকে তিনবার তিনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ "যে আল্লাহর বিধান মোতাবেক ফয়সালা না করে"- প্রথম আয়াতে তাকে কাফের বলা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে তাকে জালেম বলা হয়েছে। আর তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ফাসেক। এর কারণ এই, মানুষের অবস্থা বিভিন, অপরাধের অবস্থাও তাই বিভিন্ন। এজন্যে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে হুকুমও বিভিন্ন হবে। তাই কখনো কুফরের হুকুম দেয়া হয়েছে, আবার কখনো জুলুম এবং ফেস্কের হুকুমও দেয়া হয়েছে।

প্রথম আয়াতে ব্যভিচারের মোকদ্দমার কথা ছিল যখন ইহুদীরা ইচ্ছা করে রজমের বিধানকে অস্বীকার করেছে, তাই তাদেরকে কাফের বলা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে কেসাসের ব্যাপার ছিল এবং শরীয়তের বিধানকে তারা অস্বীকার করেনি, তারা কার্যতঃ ধনী দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য করেছে এবং সুবিচার করেনি। তাই তাদেরকে জালেম বলা হয়েছে। তৃতীয় আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সুসংবাদ মোতাবেক সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনা কর্তব্য ছিল। কিন্তু তারা বুঝে শুনেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনেনি। তাই তাদেরকে ফাসেক বা অবাধ্য নাফরমান বলা হয়েছে।

وَاَنْزَلْنَآ
اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ
وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ
اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّ
مِنْهَاجًا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ
فِىْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۙ﴿۴۸﴾ وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ
وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ
اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ
بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ﴿۴۹﴾ اَفَحُكْمَ
الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿۵۰﴾

## তরজমা

(৪৮) এবং (হে রসূল!) আমি আপনার নিকট সত্য কিতাব (পবিত্র কোরআন) নাযিল করেছি, তা পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সত্যতা প্রমাণকারী এবং ঐ কিতাব সমূহের বিষয়বস্তুর সংরক্ষণকারী। (হে রসূল!) আপনি আল্লাহ পাক যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী এই লোকদের মধ্যে হুকুম করুন এবং যে সত্য আপনার নিকট এসেছে তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। তোমাদের প্রত্যেককে আমি এক নির্দিষ্ট জীবন-ব্যবস্থা ও সুস্পষ্ট পন্থা দান করেছি। যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করতেন তবে অবশ্যই তোমাদের সকলকে এক দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত করে দিতে পারতেন। কিন্তু (তিনি তা করেননি) যেন তোমাদেরকে যে ধর্ম প্রদান করা হয়েছে তা দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করেন। অতএব, উত্তম কাজের দিকে ধাবিত হও। (স্মরণ রেখো) আল্লাহ তায়ালার নিকটই তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এরপর তিনি যে সব বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে সে সব বিষয় তোমাদেরকে অবগত করাবেন।

(৪৯) (হে রসূল!) এবং আপনাকে আদেশ দিচ্ছি যে, আপনি এদের একে অন্যের ব্যাপারে আপনার নিকট প্রেরিত কিতাব অনুসারে বিচার সমাধা করবেন এবং তাদের ভাবাবেগের অননুসরণ করবেন না। তারা আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক আপনার নিকট অবতীর্ণ কিতাবের কোন অংশ দ্বারা যেন আপনাকে বিপদে না ফেলে। এ অবস্থা থেকেও আপনি বেঁচে থাকবেন। অনন্তর যদি তারা (সত্য ধর্ম থেকে) ফিরে যায় তবে জেনে রাখুন, আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে কোন গুনাহর কারণে শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা করছেন এবং এ লোকদের মধ্যে অধিকাংশই ফাসেক।

(৫০) এরা কি বর্বরতার যুগের মীমাংসা চায়? বিশ্বাসী লোকদের নিকট মীমাংসার ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের চেয়ে উত্তম কে হবে?

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

ইতিপূর্বে বিভিন্ন আয়াতে প্রথমে তৌরাত পর ইঞ্জিলের কথা রয়েছে আর এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআন সম্পর্কে বিশেষভাবে এরশাদ করেছেন। এ আয়াত সমূহের বর্ণনা-ধারা বড়ই বিস্ময়কর, চিত্তাকর্ষক। আল্লাহ্ পাক সর্বপ্রথম তৌরাতের উল্লেখ করেছেন। বনী ইসরাঈলের জন্যে তৌরাতকে হেদায়েতের উৎস বলে বর্ণনা করেছেন। যেমন এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّآ أَنزَلْنَا التَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ

অর্থাৎ– আল্লাহ্ পাক তৌরাত নাযিল করেছেন, তাতে ছিল হেদায়েত এবং নূর। কিন্তু দূরাত্মা ইহুদী সম্প্রদায় তা থেকে হেদায়েত লাভ করেনি; বরং বিমুখ হয়েছে। শুধু তাই নয়; বরং তৌরাতে তারা পরিবর্তন করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। এরপর আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ ইঞ্জিলের প্রশংসা করেছেন এবং খৃষ্টানরা ইহুদীদের মত ইঞ্জিলের শিক্ষাকে অমান্য করেছে। আর ইঞ্জিলে যে নূর ছিল তা দ্বারা তাদের অন্তরকে আলোকিত করেনি। আর আলোচ্য আয়াতে রয়েছে-

### পবিত্র কোরআন সম্পর্কে আলোচনা

আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআন সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে এরশাদ করেছেন যে, পবিত্র কোরআন হলো আল্লাহ্ পাকের সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের সত্যতা বর্ণনা করে। এ গ্রন্থে পূর্ববতী যুগের আম্বিয়ায়ে কেরামের সম্পর্কে সত্য তথ্য এবং হেকমত বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কোরআন সমস্ত আসমানী কিতাবের যাবতীয় তত্ত্বের সংরক্ষণকারী, সর্ব প্রকার পরিবর্তন থেকে পবিত্র, সংরক্ষিত, পবিত্র কোরআনের প্রতিটি সিদ্ধান্ত চিরন্তন, চিরস্মরণীয় চির অনুকরণীয়।

মূলতঃ আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন নিজের হেকমত দ্বারা প্রত্যেক নবীকে একটি বিশেষ শরীয়ত দান করেছেন। আর শরীয়তে মোহাম্মদীয়া হলো এ পর্যায়ে সর্বশেষ শরীয়ত। আর পবিত্র কোরআন সকল মত বিরোধের মীমাংসাকারী এবং সমস্ত আসমানী গ্রন্থের মূল তত্ত্বের সংরক্ষণকারী এবং সত্যতা ঘোষণাকারী, যার হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ পাক গ্রহণ করেছেন।

## শানে নুযুল

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একবার ইহুদীদের মধ্যে পরস্পর বিতর্ক হয়। তখন কা'ব এবনে উসাঈদ, আবদুল্লাহ্ এবনে সুরীয়া এবং শাম এবনে কায়েস প্রমুখ যারা ইহুদীদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধমযাজক ছিল, সবাই একত্রিত হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার জন্যে তাঁর খেদমতে আরজী পেশ করে বললোঃ আপনি জানেন যে, ইহুদীদের মধ্যে বড় বড় ধর্মজ্ঞানী রয়েছে এবং আমাদের যে সম্মান ও ইজ্জত রয়েছে এ বিষয়টি আপনার অজানা নয়, আর এ সম্পর্কেও আপনি অবগত যে, সাধারণ ইহুদী সম্প্রদায় আমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আমরা আমাদের মোকদ্দমা আপনার নিকট নিয়ে এসেছি যদি আপনি এ মোকদ্দমায় আমাদের পক্ষে মীমাংসা করে দেন তবে আমরা মুসলমান হয়ে যাব, আর যদি আমরা মুসলমান হই, আপনার দ্বীন গ্রহণ করি তবে সমগ্র ইহুদী জাতি আমাদের অনুসরণ করবে এবং আমাদের ইসলাম গ্রহণের কারণে তারাও সবাই ইসলাম গ্রহণ করবে।

প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের এ প্রতারণাপূর্ণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাদের এ আকাঙ্ক্ষা পূরণে অস্বীকৃতি জানান। তখন এ আয়াত সমূহ নাযিল হয়।[১]

## পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম বর্ণনা করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তৌরাত ও ইঞ্জিলের বিবরণ ছিল। আর এ আয়াত থেকে পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হচ্ছে। এরশাদ হয়েছেঃ (হে রসূল!) আমি আপনার নিকট সত্য কিতাব নাযিল করেছি, যা পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সত্যতা ঘোষণা করে ঐ কিতাব সমূহের বিষয়বস্তুর সংরক্ষণকারী। অর্থাৎ ঐ কিতাব সমূহে যেসব ভুল কথা সংযোজন করা হয়েছে তা চিহ্নিতকারী। অতএব, পূর্ববর্তী কিতাব

১। তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৪৫
তফসীরে কুরতবী খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৩

সমূহে যেসব কথা রয়েছে তা যদি পবিত্র কোরআনের বর্ণনা মোতাবেক হয় তবে তা হবে হক্ব। আর যদি পবিত্র কোরআনের বর্ণনার বিরোধী হয় তবে তা হবে বাতিল।

আলোচ্য আয়াতের "আল-কিতাব" অর্থ পবিত্র কোরআন অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনার নিকট আমি পবিত্র কোরআন নাযিল করেছি যা সত্য যা পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সত্যতা ঘোষণাকারী।

وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

এবং যা পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের বিষয়বস্তুর সংরক্ষণকারী।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রঃ) এ বাক্যটির অর্থ লিখেছেনঃ

تحریف ازغیر تحریف جرامی سازد- (فাতহুর রহমান)

অর্থাৎ যেহেতু আহলে কিতাবরা তাদের নিকট অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থ সমূহে অনেক পরিবর্তন করেছে তাই পবিত্র কোরআন এর মধ্যে পার্থক্যকারী, কোন্‌টি মানুষের কথা তা পবিত্র কোরআন চিহ্নিত করে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বাক্যটির অর্থ বলেছেন, সাক্ষী অর্থাৎ পবিত্র কোরআন সাক্ষ্য দেয় যে, তৌরাত ইঞ্জিলের কোন্ কথাটি আল্লাহ পাকের, আর কোন্ কথাটি দূরাত্মা ইহুদী নাসারার নিজেরা লিখে দিয়েছে। অনুরূপ মত পোষণ করেন কাতাদাহ (রঃ), মুজাহেদ (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ)।

একরামা (রঃ) এর অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন চিহ্নিতকারী অর্থাৎ পবিত্র কোরআন হক্ব ও বাতিল চিহ্নিত করে দেয়। সাঈদ এবনে যোবায়ের এবং আবু ওবায়দা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো পবিত্র কোরআন অমানতদার। হাসান বসরী (রঃ)-ও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। আর হযরত সাঈদ এবনে মোসাইয়্যেব (রঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ সংরক্ষণকারী বা নেগেহবান। এ অর্থ সমূহ প্রায় কাছাকাছি। সকলের উদ্দেশ্য হলো যে কিতাব সম্পর্কে পবিত্র কোরআন সাক্ষ্য দেয় যে, এটি আল্লাহর কিতাব তা অবশ্যই আল্লাহর কিতাব। "মুহাইমেন" শব্দের আভিধাণিক অর্থ হলোঃ বিশ্বস্ত, প্রবল, বিচারক, শাসক, রক্ষা কর্তা প্রভৃতি। তৌরাত ইঞ্জিলে আল্লাহ পাকের যে আমানত ছিল তা পবিত্র কোরআন অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করেছে। পরিস্থিতি হিসাবে যা অপ্রয়োজনীয় ছিল পবিত্র কোরআন তা বাদ দিয়েছে, যা ছিল অপূর্ণ পবিত্র কোরআন তাকে দিয়েছে পূর্ণতা। এভাবে পবিত্র কোরআনে সকল আসমানী গ্রন্থের সারাংশ সন্নিবেশিত হয়েছে।

এবনে জোরায়েহ (রঃ) বলেছেনঃ পবিত্র কোরআন হলো পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহের আমানতদার। যদি আহলে কিতাবরা তাদের গ্রন্থ থেকে কোন কথা বলে আর তা পবিত্র কোরআনেও পাওয়া যায় তবে তাকে সত্য মনে কর, অন্যথায় মিথ্যা মনে কর। যদি পবিত্র কোরআন ঐ বক্তব্যের ব্যাপারে নীরবতা পালন করে তথা ঐ সম্পর্কে কোরআনে কোন কথা না থাকে তবে তোমরাও নীরবতা পালন কর, তথা তাকে সত্যও বলো না, মিথ্যাও বলো না। কেননা, আহলে কিতাবদের কথায় সত্য ও মিথ্যা উভয়েরই সম্ভাবনা থাকে।[১]

এখানে একথাও উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে পবিত্র কোরআনের দু'টি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

১. পবিত্র কোরআন সম্পূর্ণ সত্য গ্রন্থ।

২. পূর্ববতী আসমানী কিতাব সমূহের সত্যতা ঘোষণাকারী।

আর আলোচ্য বাক্যে পবিত্র কোরআনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হলো এই, পূর্বের কিতাব সমূহের সমস্ত বিষয় পবিত্র কোরআনে সংকলিত এবং সংরক্ষিত রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ পবিত্র কোরআন পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ সমূহের ব্যাপারে পরিদর্শকের ভূমিকাও পালন করবে। যে সব বিষয় ইহুদী নাসারারা তাদের গ্রন্থে পরিবর্তন করেছে সেগুলো সম্পর্কেও পবিত্র কোরআন মানদণ্ড হিসেবে ভূমিকা পালন করবে।

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ

অতএব, (হে রসূল!) আল্লাহ পাক আপনার নিকট যা নাযিল করেছেন তথা পবিত্র কোরআন সে অনুযায়ী আপনি মানুষের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন এবং তাদের বিষয়ের ফয়সালা করুন। আপনার নিকট যে সত্য এসেছে তা বাদ দিয়ে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করবেন না, যেভাবে ইতিপূর্বে আপনি আহলে কিতাবদের কামনা-বাসনাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন ঠিক তেমনি ভবিষ্যতেও পবিত্র কোরআনের হেদায়েত মোতাবেক তাদের মধ্যে মীমাংসা করুন।

(হে রসূল!) আপনাকে সে সত্য দ্বীন দেয়া হয়েছে আপনি তার উপর সুদৃঢ় থাকুন। এ দ্বীন কোন দিন বাতিল হবে না।

## ইহুদীদের ষড়যন্ত্র

ইহুদীরা ইসলামের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করেছিল এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে অত্যন্ত লোভনীয় প্রস্তাব রেখেছিলো যে, "যদি

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫০৯
তফসীরে মাজেদী খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫৬

আপনি আমাদের পক্ষে রায় দেন তবে আমরা ইসলাম গ্রহণ করবো। ফলে সমগ্র ইহুদী জাতি মুসলমান হয়ে যাবে"। সামান্য একটু অন্যায় করলেও তার পরিণামে হাজার হাজার লোক ইসলাম কবুল করবে, এমন লোভনীয় প্রস্তাব আর কি হতে পারে!

কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সত্যের উপর ছিলেন সুদৃঢ়। তাই তিনি তাদের চক্রান্ত জাল ব্যর্থ করে দেন এবং তাদের প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। এজন্যে আল্লাহ্ পাক এ পর্যায়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেনঃ

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

খবরদার, হে আমার প্রিয়নবী! আপনি তাদের চক্রান্তে জড়িয়ে পড়বেন না। তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে আপনার মর্যাদা বিরোধী কাজ করবেন না।

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا

অর্থাৎ প্রত্যেকটি জাতির, প্রত্যেকটি উম্মতের অবস্থা এবং পরিস্থিতি মোতাবেক আল্লাহ্ পাক তাদের কল্যাণার্থে জীবন বিধান দান করেছেন।

## শেরআতের ব্যাখ্যা

"শেরআত" শব্দটির অর্থ শরীয়ত, আর মেনহাজ শব্দটির অর্থ তরিকত বা কর্মপন্থা। শরীয়ত শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো পানির ঘাট তথা পানি পান করার নির্দিষ্ট স্থান। পানির অপর নাম প্রাণ, আর শরীয়তের পরিভাষায় শরীয়ত হলো আল্লাহর বিধান সমূহের সমষ্টি। যেভাবে পানি পান করার মাধ্যমে প্রাণ রক্ষা পায় ঠিক তেমনি শরীয়ত মোতাবেক জীবন পরিচালনার মাধ্যমে চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে চির নাজাত লাভ করা যায়। আর মেনহাজ হলো তরীকত বা সেই কর্মসূচী যার দ্বারা আত্মশুদ্ধি লাভ করা যায়। আত্মশুদ্ধি লাভের মাধ্যমেই আত্মোন্নতি লাভ হয়। আর আত্মোন্নতি বা আধ্যাত্মিক অগ্রগতি লাভের মাধ্যেমেই মানুষ আল্লাহর মা'রেফাত হাসিল করে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হয়।

বস্তুতঃ চির নাজাত লাভের মূল ভিত্তি এবং ধর্মের মৌলিক নীতিতে সকল পয়গম্বরগণ একমত, সকলেই তৌহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদের কথা বলেছেন, এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানিয়েছেন। তবে ছোট-খাট ব্যাপারে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন নিয়ম-নীতি ও কর্মপদ্ধতি প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

الانبياء بنوا العلات

অর্থাৎ– পয়গম্বগণ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই, পিতা এক, মাতা ভিন্ন ভিন্ন। বোখারী শরীফে সংকলিত এই হাদীসের তাৎপর্য হলো, পয়গম্বরগণের মূল নীতি এক হওয়া সত্ত্বেও অমৌলিক বিষয়ে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য থাকা অস্বাভাবিক নয়। একই মূল একই বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখা-প্রশাখা থাকা যেমন অস্বাভাবিক নয়। যেভাবে বৈমাত্রেয় ভাইদের পিতা এক থাকে ঠিক তেমনি আম্বিয়ায়ে কেরামের দ্বীনও এক, আর যেভাবে বৈমাত্রেয় ভাইদের মাতা বিভিন্ন হয় ঠিক তেমনি আম্বিয়ায়ে কেরামের শরীয়তও ভিন্ন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর শরীয়তে অনেক কিছুই সহজ ছিল। কিন্তু হযরত মূসা (আঃ)-এর শরীয়তে অনেক কঠিন বিধান ছিল। আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, প্রত্যেক জাতির অবস্থা সম্পর্কে তিনি সর্বজ্ঞানী, কার জন্যে কোন্ বিধান অধিকতর উপযোগী তা তিনিই ভাল জানেন আর তাই প্রত্যেক জাতির অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদেরকে জীবন বিধান দান করেছেন।

وَلَوْشَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً

অর্থাৎ– আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে একই জাতিতে, একই উম্মতে পরিণত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা এজন্যে করেননি যে, তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে চান তোমরা তাঁর কতখানি ভক্ত অনুগত, বাধ্য এবং অনুরক্ত? কে আল্লাহর নিত্য নতুন বিধান জানা-মাত্রই আনুগত্য প্রকাশ করে। আর কে অবাধ্য হয় তা যাচাই করে দেখাই হলো বিভিন্ন শরীয়ত প্রদানের মূল কারণ।

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ

অতএব, কল্যাণকর কাজের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চল। সর্বশেষ নবীর আগমনের মাধ্যমে যে ধ্রুব সত্য তোমরা লাভ করেছ তা অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ কর। অকারণে তর্কে লিপ্ত হয়ে সময় নষ্ট করোনা। সত্যকে গ্রহণ ও বরণ করে সত্য-সাধনায় অগ্রসর হও। জীবন-সাধনাকে সার্থক কর। মনে রেখো–

اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ

আল্লাহ পাকের নিকটই তোমাদের প্রত্যেককে ফিরে আসতে হবে এবং তখন তিনি তোমাদের মতবিরোধের বিষয় অবগত করাবেন। তোমাদের মতবিরোধ ও মতভেদ তখন কোন উপকারে আসবেনা। যা উপকারী হবে তা হলো এক আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আনুগত্য এবং তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এবং তাঁর অনুসরণ।

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ

অতএব, (হে রসূল!) আপনি তাদের মতভেদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে আল্লাহ পাকের অবতীর্ণ গ্রন্থ মোতাবেক তাদের মধ্যে আদেশ জারী করুন। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুসারী হবেন না। তাদেরকে সতর্কভাবে পরিহার করে চলুন। যাতে করে আল্লাহ পাকের অবতীর্ণ হুকুম থেকে তারা আপনাকে কোন অবস্থাতেই বিচলিত করতে না পারে এবং ইহুদী নাসারাদের চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। তাদের পারস্পরিক বিতর্কের মীমাংসা আপনি ঐ শরীয়ত মোতাবেক করুন যা আল্লাহ পাক আপনার প্রতি নাযিল করেছেন।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ

যদি এরপরও তারা আপনার ফয়সালা মেনে নিতে বিমুখ হয় তবে (হে রসূল!) আপনি জেনে রাখুন যে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলো যে, দুনিয়াতেই তাদের কোন কোন পাপ কার্যের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে বিপদগ্রস্ত করবেন, যদিও তাদের পাপাচারের প্রকৃত শাস্তি তারা কেয়ামতের দিনই ভোগ করবে। কিন্তু আপনার ফয়সালা অমান্য করার ভয়াবহ পরিণাম তাদেরকে দুনিয়াতেই ভোগ করানো হবে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, কোন কোন পাপাচারের শাস্তির কথা এজন্যে এরশাদ হয়েছে যে, সকল পাপাচারের শাস্তি তো আখেরাতে অবশ্যই হবে। দুনিয়াতে শুধু কয়েকটি গুনাহরই শাস্তি হবে।

وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ

(আর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হেদায়েতের যত ব্যবস্থাই করা হোক না কেন) বহু সংখ্যক লোক তবুও আল্লাহর নাফরমান এবং অবাধ্য হয়ে থাকে। আর অতি সামান্য সংখ্যক লোকই আল্লাহ পাকের শোকর গুজারী করে।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো ইহুদীদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই আল্লাহর অবাধ্য এবং নাফরমান রয়েছে।

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ

অর্থাৎ– তবে কি বর্বরতার যুগের ফয়সালাই চায়? বর্বরতার যুগে জুলুম-অত্যাচার, অন্যায় অনাচার ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। দরিদ্রের উপর ধনীর প্রাধান্য বিস্তার ছিল সে যুগের বৈশিষ্ট্য। অবিচারই ছিল সে যুগের স্বীকৃত পদ্ধতি। তবে কি তারা সেই অবিচারই চায়? অথচ ইসলামী শরীয়ত সুবিচার কায়েম করার নির্দেশ দেয়, পরোপকারের আদেশ দেয়।

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে বনী নজির এবং বনী কোরায়জা সম্পর্কে। তারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এই আবেদন করেছিল যেন তাদের মধ্যে বর্বরতার যুগের মত মীমাংসা করা হয়। তখন হত্যাকাণ্ডের বিচারের ব্যাপারে ধনী দরিদ্রের ক্ষেত্রে পার্থক্য করা হতো। বিভিন্ন গোত্রের অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো। এমন পন্থা যেন অবলম্বন না করা হয় তার প্রতি আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে।

وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

আল্লাহ পাকই নিখিল বিশ্বের একমাত্র মালিক, অধিকর্তা। যারা একথা পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে তারা একথা ভালভাবেই জানে যে, আল্লাহ পাকের নির্দেশ ব্যতীত আর কারো নির্দেশ উত্তম হতে পারে না। আল্লাহর নির্দেশের সম্মুখে কারো নির্দেশ যে শুধু চলতে পারে না তা নয়, বরং তা কোন অবস্থাতেই শ্রবণযোগ্য হয় না, আল্লাহ ব্যতীত আর সব কিছুই তাঁর সৃষ্টি। সৃষ্টির জ্ঞান সামান্য, ক্ষুদ্র, অপর্যাপ্ত এবং ত্রুটিপূর্ণ। পক্ষান্তরে, আল্লাহ পাক সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। অতএব, তাঁর হুকুমের সম্মুখে কারো হুকুমই গ্রহণযোগ্য নয়। এরপরও কি দূরাত্মা কাফেররা নিজেদের প্রবৃত্তির অভিপ্রায় এবং অজ্ঞানতা-মূর্খতার ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকতে চায়?

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ ۘ
بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ۭ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ
قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ
تُصِيْبَنَا دَاۗىِٕرَةٌ ۭ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ
فَيُصْبِحُوْا عَلٰي مَآ اَسَرُّوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ۝ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَاۗءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ
لَمَعَكُمْ ۭ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ۝

তরজমা

(৫১) হে মোমেনগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাদেরকে বন্ধু বানাবে

সে নিশ্চয় তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অত্যাচারী সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।

(৫২) যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে (অর্থাৎ মুনাফেক) তাদেরকে দেখবে যে, তারা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কাফেরদের দলে প্রবেশ করছে। তারা বলে আমরা ভয় করছি কালের চক্রে আমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়বে।

অচিরেই আল্লাহ পাক বিজয় দান করবেন, অথবা তাঁর তরফ থেকে বিশেষ কোন হুকুম আসবে, এরপর তারা যা তাদের মনের নিভৃত কোণে গোপন রেখেছে, তার জন্যে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে।

(৫৩) আর মোমেনগণ বলবে যে, এরাই নাকি আল্লাহ তায়ালার নাম নিয়ে বড় বড় শপথ করেছিল যে, আমরা নিশ্চয় তোমাদের সাথে আছি, তাদের সমস্ত আমল ব্যর্থ হয়েছে। পরিণামে তারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে ইহুদী ও খৃষ্টানদের চারিত্রিক দুর্বলতা, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্রের বিবরণ রয়েছে। আর এ আয়াতে মুসলমানদের প্রতি এ নির্দেশ রয়েছে যে, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করোনা, যারা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। কেননা, বন্ধুত্ব, প্রীতি-ভালবাসা মানব অন্তরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, প্রিয় ব্যক্তির প্রতিটি কাজই প্রিয় মনে হয়। কুষ্ঠ রোগের মত কুফর এবং শেরকও অন্তরের একটি রোগ, যারা এমন রোগীদের সাথে মেলামেশা করে তাদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির মত প্রতিক্রিয়া করে অর্থাৎ কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে মেলামেশা করলে যেমন এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, কাফের ও মুশরেকদের সঙ্গে প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তুললে তেমনি তাদের অন্তরের রোগ বন্ধুদের মধ্যে সংক্রামিত হবার আশঙ্কা থাকে।

তাই সুস্পষ্ট ভাষায় পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে যে, হে মুসলমানগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করোনা, কেননা এর পরিণামে ইসলামের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এজন্যে এর পরবর্তী আয়াতে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার পরিণাম সম্পর্কে ঘোষণা রয়েছে।

যেভাবে কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার পর রাষ্ট্রীয় আইন কানুনের বিরুদ্ধে কথা বলা রাষ্ট্রদ্রোহীতা বলে বিবেচিত হয়, ঠিক তেমনি ইসলামে প্রবেশ করার পর ইসলামী শরীয়তের সমালোচনা করা ইসলাম পরিত্যাগেরই নামান্তর। কাফেরদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বজায় রাখা ইসলামকে পরিত্যাগ করার নিদর্শন ইসলাম

বিরোধী মনোভাব পোষণ করা এবং প্রকাশ্যে ইসলামের কথা বলা হল মুনাফেকী, যারা রাষ্ট্রদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখে, রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে তাদের আনুগত্য সন্দেহাতীত থাকে না। ঠিক তেমনি যারা কাফেরদের সঙ্গে বন্ধত্ব রাখে, ইসলাম সম্পর্কে তাদের আন্তরিকভাবে অভাব আছে মনে করার যথেষ্ট কারণ থাকে।

## শানে নুযুল

এ আয়াত সমূহ মুনাফেকদের নেতা আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুলের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। ইহুদীদের সঙ্গে ছিল তার বন্ধুত্ব। তার ধারণা ছিল, যদি কোনদিন মুসলমানগণ পরাজিত হন তবে ইহুদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আমার জন্যে উপকারী হবে। সে বলত আমি একজন বুদ্ধিমান এবং সতর্ক ব্যক্তি, যে কোন সময় বিপদাপদ হতে পারে। এজন্যে ইহুদীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আমি বিনষ্ট করতে পারি না। আব্দুল্লাহ এবনে উবাই মুনাফেক ছিল বলেই সে এমন কথা বলেছে অথচ হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ)-এর সঙ্গেও ইহুদীদের বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

এ ঘটনাটিকে ইমাম রাজী (রঃ) তাঁর তফসীরে কবীরে এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ বর্ণিত আছে যে, হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বললেনঃ আমি ইহুদীদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করেছি।

কিন্তু আব্দুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুল বলল, আমি ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক বিনষ্ট করব না, কারণ যে কোন সময় বিপদাপদ হতে পারে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[২]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে বর্ণনা করেছেনঃ

এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেনঃ আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুল মুসলমান হয়েছিল কিন্তু সে চিন্তা করল যে, আমার এবং ইহুদী গোত্র বনী কোরায়জা এবং বনি নজীরের মধ্যে চুক্তি আছে, হতে পারে যে মুসলমানগণ পরাজিত হয়ে যাবে এবং ইহুদীদের সাথে আমার বন্ধুত্ব বিশেষ উপকারী হবে। একথা চিন্তা করে সে ইসলাম পরিত্যাগ করল এবং কাফের হয়ে গেল।

---

১। তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৫০
২। তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৬

পক্ষান্তরে, হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) বলেছেনঃ ইহুদী গোত্র বনু কোরায়জা এবং বনু নজীরের সঙ্গে যে চুক্তি ছিল তা আমি বাতিল করছি। তাদের সাথে আমার যে সম্পর্ক ছিল তা আমি পরিত্যাগ করছি। এখন থেকে আমার সকল সহযোগিতা আল্লাহ্ পাক, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানদের সঙ্গে থাকবে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে লিখেছেনঃ এ আয়াতের শানে নুযুল হল, ওহোদের যুদ্ধের পর এক ব্যক্তি বলেছিলো, আমি অমুক ইহুদীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করি, যাতে করে বিপদের সময় তা আমার জন্যে উপকারী হয়। আর অন্য এক ব্যক্তি বলেছিলো, আমি অমুক খৃষ্টানের নিকট যাব, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাকে সাহায্য করব। তখন এ আয়াত নাযিল হয় এবং ইহুদী ও খৃষ্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

একরামা (রঃ) বর্ণনা করেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে লোবাবা এবনে আবদুল মুনজের সম্পর্কে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাকে বনু কোরায়জা গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন তখন তাঁকে তারা জিজ্ঞাসা করেছিলো, হুজুর আমাদের সঙ্গে কি ব্যবহার করবেন? তখন তিনি তাঁর গলদেশের প্রতি ইঙ্গিত করলেন, অর্থাৎ তিনি তোমাদের সবাইকে হত্যা করবেন। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে আব্দুল্লাহ এবনে উবাই সলুলের পূর্বোক্ত ঘটনারও উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[২]

## ইহুদী ও খৃষ্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করোনা

এ আয়াতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন বিশেষভাবে মোমেনদেরকে সম্বোধন করে ইহুদী খৃষ্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

অর্থাৎ– হে মোমেনগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে প্রকৃত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা। আলোচ্য আয়াতে 'আওলিয়া' শব্দটি ওলীর বহুবচন। ওলী শব্দের আভিধানিক অর্থ হল অন্তরঙ্গ বন্ধু, আত্মীয়, সাহায্যকারী। অতএব, আয়াতের অর্থ হল হে মোমেনগণ! তোমরা ইহুদী খৃষ্টান তথা কোন কাফেরের সঙ্গেই আন্তরিক বন্ধুত্ব করোনা তথা তাদের প্রতি এতটা আস্থা স্থাপন করোনা।

بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫১২
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৬ খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১০৩

তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের বিরোধিতা এবং তোমাদের ক্ষতিসাধনে তারা একমত। কুফর ও শেরকের ক্ষেত্রে তারা একে অন্যের সাথী। তাদের নিজেদের মধ্যে শত কলহ-দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা এক, অভিন্ন। অতএব, হে মোমেনগণ! তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা। এ সতর্কবাণী উচ্চারিত হবার পরও যদি কেউ তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, তবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ আবদুল্লাহ এবনে উবাই যেহেতু ইহুদীদের বন্ধু বলে দাবী করেছে, সে নিঃসন্দেহে কাফের ও মুনাফেক।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, কাফের মুশরেক, ইহুদী খৃষ্টানদের সঙ্গে আন্তরিত বন্ধুত্বের সম্পর্ক চির নিষিদ্ধ, শান্তি চুক্তি বা সন্ধি স্থাপন করা নিষিদ্ধ নয়। যদি কোন সময় প্রয়োজন হয় তবে যে কোন কাফেরের সঙ্গে শরীয়ত মোতাবেক সন্ধি করার অনুমতি রয়েছে। পবিত্র কোরআনের সূরা আনফালে এ পর্যায়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ সুবিচার কায়েম করার ক্ষেত্রে তথা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় মুসলিম অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য করার অনুমতি নেই।

তৃতীয়তঃ সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার, বিশ্ব মানবের সঠিক কল্যাণ সাধন ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। এতদ্ব্যতীত, কাফের মুশকেরদের সঙ্গে কৃত শান্তি চুক্তি রক্ষার করার তাগিদ দিয়েছে ইসলাম। এসব বিষয়ে বাড়াবাড়ি বা সীমা লঙ্ঘনের অনুমতি নেই। মানবিক দৃষ্টিতে যা একান্ত করণীয় তা পালনের নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। আলোচ্য আয়াতে যে বিষয়টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে তা হল কাফেরদের সঙ্গে আন্তরিক বন্ধুত্ব। ইসলাম এর অনুমতি দেয় না। কেননা, ঈমান এবং কুফর দু'টি সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী বিষয়। একই পাত্রে তাদের অবস্থান অচিন্তনীয়। যারা এতদসত্ত্বেও কাফেরদের সঙ্গে আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে, তারা ঈমানদার নয়, ঈমানের দাবীদার মাত্র। আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে এ ঘোষণা করেছেন–

وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ

তোমাদের মধ্যে হতে যে তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

المرء مع من احبَّ

(যে যাকে ভালবাসে, সে তারই সাথে) অর্থাৎ এ পৃথিবীতে যার সাথে যার মেলামেশা, ওঠা-বসা এবং ভালবাসা হবে, কেয়ামতের দিন তার সাথেই সে থাকবে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

অর্থাৎ– যারা ইসলামের দুশমনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে নিজেদের প্রতি জুলুম করে আল্লাহ পাক এমন জালেমদেরকে হেদায়েত করেন না।

## একটি ঘটনা

খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর যুগে বসরার শাসনকর্তা ছিলেন হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, আপনি যা কিছু কেন্দ্র থেকে নিয়েছেন, আর যা কিছু জমা দিয়েছেন তার হিসাব পেশ করুন। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-এর হিসাব রক্ষক ছিল একজন খৃষ্টান, তাকে নির্দেশ দেয়া হলে সে সঙ্গে সঙ্গে চামড়ায় লিপিবদ্ধ হিসাব পেশ করল। হযরত ওমর (রাঃ) তা দেখে অত্যন্ত আশ্চর্যন্বিত হলেন এবং বললেন, এ লোকটি বেশ স্মরণ শক্তি রাখে, সিরিয়া থেকে আমার নিকট একটি চিঠি এসেছে। তুমি মসজিদে এসে চিঠিঠি পাঠ করে শোনাও। তখন হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বললেন, সে মসজিদে গমন করতে পারবে না, হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি অপবিত্র অবস্থায় রয়েছে?

হযরত মূসা আশআরী (রাঃ) বললেন, না তা নয়; বরং সে হল একজন খৃষ্টান। একথা শ্রবণ করেই হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-এর রানে একটি আঘাত দিয়ে বললেন, তুমি তাকে বহিঃষ্কার কর। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন।[১] (এবনে আবি হাতিম, বায়হাকী)

ইমাম রাজী (রঃ) তফসীরে কবীরে এ ঘটনাটির আরো একটু বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) যখন বললেন, আমার হিসাব রক্ষক খৃষ্টান, তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, তুমি কি পবিত্র কোরআনের এ আয়াত শ্রবণ করনি? তখন তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বললেন, তার সাথে তার ধর্ম, আমার সাথে সম্পর্ক তার লেখার। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, মনে কর তার মৃত্যু হয়েছে। তখন তুমি কি করবে? তখন অবশ্যই তোমাকে অন্য লোক নিয়োগ করতে হবে, তাহলে তা আজই কর।[২]

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ

যাদের অন্তর ব্যধিগ্রস্ত, আল্লাহর নাফরমানী এবং মুনাফেকীতে পরিপূর্ণ, তাদেরকে তুমি দেখবে তারা দ্রুত গতিতে কুফরের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫১৩
২। তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৬

আলোচ্য বাক্যটি মুনাফেক নেতা আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুল এবং তার মুনাফেক সঙ্গীদের ব্যাপারে উচ্চারিত হয়েছে। সে বলত, আমি ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করি, যদি ইসলামের পরাজয় হয় তবে তাদের বন্ধুত্ব আমার জন্যে বিশেষভাবে উপকারী হবে, অথবা হঠাৎ অন্য কোন বিপদাপদ আসলে আমি তাদের সাহায্য লাভ করব। এমনকি, দেশে যদি দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, এমন অবস্থায় তাদের সাহায্য আমাকে নিতে হবে। তারা মহাজন, আমরা খাতক। তাই তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা একান্ত জরুরী মনে করি। কেননা, বিপদ আসার পূর্বে সতর্কতা অবলম্বন করা বুদ্ধিমানের কাজ।

বস্তুতঃ যারা মুনাফেক, যারা সুবিধাবাদী তারা সর্বকালেই এমন দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে। কেননা, আল্লাহ পাকের প্রতি এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি তাদের ঈমান থাকে না। মুনাফেকদের এ আস্ফালনের জবাবেই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ

অর্থাৎ– অদূর ভবিষ্যতে মুনাফেকদেরকে তাদের সুবিধাবাদী নীতির জন্যে আক্ষেপ করতে হবে। সেদিন দূরে নয় যেদিন আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিজয় দান করবেন।

এ বিজয়ের তাৎপর্য সম্পর্কে তফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। ইমাম কাতাদা (রঃ) এবং মোকাতেল (রঃ)-এর মতে, এতদ্বারা আল্লাহ পাকের বিশেষ সাহায্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কালবী এবং সুদ্দী (রঃ)-এর মতে, এ আয়াতে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে তথা অদূর ভবিষ্যতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সগৌরবে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় প্রবেশ করবেন।

আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিজয়-মাল্যে ভূষিত করবেন।

যাহ্যাক (রঃ) এর মতে আলোচ্য আয়াতে খায়বর, ফোদক এবং অন্যান্য ইহুদী বস্তির বিজয়ের সুসংবাদ রয়েছে।[১]

اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ

অর্থাৎ অথবা অন্য কোন ভাবে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মহিমান্বিত করবেন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫১৪

তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ এর তাৎপর্য হল মুনাফেকদের গোপন রহস্য ফাঁস করে দেয়া অথবা তাদেরকে হত্যা ও অপমানিত করা। ইহুদী গোত্র বনী নজীরকে মদীনা শরীফ থেকে বহিষ্কার করা এবং সারা আরব থেকে ইহুদীদের মূলোৎপাটন।

فَيُصْبِحُوا عَلٰى مَآ اَسَرُّوا فِىٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ

তখন এ মুনাফেকরা কাফেরদের বন্ধুত্বের কারণে অত্যন্ত লজ্জিত হবে।

## পবিত্র কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হয়

ইতিহাস সাক্ষী! এ আয়াত নাযিল হবার কিছু দিন পরই আয়াতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হয়। পঞ্চম হিজরীতে অনুষ্ঠিত খন্দকের যুদ্ধের সময় যেহেতু ইহুদীরা হানাদার কাফেরদের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিল এবং যেভাবে মুসলমানদের সঙ্গে কৃত শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করেছিল, তাই এর শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল ইহুদী গোত্র বনু কোরায়জা এবং বনু নজীরকে। মদীনা মোনাওয়্যারা থেকে তাদের মূলোৎপাটন করা হয়েছিলো। সপ্তম হিজরীতে খায়বর বিজয় হয়। এভাবে ইহুদীরা অপমানিত এবং নিহত হয়।

অষ্টম হিজরীতে আল্লাহ পাক মক্কা বিজয় দান করেন। ফলে সারা আরবে ইসলাম প্রভাব বিস্তার করে। এদিকে কাফেরদের চরম পরাজয়ের কারণে মুনাফেকদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ে। যে ইহুদীদের বন্ধুত্বের কারণে তারা রঙ্গীন স্বপ্ন দেখতো সেই ইহুদীদের অনেকে নিহত এবং বহুলাংশে নির্বাসিত হয়। এভাবে তাদের সকল আশা-ভরসার সলিল সমাধি ঘটে। তাদের সত্যিকার স্বরূপ প্রকাশিত হবার কারণে তারা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়। তাই আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ

তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। দ্বীন দুনিয়া উভয় জাহানে তারা অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়েছে। প্রকাশ্যে তারা ইসলামের যে দাবী করত তা তাদের জন্যে উপকারী হয়নি, আর কাফেরদের সঙ্গে গোপন আঁতাত রাখার মাধ্যমে যে আশা করত, তা-ও ব্যর্থ হয়েছে। ফলে তাদের একুল-ওকুল দু' কুলই বিনষ্ট হয়েছে আর এজন্যে পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا

অর্থাৎ– যখন মুনাফেকদের গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে, তখন মোমেনগণ পরস্পর আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলবে এরাই কি সে সব লোক, যারা আমাদের নিকট

আল্লাহর নামে শপথ করে বলত, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সঙ্গে রয়েছি। অথচ তাদের দাবী ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। আর এ মিথ্যা আজ সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত। পরিণামে মুনাফেকরা হবে অপমানিত। যেহেতু ইহুদীরা পূর্বেই হয়েছে নিহত অথবা নির্বাসিত আর ইসলামের বিজয় হয়েছে অপ্রতিহত, তাই মুনাফেকরা হয় হতাশাগ্রস্ত, অপদস্থ এবং বিপদগ্রস্ত। আর এভাবে পবিত্র কোরআনের ঘোষণা হয় বাস্তব ঘটনায় পরিণত।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ
يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ
يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ذٰلِكَ
فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٤﴾

## তরজমা

(৫৪) হে মোমেনগণ! তোমাদের মধ্যে থেকে যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যায়, (যাক) আল্লাহ পাক অচিরেই এমন জাতি উপস্থাপন করবেন, যাদেরকে আল্লাহ পাক ভালবাসেন এবং তারাও আল্লাহ পাককে ভালবাসবে। মুসলমানদের ক্ষেত্রে তারা বিনম্র-হৃদয় এবং কাফেরদের ব্যাপারে তারা হবে অত্যন্ত কঠিন এবং কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে। কোন নিন্দাকারীর নিন্দাকে তারা ভয় করবে না। এটি আল্লাহ পাকের মেহেরবানী। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই তা দান করেন। আর আল্লাহ পাক অত্যন্ত উদার এবং মহাজ্ঞানী।

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মুসলমানদেরকে এ নির্দেশ প্রদান করা হয় যে, তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করোনা। আর এ আয়াতে যারা ধর্মত্যাগ করবে তাদের পরিণাম সম্পর্ক ঘোষণা করা হয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে ইসলাম ধর্ম ত্যাগের এক ফেৎনা উঠবে এবং তাতে ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না। ইসলামের জয়যাত্রা চির অব্যাহত থাকতে। এ ঘোষণা রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

বস্তুতঃ দ্বীন ইসলাম চিরন্তন, চির সংরক্ষিত। ইসলামই আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান। অতএব, এ জীবন বিধানের ক্ষতি সাধনের শক্তি কারোই নাই, কেননা এর হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীন। কোন হতভাগা যদি ইসলাম গ্রহণের পর তা পরিত্যাগ করে এবং কাফেরদের দল ভারী করে তাতেও ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না। যে ইসলাম পরিত্যাগ করবে সে-ই ধ্বংস হবে। তার স্থলে আল্লাহ পাক নতুন লোক সৃষ্টি করবেন যারা আল্লাহকে ভালবাসবে। আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করবেন। যারা ইসলামের জন্যে অকুণ্ঠচিত্তে প্রাণ দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে।

আলোচ্য আয়াতে এ ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতে ইসলামকে ত্যাগ করার তথা মুরতাদ হওয়ার একটি ফেৎনা উঠবে। কিছু লোক মুরতাদ হবে তথা ইসলাম পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ পাক এ ফেৎনার মূলোৎপাটনের জন্যে এভাবে গায়বী সাহায্য করবেন যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় এবং পছন্দনীয় একটি দল এ মুরতাদের মূলোৎপাটনে উদ্বুদ্ধ হবে। আল্লাহ পাকের এটি চিরন্তন বিধান যখনই সত্য ধর্মের বিরুদ্ধে কোন ফেৎনা ওঠে আল্লাহ পাক তখন সত্য-সাধক মুসলমানদের একটি দল তৈরী করে দেন যারা ফেৎনাবাজদের মূলোৎপাটনে সক্রিয়া ভূমিকা পালন করেন। যারা কোন তিরষ্কারকারীর তিরষ্কারের প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ করেন না। এরশাদ হয়েছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ

(হে মোমেনগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ তার দ্বীন থেকে ফিরে যায় তবে আল্লাহ পাক তাদের স্থলে এমন সম্প্রদায়কে আনয়ন করবেন যাদেরকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন এবং তারাও আল্লাহ পাককে ভালবাসে) যেমন অন্যত্র আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

"যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন তবে তোমাদের বিদায় করে দেবেন এবং অন্যদেরকে নিয়ে আসবেন"।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ

অর্থাৎ– আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তোমাদের বিদায় করে দেবেন এবং নতুন সৃষ্টি আনয়ন করবেন।

আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মুরতাদ হয় তথা দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগ করে তবে দ্বীন ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না, কেননা আল্লাহ পাক এ ফেৎনার মূলোৎপাটনের জন্যে এমন একদলকে আনয়ন করবেন

যাদের মধ্যে নিম্নোক্ত চারটি গুণ থাকবে–

يُحِبُّهُمْ

(১) যাদেরকে আল্লাহ পাক ভালবাসবেন তথা যারা আল্লাহ পাককে ভালবাসবে।

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

(২) অর্থাৎ মোমেনদের সঙ্গে তারা হবে অত্যন্ত বিনম্র। আর কাফেরদের ব্যাপারে তারা হবে অত্যন্ত কঠিন কঠোর।

يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

(৩) তারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করবে।

وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ

(৪) আর কোন নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করবে না।

এ গুণাবলী অর্জন নিঃসন্দেহে আল্লাহর দান, আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে এ গুণাবলী দান করেন। আল্লাহর দান অনন্ত অসীম। তাঁর দানের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাঁর রহমত তাকে দান করেন এবং তাঁর রহমতে এসব গুণাবলীও দান করেন। আর তিনি মহাজ্ঞানী। তিনি খুব ভালভাবেই জানেন যে, এ গুণাবলীর উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন, যারা মুরতাদদের মূলোৎপাটনের জন্যে এগিয়ে আসবে তারা অত্যন্ত উঁচুমানের গুণাবলীর অধিকারী মোখলেস মোমেন হয়।

## পবিত্র কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত

পরবর্তীতে পবিত্র কোরআনের এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এন্তেকালের পর পরই ইসলাম ত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। তখন আল্লাহ পাক খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর হাতে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) ধর্ম ত্যাগীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেন।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বর্ণনা করেন, যেহেতু আল্লাহ পাক পূর্বেই জানতেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এন্তেকালের পর কিছু লোক মুরতাদ হয়ে যাবে এজন্যে তিনি পূর্বেই এ ফেৎনা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা, সংকল্পের দৃঢ়তা ছিল এ ব্যাপারে তাঁর প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান। তাঁর চিত্তের সুদৃঢ় আঘাতে এ

ফেৎনার চির সমাধি ঘটে। একদিকে ইসলাম পরিত্যাগকারীদের হিড়িক পড়ে যায়, অন্যদিকে কিছু লোক যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। তখন প্রাথমিক পর্যায়ে সাধারণ সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সঙ্গে একমত হননি। এমনকি, হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আপনি তাদের সাথে কিভাবে জেহাদ করবেন? তারা যে কলেমায়ে তৈয়্যেবায় বিশ্বাসী।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, যারা নামাজ এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে আল্লাহর শপথ! আমি তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করবো। নামাজ শারীরিক এবাদত, আর যাকাত আর্থিক এবাদত। আল্লাহর শপথ! যদি তারা একটি বকরীর বাচ্চাও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দিত, আর তা আমাকে দিতে অস্বীকার করে তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করবো। এ পর্যায়ে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সংকল্প এত সুদৃঢ় ছিল যার দৃষ্টান্ত বিরল।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, প্রথমে আমরা তাঁর জেহাদের ফয়সালাকে পছন্দ করিনি কিন্তু পরবর্তীতে আমরা তাঁর সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছি।

আবু বকর এবনে আইয়াশ বর্ণনা করেনঃ আমি আবু হাব্সকে বলতে শুনেছি, আম্বিয়ায়ে কেরামের পর হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর চেয়ে উত্তম কোন ব্যক্তি পয়দা হয়নি। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এন্তেকালের পর মুরতাদদের বিরুদ্ধে তিনিই জেহাদ ঘোষণা করেন।[১]

## যারা মুরতাদ হল

তফসীরকারগণ লিখেছেন, আরবের ১১টি ফেরকা মুরতাদ হয়েছিল। তন্মধ্যে তিনটি গোত্র প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবন সায়াহ্ন মুরতাদ হয়েছিল। এদের প্রত্যেক গোত্রের একজন করে নবুওয়্যতের দাবী করে এবং তাদের গোত্রীয় লোকেরা তার দাবীর প্রতি সর্মথন জানায়।

(১) বনী মোদলাজ গোত্র, তাদের নেতা ছিল আসওয়াদ ওনায়সী। এ ব্যক্তি পেশায় গনক ছিল, সে নবুওয়্যতের দাবী করে বসে, ইয়ামন এলাকায় তার অবস্থান ছিল। সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিয়োজিত ব্যক্তিদের সেখান থেকে বের করে দেয়।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫১৬-১৭

হযরত মাআজ এবনে জবল (রাঃ)-কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে শাস্তি দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি ইয়ামনের কাজী ছিলেন। হযরত মাআজ এবনে জবল (রাঃ)-এর অন্যতম সাথী ফিরোজ দাইলামী তাকে হত্যা করেন। যে রাতে তাকে হত্যা করা হয় সে রাতেই ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে অবগত করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনে, ফিরোজ সফল হয়েছে। এ সংবাদ পেয়ে মুসলমানগণ অত্যন্ত আনন্দিত হন। এর পরদিনই প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইহলোক ত্যাগ করেন।

২. বনু হানিফা গোত্র। এ গোত্রের সর্দার ছিল মুসায়লামা কাজ্জাব। ইয়ামামা শহরে মুসায়লামা নবুওয়্যতের দাবী করে বসে। সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে দু' ব্যক্তিকে দিয়ে একটি পত্র প্রেরণ করে। পত্রের ভাষা ছিল এই–

من مسليمة رسول اللّٰه الى محمد رسول اللّٰه اما بعد فان الارض نصفها لى ونصفها لك

মুসায়লামার তরফ থেকে (যে আল্লাহর রসূল, নাউযুবিল্লাহ) হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সমীপে। এ পৃথিবীর অর্ধেক আমার এবং অর্ধেক আপনার অর্থাৎ এ পৃথিবী আমরা উভয়ে ভাগ করে নেই। এতে প্রমাণিত হয় তার উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ার ধন-সম্পদ লাভ করা। যাহোক, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার এ পত্রের জবাব দিলেন এ ভাষায়–

من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب اما بعد قال الارض لله يورث من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين–

অর্থাৎ– হযরত মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তরফ থেকে মিথ্যুক মুসায়লামার নিকট। নিশ্চয় পৃথিবী এক আল্লাহর, তিনি তাঁর বন্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে, তাঁর উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণতি শুধু পরহেযগারদের জন্য।

অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হন এবং এ নশ্বর জগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত খালেদ এবনে ওলীদ (রাঃ)-এর নেতৃত্ব সৈন্য প্রেরণ করেন। হযরত ওয়াহশী (রাঃ) মিথ্যুক মুসায়লামাকে হত্যা করেন। এভাবে মুসায়লামার ফেৎনা শেষ হয়।

৩. বনী আসাদ গোত্র। এ গোত্রের সর্দার ছিল তোলায়হা এবনে খোয়াইলাদ। এ ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূতঃ পবিত্র জীবনের শেষ দিন গুলোতে নবুওয়্যতের দাবী করে বসে। খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত আবু বকর (রাঃ) তোলায়হার বিরুদ্ধে হযরত খালেদ এবনে ওলীদ (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন। তোলায়হা পরাজিত হয়ে সিরিয়ায় পালিয়ে যায়, এরপর পুনরায় ইসলাম কবুল করেন। কাদেসিয়ার যুদ্ধে মূল্যবান অবদান রাখে। উল্লেখিত তিনটি গোত্র প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় মুরতাদ হয়। আর হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে আরও সাতটি গোত্র মুরতাদ হয়।

তারা হল (১) ফাজারাহ, (২) গাতফান, (৩) বনী সলীম, (৪) বনী ইয়ারবু, (৫) বনী তামীমের কিছু সংখ্যক লোক, (৬) কান্দাহ, (৭) বনী বকর এবনে ওয়াফেল।

হযরত আবু বকর (রাঃ) তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে জেহাদ করেন এবং তাদেরকে সঠিক পথে আনেন। আর দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর আমলে জাবালা এবনে আইহামের গোত্র গাস্‌সান মুরতাদ হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, কিছু লোক যখন যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। হযরত ওমর (রাঃ) এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে একমত হননি। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ নামাযের ফরজ হওয়ার কথা অস্বীকার করা যেমন কুফর ঠিক তেমনি যাকাতের ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করাও কুফর। শুধু কলেমায়ে তৌহিদ পাঠ করাই মুসলমান হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়- যতক্ষণ কোন লোক শরীয়তে ইসলামের যাবতীয় অবশ্য কর্তব্য কাজকে কবুল না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না। একথা শ্রবণ করা মাত্র হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ এখন আমি সত্য উপলব্ধি করেছি, আপনার কথাই হক্ব। এজন্যেই ইমাম বোখারী (রাঃ) বোখারী শরীফে এর উপর একটি পরিচ্ছেদ বা বাব কায়েম করেছেন।[১]

যে দ্বীন ইসলামের ফরজ সমূহের যে কোন একটিকেও গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় সে নিঃসন্দেহে কাফের এবং মুরতাদ। এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, মুসলমান হওয়ার জন্য শুধু ইসলামের দাবীদার হওয়া যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ না কেউ ইসলামের যাবতীয় বিধি-নিষেধ মেনে নেয়। এ সম্পর্কে ইমাম কুরতবী (রঃ) তাঁর তফসীরে লিখেছেন, মুরতাদরা দু' ভাগে বিভক্ত। একভাগ ছিল সেসব লোক যারা ইসলামকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেছিল। আর দ্বিতীয় দলটি ইসলামকে

১। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুল ফতহুল বারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-২৪৪-৪৫
ওমদাতুল কারী খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৮২

সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ করেনি, শুধু যাকাত ফরজ হওয়ার কথা অমান্য করতো। তারা বলতো আমরা নামাজও পড়ব রোজাও রাখব কিন্তু যাকাত দেব না।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) মুরতাদদের উভয় দলের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তিনি তাদের মোকাবেলায় হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন যিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।[১]

فَسَوْفَ يَأْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ

অর্থাৎ যখন ইসলাম ত্যাগ করার এ ফেৎনা উঠবে তখন আল্লাহ পাক তাঁর দ্বীনের হেফাজতের জন্যে এমন সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন যারা হবে আল্লাহ পাকের পছন্দনীয়, আল্লাহ পাক তাদেরকে ভালবাসেন তারাও আল্লাহ পাককে ভালবাসবে। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ইসলামের এ চরম সংকটময় মুহূর্তে আল্লাহ পাক হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে সত্য ও ন্যায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তা ছিল সেদিন নজিরবিহীন। আল্লাহ পাক সেদিন হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দ্বারা বিরাট খেদমত গ্রহণ করেছেন। এমন খেদমত যার কোন দৃষ্টান্ত নেই, যা অতুলনীয়, অনন্য-সাধারণ।

এজন্যে উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছিলেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আরববাসী মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। মুনাফেকী তাদের মনে বসে গিয়েছিল। আমার পিতা এত কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, যদি এসব সমস্যা পাহাড়ের উপর আপতিত হতো তবে সমস্যাগুলো পাহাড়কে চূর্ণ বিচুর্ণ করে দিত।

আর হযরত ওমর (রাঃ) মুরতাদদের এ ফেৎনার মূলোৎপাটনে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর অতুলনীয় অবদানের কথা স্বীকার করে বলেছেনঃ যদি হযরত আবু বকর (রাঃ) সারা জীবনের এবাদত নিয়ে নেন, আর তার বদলে তাঁর এক রাত এক দিনের এবাদত দিয়ে দেন তবে আমি তাতে রাজি।

ঐ রাত হলো সওর গুহার রাত, অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায়ে মোয়াজ্জমা থেকে মদীনা তৈয়্যেবায় হিজরত করেন, মানবতার দুশমনরা তাঁর পিছু ধাওয়া করে তখন তাঁরা মক্কার অদূরে সওর নামক পাহাড়ের সুউচ্চ গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই কঠিন বিপদ মুহূর্তে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একমাত্র সাথী ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ) আর দিন হলো মুরতাদদের সঙ্গে মোকাবেলা করার দিন।

১। তফসীরে কুরতবী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২১১
তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৫৬-৫৮

এ সম্পর্কে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেছেন, মুরতাদদের মোকাবেলায় হযরত আবু বকর (রাঃ) এমন অবদান রেখেছেন যা ছিল পয়গম্বরদের অবস্থান।[১]

يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যাদেরকে মুরতাদদের মোকাবেলা করার জন্যে আনয়ন করবেন তাদের প্রথম গুণ হবে এই, তাঁরা আল্লাহর প্রেমে বিভোর থাকবে, আল্লাহ পাকের প্রেম-প্রীতি ও করুণার অনন্ত ধারা বর্ষিত হতে থাকবে তাদের উপরও, তারা মোমেনদের সঙ্গে থাকবে কোমল চিত্ত, করবে সহৃদয় ব্যবহার আর কাফেরদের প্রতি তারা হবে অত্যন্ত কঠিন কঠোর শুধু তাই নয় বরং–

يُجَاهِدُوْنَ

আল্লাহর রাহে জেহাদে তারা হবে তৎপর, দুশমনের মোকাবেলায় তারা থাকবে অবিচল, কারো কটাক্ষ, নিন্দা-ভর্ৎসনা, ভয়-ভীতি তাদের মনকে স্পর্শও করবে না।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ

এসব গুণাবলী অর্জন হলো আল্লাহ পাকের বিশেষ করুণা আর তা তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই দান করেন থাকেন।

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

আর আল্লাহ পাক অত্যন্ত উদার, তিনি মহাজ্ঞানী। কাকে কি দান করা হবে, আর কে কোন্ দানের যোগ্য তা তিনি ভালভাবেই জানেন।

## মুরতাদদের শাস্তি

ইসলামের মুরতাদদের শাস্তি হলো হত্যা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীসে রয়েছে যা বোখারী শরীফে সংকলিত হয়েছে।

مَنْ بَدَّلَ دينه فاقتلوه

অর্থাৎ যে ধর্মকে পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি ইসলাম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম অবলম্বন করে তাকে হত্যা কর।

১। তফসরীরে মা'আরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৩৫৯
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৬০-৬১

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইয়ামনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। একবার হযরত মা'আজ এবনে জবল (রাঃ) তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। এমন সময় একজন মুরতাদ ব্যক্তিকে বন্দী করে আনা হয়। হযরত মা'আজ এবনে জবল (রাঃ) জিজ্ঞাসা করেন এ লোকটি কে? তাঁকে বলা হলো এ লোকটি মুরতাদ। সে ইসলাম ছেড়ে ইহুদী হয়ে গেছে। তখন হযরত মা'আজ এবনে জবল (রাঃ) বললেন, আমি আপনার নিকট বসবো না যে পর্যন্ত আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হুকুম জারী না হয়। তখন তাকে হত্যার আদেশ দেয়া হয় এবং সে আদেশ কার্যকর হয়।

–(বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নেসায়ী)

বর্তমান যুগে রাষ্ট্রদ্রোহীদের ব্যাপারে সারা বিশ্বে যে শাস্তি প্রচলিত রয়েছে, ইসলাম মুরতাদদের ব্যাপারে সে শাস্তিই প্রবর্তন করেছে। অতএব, কেউ এ ব্যাপারে সংকীর্ণতার অভিযোগ অথবা উদারতার দোহাই দিতে পারে না। আল্লাহর বিধান ফেৎনা-ফাসাদ, উৎপাত-অশান্তি এবং অকল্যাণ দূরীভূত করার জন্যে, বিশ্বমানবের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্যেই প্রবর্তন করা হয়েছে। যদি রাষ্ট্রদ্রোহীতার শাস্তি হত্যা হয় তবে বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ রব্বুল আলামীনের বিদ্রোহীদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হওয়া অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত।

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَٰلِبُونَ ﴿٥٦﴾

## তরজমা

(৫৫) এবং তোমাদের বন্ধু শুধু আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল এবং সে সব মোমেনগণ যারা নামাজ প্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত আদায় করে এবং তারা বিনয়ী।

(৫৬) আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল এবং মোমেনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে (সে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার দলভুক্ত হবে) একথা নিশ্চিত যে, আল্লাহ তায়ালার দলই বিজয়ী।

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব না করার নির্দেশ ছিল। এখন প্রশ্ন হতে পারে তাহলে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবো? এর জবাবেই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ হে মোমেনগণ! তোমাদের প্রকৃত বন্ধু শুধু আল্লাহ পাক, আল্লাহর রসূল হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং প্রকৃত মোমেনগণ। তোমরা তাদের সাথেই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তোল। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

অর্থাৎ– আল্লাহ পাকই মোমেনদের অভিভাবক, তিনিই তাঁর প্রতি বিশ্বাসী বন্দাদের সহায়ক, তিনিই তাদের প্রকৃত বন্ধু, তিনিই তাদেরকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসেন। আর আল্লাহর রসূল মোমেনদের বন্ধু। মোমেনদের কল্যাণ সাধনে তিনিই সর্বাধিক তৎপর এবং যারা প্রকৃত মোমেন তারাও তোমাদের বন্ধু। পরবর্তী বাক্যে মোমেনদের বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ

অর্থাৎ– যারা সঠিকভাবে নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে।

যেহেতু মানুষের উপর দুটি হক্ব রয়েছে একটি বন্দা হিসেবে আল্লাহর প্রতি হক্ব, আর অন্যটি হলো সম্পদশালী মানুষ হিসেবে অন্য মানুষের হক্ব। প্রকৃত মোমেন তারাই যারা তাদের প্রতি অর্পিত উভয় হক্ব বা কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে। আর যারা সৃষ্টি হিসেবে স্রষ্টার প্রতি এবং অন্য সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য পালন করে, তারাই মোমেনদের প্রকৃত বন্ধু।

وَهُمْ رٰكِعُوْنَ

অর্থাৎ– তারা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে।

আলোচ্য আয়াতে 'রাকেউন' শব্দটি 'খাশেউন' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ তারা অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় নামাজ ও যাকাত আদায় করে। দ্বিতীয়ত, এর আরো একটি অর্থ হতে পারে। তা হলো তাদের নামাজ রুকুর সাথে হয়। ইহুদী এবং খৃষ্টানদের নামাজ রুকু ব্যতীত হয়। তাই আয়াতে সুস্পষ্টভাবে এরশাদ হয়েছে যে, মোমেনদের নামাজ রুকুর সাথে হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এর তৃতীয় অর্থ লিখেছেন যে, তারা রুকু অবস্থায়ও যাকাত আদায় করে। এ অর্থের পক্ষে তিনি হযরত আম্মার এবনে ইয়াসিরের একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, একবার হযরত আলী (রাঃ) নামাজে রুকু অবস্থায় ছিলেন। এমন সময় একজন সাহায্য প্রার্থী এসে হাযির হয়। তিনি ঐ অবস্থাতেই হাতের আংটিটি সাহায্য-প্রার্থীকে দিয়ে দেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

আবদুর রাজ্জাক এবনে আবদুল ওয়াহাব তাঁর পিতা মুজাহেদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

এবনে মরদবিয়া অন্য একটি সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একথাটি বর্ণনা করেছেন। আর হযরত আলী (রাঃ)-এর একটি কথাও এ পর্যায়ে বর্ণিত আছে।

এবনে জরীর (রঃ) মুজাহেদ (রঃ)-এর বর্ণনা থেকে এবং এবনে আবি হাতেম সালমাহ এবনে কোহায়েলের সূত্রে এমনি একটি বর্ণনা দিয়েছেন।

সালাবী হযরত আবু জর (রাঃ)-এর বর্ণনা থেকে এবং হাকেম উলুমুল হাদীসে স্বয়ং হযরত আলী (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ সমস্ত বিবরণ একটি আরেকটির সহায়ক।

এ ঘটনায় একথা প্রমাণিত হয় যে, নামাজরত অবস্থায় সামান্য আমল নামাজকে বিনষ্ট করে না।

এতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, নফল সদকাহ তথা খয়রাততে যাকাত বলা অবৈধ নয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) আরো লিখেছেন, যদিও এ আয়াত হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে কিন্তু এর হুকুম সকলের জন্যে। যেহেতু সদকাহ প্রদানের ঘটনাটি রুকু অবস্থায় হয়েছিল, তাই বিশেষভাবে রুকুর উল্লেখ করা হয়েছে। মূলতঃ আয়াতের মর্মকথা হল-যারা সাহায্য প্রার্থীকে অনতিবিলম্বে দান করে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, আয়াতখানি হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ এবনে উবাই এবনে সলুল সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কেননা, তাদের দুজনের সঙ্গেই ইহুদীদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কীয় আয়াত নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহুদীদের বন্ধুত্ব বর্জন করেন এবং বলেন, আমি আল্লাহ পাক, তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানদের বন্ধু।

তখন তাঁর সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়। আয়াতের 'মুমেনীন' শব্দের উদ্দেশ্য হল হযরত ওবাদা (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম।

আল্লামা বগভী (রঃ) একথাও লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমার সম্প্রদায় আমাকে ছেড়ে দিয়েছে এবং তারা শপথ করেছে আমার সঙ্গে আর কোন প্রকার ওঠা-বসা করবে না, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) তখন বলেন, 'আমি আল্লাহ পাক, তাঁর রসূল এবং মোমেনদের বন্ধুত্বের উপরই সন্তুষ্ট'।

এ আয়াত সম্পর্কে যাহ্যাক (রঃ) বলেছেনঃ এ আয়াতে সে মোমেনদের কথা বলা হয়েছে, যারা একে অন্যের বন্ধু। হযরত আবু জাফর মোহাম্মদ এবনে আলী বলেছেনঃ এ আয়াত মোমেনদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাঁকে বলা হল- লোকেরা বলে এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আলী এবনে আবি তালেব (রাঃ) সম্পর্কে। তিনি বলেনঃ হযরত আলী (রাঃ) তো মোমেনদের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত।

একরামার মতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আবু বকর (রাঃ) সম্পর্কে।

আল্লামা বগবী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতের ব্যাপারে হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে যে সব রেওয়ায়েত এসেছে, সেগুলো বাদ দিলে এর অর্থ হবে, যারা দিবা-রাত্রি নফল নামাজ আদায় করেন।

প্রশ্ন হতে পারে যে, পৃথিবীতে কাফের বা অমুসলিমের সংখ্যা সর্বদাই অধিক। যেমন আজকের জনসংখ্যা হলো প্রায় ৭০০ কোটি। তন্মধ্যে প্রায় ১৫০ কোটি হলো মুসলমান যারা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। এমন অবস্থায় কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পরিহার করা হলে এবং শুধু অল্প সংখ্যক মুসলমানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব সীমিত রাখা হলে মুসলমানদের প্রভাব কমে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। তারই জবাবে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

অর্থাৎ- আর যার বন্ধু হবে স্বয়ং আল্লাহ পাক, তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং মোমেনগণ তাদের বিজয় সুনিশ্চিত। সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভের পর আর কারো সাহায্যের প্রয়োজনই থাকে না। অতএব (হে মোমেনগণ!) বাহ্যিক সাজ-সরঞ্জামের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, লক্ষ্য রাখ আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম রহমতের উপর।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে মোমেনদের যে উল্লেখ রয়েছে তার তাৎপর্য হলো মোহাজের ও আনসার অর্থাৎ "যারা মোহাজের ও আনসারদের বন্ধুত্ব অবলম্বন করবে"।

فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ

অর্থাৎ– যারা আল্লাহ পাক, তাঁর রসূল এবং মোমেনদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারাই হবে আল্লাহর দল। আর একথা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহর দলই হবে জয়ী। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। আর সকলেই ছিলেন নিরস্ত্র-প্রায় কিন্তু আল্লাহ পাক মুসলমানগণকে বিজয় দান করেছেন। খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩ হাজার, আর হানাদার কাফেরদের সংখ্যা ছিল ১২ হাজার, কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী! আল্লাহ পাক বিজয় মুসলমানদেরকেই দান করেছেন।

স্পেন বিজয়ী তারেকের সঙ্গে ছিলেন মাত্র ৭ হাজার মুসলমান, অথচ কাফের সৈন্যের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ। এ উপমহাদেশে মোহাম্মদ বিন কাসেম এসেছিলেন মাত্র ৫ হাজার মুসলিম বাহিনী নিয়ে অথচ রাজা দাহিরের ৬০ হাজার সৈন্যকে তাদের নিকট পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। অতএব, পবিত্র কোরআনের এ ঘোষণা যে "আল্লাহর দল অবশ্যই বিজয়ী হবে" বারে বারে সত্য প্রমাণিত হয়েছে, যুগে যুগে দেশে দেশে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ
هُزُوًا وَّ لَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ
وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾ وَ
اِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّ لَعِبًا ۭ ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿٥٨﴾

## তরজমা

(৫৭) হে মোমেনগণ! তোমাদের পূর্বের আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা তোমাদের ধর্মকে বিদ্রুপ করে, খেলার বস্তু মনে করে তাদেরকে ও কাফেরদেরকে (কোন দিনও) বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা এবং যদি তোমরা মোমেন হও তবে আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করো।

(৫৮) আর যখন তোমরা নামাজের জন্যে আহবান কর তখন তারা আযানের সম্বন্ধে হাস্য-তামাসা করে, তা এজন্যে যে, তাদের বোধশক্তি নেই।

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করার নির্দেশ ছিল, আর এ আয়াতে ইহুদী, নাসারাসহ সকল মুনাফেকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করার নির্দেশ রয়েছে। মোমেনদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ ঈমানের দাবী হল এই, তোমরা দ্বীন ইসলামের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা কর এবং দ্বীন ইসলামের হেফাজত কর, দ্বীন ইসলামের দুশমনরা যারা ইসলামের ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে তাদের সঙ্গে কোন প্রকার বন্ধুত্ব করোনা, কেননা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা হলে দ্বীন ইসলামের হেফাজত হতে পারে না।

তাই এরশাদ হয়েছেঃ হে ঈমানদারগণ! যারা তোমাদের দ্বীনকে নিয়ে বিদ্রুপ করে এবং তোমাদের দ্বীনকে খেল-তামাশার বিষয় মনে করে, যাদেরকে ইতিপূর্বে আসমানী কিতাব প্রদান করা হয়েছে, সেই ইহুদী ও খৃষ্টান এবং সকল কাফের মুনাফেক এদের কাউকেই তোমরা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও।

### শানে নুযুল

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ রোফাআ এবনে যায়েদ এবনে তাবুত এবং সোয়াইদ এবনে হারেস প্রকাশ্যে মুসলমান হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃত অবস্থায় তারা ছিল কাফের, যেহেতু তারা ইসলামের কথা প্রকাশ করত, তাই মুসলমানগণ তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন, আর আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা ঘোষণা করে এরশাদ করেছেনঃ ঈমানের কথা প্রকাশ করলেও তাদের অন্তরে ঈমান নেই। অতএব, হে মোমেনগণ! তোমরা তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা।[১]

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, একজন মুসলমানের নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হল তার ধর্ম। এ প্রিয় বস্তুকে নিয়ে যারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে, যারা খেল-তামাশা করে সেই ইহুদী খৃষ্টান কাফেরদেরকে খাঁটি মুসলমান কোন অবস্থাতেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতে একথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইসলামের প্রতি বিদ্রুপ করা এবং আল্লাহর নাফরমানী করা যাদের বৈশিষ্ট্য তাদের সঙ্গে মুসলমানদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫২৭
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৭২

অতঃপর এরশাদ হয়েছে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, কেননা ঈমানের দাবী হল আল্লাহ পাকের নিষিদ্ধ কাজ সমূহ থেকে বিরত থাকা। তাই এরশাদ হয়েছেঃ যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও তবে তোমরা পরহেযগারী অবলম্বন কর। প্রতি মুহূর্তে আল্লাহকে ভয় করতে থাক।

ক্বালবী (রঃ) লিখেছেন, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যমানায় নামাজের জন্যে আযান দেয়া হতো তখন ইহুদীরা বিদ্রুপ করে বলত, তারা কি দাঁড়িয়ে গেছে না দাঁড়ায়নি, নামাজ আদায় করছে না করেনি। এসব কথা বলে হাসত, আযানকে নিয়ে উপহাস করত। অথচ আযান, নামাজ ঠাট্টা-বিদ্রুপের বিষয় নয়। এ মূর্খ লোকেরা এ সত্য উপলব্ধি করে না।

এবনে আবি হাতেম সুদ্দীর (রঃ) সূত্রে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। মদীনা মোনাওয়্যারায় একজন খৃষ্টান ছিল। তার অবস্থা এই ছিল যে, যখন মোয়াজ্জিন আশহাদুআন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ বলত, তখন সে বলত, الكاذب قد حرق অর্থাৎ– মিথ্যাবাদী পুড়ে মরুক। যখনই সে আযান শ্রবণ করত তখন সে এ বদদোয়া করত। অবশেষে তার নিজের জন্যেই এ বদদোয়া প্রতিফলিত হয়।

এক দিনের ঘটনা। তার পরিচারিকা হাতে আগুন নিয়ে তার ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় আগুনের একটি স্ফুলিঙ ঐ খৃষ্টানের ঘরে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আগুন ধরে যায়। ঐ খৃষ্টান এবং তার স্ত্রী ঘরে নিদ্রিত ছিল, তারা উভয়েই আগুনে পুড়ে মারা যায়। আর এভাবে তার বদদোয়া বাস্তবায়িত হয় এবং আযানের উপহাসকারী তার শোচনীয় পরিণাম ভোগ করে।[১]

এ পর্যায়ে হাদীস শরীফে আরো একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। মক্কা বিজয়ের সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোয়াজ্জিন হযরত বেলাল (রাঃ) যখন আযান দেন, তখন কিছু ছেলে তাঁর আযানের অনুসরণ করে এবং বাক্যগুলোর পুনরাবৃত্তি করে হাসতে থাকে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তাঁর নিকট হাযির করান এবং জিজ্ঞাসা করেনঃ তোমাদের মধ্যে উচ্চস্বর কার? সকলে আবু মাহজুরার দিকে ইঙ্গিত করল। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে আযান দিতে বলেন, তিনি আযান দিলেন, এর বরকতে আল্লাহ পাক তাঁর অন্তরে ইসলামের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দিলেন এবং তিনি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করলেন। এভাবে আযানের অনুকরণ তাঁর জীবনে এনে দিল এক শুভ বিপ্লব।[২]

---

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫২৮
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭১
তফসীরে কবীর খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩৩
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৭২
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-৬ খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১০৭

২। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১৫২

## আযানের ইতিহাস

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা মোনাওয়্যারায় হিজরত করলেন তখন নামাজের এ'লান সম্পর্কে পরামর্শ হলঃ কিভাবে নামাজের জন্যে লোকদেরকে ডাকা যেতে পারে? কেউ বললেন, ইহুদী খৃষ্টানদের মত ঘন্টা পেটানো হোক। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনার হুকুম হলে এক ব্যক্তি লোকদের ডেকে আনবে, ঐ রাতেই হযরত আবদুল্লাহ এবনে যায়েদ (রাঃ) স্বপ্নে দেখলেন, সবুজ পোষাকধারী এক ব্যক্তি তাঁকে আযানের শব্দগুলো শুনিয়ে দিয়েছেন এবং বলছেন, তুমি এ বাক্যগুলো উচ্চারণ কর। হযরত আবদুল্লাহ এবনে যায়েদ (রাঃ) অতি প্রত্যুষে দরবারে হাযির হয়ে আরজ করলেন, রাতে আমি এ স্বপ্ন দেখেছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তুমি এ বাক্যগুলো বেলালকে শিখিয়ে দাও। তাঁর স্বর উঁচু। হযরত বেলাল (রাঃ) আযান দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) এ বাক্যগুলো শ্রবণ করে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, আমিও এ স্বপ্ন দেখেছি।

উল্লেখ্য, নামাজের জন্যে আযানের বিধান সুন্নত। জুময়াহ সহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ব্যতীত অন্য কোন নামাজের জন্যে আযান সুন্নত নয়। দ্বিতীয়ত, নামাজের আযান ব্যতীত কোন পন্থা সুন্নত সম্মত নয়।

## আযানের হেকমত

১. নামাজের জন্যে সাধারণ আহবান,

২. ইসলামের দুশমনদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করা, যেমন হাদীস শরীফে আছে আযানের শব্দ শ্রবণ মাত্র শয়তান পলায়ন করে,

৩. আল্লাহর তৌহিদ বা একত্ববাদ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের ঘোষণা।

৪. যারা নিদ্রিত, তাদেরকে জাগ্রত করা এবং যারা নামাজের কথা বিস্মৃত হয়েছে তাদের নামাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া, কেননা মোয়াজ্জিন যখন বলে "আল্লাহু আকবার" অর্থাৎ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। এ মুহূর্তে একথা বলার তাৎপর্য হল, আল্লাহ পাক ব্যতীত পৃথিবীর সব কিছুই ক্ষুদ্রতম। অতএব, ক্ষুদ্রতমের সম্পর্ক পরিত্যাগ করে শ্রেষ্ঠতমের দরবারে হাযির হও। আর যখন "আশহাদুআল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলা হয় অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই অতএব, তাঁর মহান দরবারে হাযির হও। বিনয় প্রকাশ কর।

এরপর যখন বলা হয় "আশহাদুআন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ", এর তাৎপর্য হল হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল আর প্রত্যেক

মুসলমানকে তাঁর অনুসারী হতে হয়। অতএব, তাঁর অনুসরণেই নামাজে হাযির হও। এরপর সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয় "হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ" অর্থাৎ তোমরা নামাজের জন্যে হাযির হও। আর তোমাদের এ হাযিরী নিরর্থক হবে না এবং এখানেই রয়েছে তোমাদের সাফল্য।

তাই বলা হয় "হাইয়্যা আলাল ফালাহ" অতএব, তোমাদের জীবন-সাধনার সাফল্য লাভের জন্যে এখানে হাযির হও। পরম সাফল্যের মনি-মানিক্য কুড়িয়ে নিয়ে যাও এখানে থেকে। যদি এরপরও কারো মনে একটুকু ভুল ভ্রান্তির অন্ধকার অবশিষ্ট থাকে, তাই দ্বিতীয়বার তকবীর উচ্চারণ করে সে অন্ধকার দূর করা হয়।

বস্তুতঃ আযান এবং নামাজ ইসলামের এমনি একটি মহান শিক্ষা, যদি কোন বুদ্ধিমান মানুষ এর সত্যিকার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে তবে ইসলাম গ্রহণ করা ব্যতীত তার গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু যেহেতু তারা ছিল মূর্খ সম্প্রদায় بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ তাই তারা আযান এবং নামাজ নিয়ে উপহাস করে।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ
مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ
قَبْلُ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٥٩﴾ قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ
مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ
مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ؕ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ
مَّكَانًا وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿٦٠﴾ وَاِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْٓا
اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ
اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ﴿٦١﴾ وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ
فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٢﴾

তরজমা

(৫৯) (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাব! তোমরা আমাদের মধ্যে এতদ্ব্যতীত আর কি দোষ পাও যে, আমরা আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাস

স্থাপন করেছি এবং যা আমার নিকট নাযিল করা হয়েছে এবং যা ইতিপূর্বে নাযিল হয়েছে তার উপর আমরা ঈমান এনেছি, তোমাদের অধিকাংশ লোকই ফাসেক তথা সত্য ধর্ম থেকে দূরে।

(৬০) (হে রসূল!) আহলে কিতাবদেরকে আপনি বলে দিন, আমি কি তোমাদেরকে সে পথের সন্ধান দেব যা প্রতিফলের দিক থেকে আল্লাহ তায়ালার নিকট এর চেয়ে অধিক মন্দ। তা হল সে সব লোকদের পন্থা যাদের উপর আল্লাহর লা'নত পড়েছে, যারা আল্লাহ তায়ালার কোপগ্রস্ত হয়েছে এবং যাদেরকে তিনি বানর ও শুকরে পরিণত করেছেন এবং যারা শয়তানের উপাসনা করেছে। তাদের স্থান অত্যন্ত মন্দ এবং তারা সরল সঠিক পথ থেকে বহু দূরে সরে পড়েছে।

(৬১) এবং যখন তারা তোমাদের নিকট আসে তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা কুফরী অবিশ্বাস নিয়েই প্রবেশ করেছিল এবং তা নিয়েই বের হয়ে গেছে এবং তারা যা গোপন করে আল্লাহ তা সবচেয়ে বেশী জানেন।

(৬২) এবং আপনি (হে রসূল!) তাদের অনেককে দেখবেন তারা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে পাপাচারে, অত্যাচারে এবং হারামখোরীতে লিপ্ত হচ্ছে। কত মন্দ এবং নিন্দনীয় তাদের এ সমস্ত কাজ কর্ম!

## তফসীরুল কোরআন

### শানে নুযুল

এবনে জরীর (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, কয়েকজন ইহুদী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়। তাদের মধ্যে ছিল আবু ইয়াসের এবনে আখতাব, রাফে এবনে আবি রাফে, আদি এবনে আমর। তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করে পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে আপনি কোন্ কোন্ নবীর প্রতি বিশ্বাস করেন?

তিান এরশাদ করলেনঃ আমি বিশ্বাস করি আল্লাহর প্রতি, আর যা কিছু ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইছহাক, ইয়াকুব এবং তাঁর আওলাদের প্রতি নাযিল হয়েছে, আর যা কিছু মূসা এবং ঈসাকে প্রদান করা হয়েছে। আর যা কিছু সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রদান করা হয়েছে, আমি সকলের প্রতি বিশ্বাস রাখি। তাদের কারো মধ্যেই কোন পার্থক্য রাখি না। আমরা আল্লাহর অনুগত। এরপর ঈসা (আঃ)-এর নাম শ্রবণ করে ঐ ইহুদীরা তাঁকে পয়গম্বর বলে মেনে নিতে অস্বীকার করল এবং বলল, আমরা ঈসাকেও মানি না এবং যে ঈসাকে পয়গম্বর মানে তাকেও মানি না।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, ইহুদীরা বলেছিলোঃ আল্লাহর শপথ! দ্বীন দুনিয়ায় তোমাদের চেয়ে ভাগ্যাহত এবং তোমাদের ধর্মের চেয়ে মন্দ ধর্ম আছে কি-না আমরা জানি না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনি বলুন হে আহলে কিতাব! মুসলমানদের প্রতি তোমাদের যে হিংসা-বিদ্বেষ এবং শত্রুতা রয়েছে তার কারণ কি? তাদের মধ্যে এমন কি দোষ রয়েছে যে কারণে তোমরা তাদেরকে হিংসার আগুনে বিদগ্ধ করতে চাও? আমরা মুসলমান, আমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখি, আমরা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ কিতাব সমূহ এবং তাঁর প্রেরিত নবীগণের প্রতি সঠিকভাবে ঈমান রাখি। এটিই কি আমাদের দোষ? এটিই কি মোমেনদের প্রতি উপহাস করার কারণ? মূলতঃ তোমাদের অধিকাংশই কাফের, পাপিষ্ঠ।

কোন বিষয়ে যদি দোষ-ত্রুটি থাকে তবে তাকে দোষ দেয়া যায়, আর যদি দোষ ত্রুটি না থাকে তবুও দোষ দেয়া হয়, তবে তার কারণ হল দর্শকের বিচার-বুদ্ধির অভাব। আযানের মধ্যে, নামাজের মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি নেই, আসল কথা হল কাফেরদের বিচার বুদ্ধির অভাব, তাদের অন্তরের রোগ। এজন্যেই তারা মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতা রাখে এবং মোমেনদেরকে মন্দ বলে। যেহেতু তারা পাপিষ্ঠ, তাই ভালকে ভাল বলা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। অন্যায়-অনাচারের দৌরাত্মের কারণে আল্লাহ পাক তাদের প্রতি গজব নাযিল করেছেন। তারা অভিশপ্ত হয়েছে। এমনকি, তাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে কোন কোন লোককে শুকর, বানরে পর্যন্ত পরিণত করা হয়েছে। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ

অর্থাৎ– (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা যে দ্বীনকে মন্দ বলেছ, আমি কি তোমাদেরকে এমন পন্থা বলব যার পরিণাম আল্লাহ পাকের দরবারে অধিকতর মন্দ, সে পন্থা তাদের যাদেরকে আল্লাহ পাক লা'নত দিয়েছেন, যারা আল্লাহর কোপগ্রস্ত হয়েছে এবং যাদের মধ্য থেকে আল্লাহ পাক তাদেরকে শুকর বানরে পরিণত করেছেন এবং যারা শয়তানের গোলামী করেছে, তাদের অনাচার অশ্লীলতা এবং দৌরাত্মই ছিল তাদের এ বদনসিবীর কারণ। এসব লোকের পরিণাম ভয়াবহ এবং তাদের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ, আর তারা পথভ্রষ্টতার চরম অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অতএব, যদি উপহাস করতে হয় তবে তারাই হল উপহাসের যোগ্য পাত্র।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫২৮-২৯

وَاِذَا جَآءُوْكُمْ

অর্থাৎ– যারা ইসলামকে উপহাস করে, তাদের মধ্যে এক দল মুনাফেকও ছিল, যারা ইসলাম এবং মুসলমানদের উপহাস করত, কিন্তু মুসলমানদের সম্মুখে হাযির হলে তারা বলত- আমরা মুসলমান, আমরা ঈমান এনেছি। অথচ তাদের অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠে থাকত কুফর। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا

তারা কুফর নিয়ে এসেছিলো এবং কুফর নিয়েই বেরিয়ে গেছে তথা কাফের অবস্থায় এসেছিল এবং কাফের অবস্থায়ই বেরিয়ে গেছে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নসিহতে তারা কর্ণপাত করেনি। তাদের অন্তর ঈমানের স্পর্শ পর্যন্ত লাভ করেনি। যদি তারা ঈমানের কথা প্রকাশ করত এবং তাদের ধারণা ছিল এভাবে আল্লাহর রসূলকে প্রতারণা করতে পারবে, কিন্তু তাদের এ অপচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। কেননা, আল্লাহ পাক তাদের অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ

অর্থাৎ– আল্লাহ পাক খুব ভালভাবেই জানেন যা তারা গোপন করেছে, কেননা তিনি অন্তর্যামী। পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে মুনাফেকদের প্রতি দুনিয়াতে অবমাননা এবং আখেরাতে কঠোর শাস্তির হুশিয়ারী বাণী উচ্চারিত হয়েছে।

وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ

(হে রসূল!) আপনি দেখবেন, এ ইহুদী ও মুনাফেকদের অনেককে তারা পাপাচার, শত্রুতা এবং হারামখোরীতে লিপ্ত হচ্ছে।

আলোচ্য আয়াতে اثم শব্দটি গুনাহ বা পাপাচারের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর জুলুম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে عدوان শব্দটি। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, اثم শব্দটির অর্থ হল, তৌরাতের কোন কোন আয়াতকে গোপন করা এবং "উদওয়ান" শব্দের অর্থ হল তৌরাতে নিজেদের তরফ থেকে কিছু সংযোজন করা।

وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ

অর্থাৎ– এ ইহুদী ও মুনাফেকরা শুধু যে পাপাচার, অন্যায়-অনাচার এবং জুলুম অত্যাচারেই লিপ্ত ছিল তাই নয়, বরং হারামখোরীর অপরাধেও ছিল অপরাধী। সুদ, ঘুষ অবৈধ পন্থায় আমদানীতে তারা ছিল অভ্যস্ত।[১]

তফসীরকারগণ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে হারামখোরীর উল্লেখ এজন্যে বিশেষভাবে করা হয়েছে যে, তারা ঘুষ গ্রহণ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়নের মানুষকে বিরত রাখত। তৌরাতের আয়াত সমূহ পরিবর্তন করত। এমনকি আল্লাহ্ পাকের শানে মিথ্যা, বানোয়াট কথা বলত, এমন হীন এবং নীচ মানসিক অবস্থা যাদের এবং হারামখোরী যাদের বৈশিষ্ট্য, ঘুষ গ্রহণ যাদের অভ্যাস, পৃথিবীতে এমন জঘন্য নিকৃষ্ট জাতির দৃষ্টান্ত বিরল।

لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

(নিঃসন্দেহে তারা অত্যন্ত মন্দ কাজে লিপ্ত ছিল।)

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আয়াতের শুরুতে মুনাফেকদের আকীদা ও বিশ্বাস যে মন্দ তা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে তাদের শুধু আকীদা বিশ্বাসই নয়, বরং আমলও যে ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয় একথার ঘোষণা রয়েছে।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে الاثم শব্দটিতে সর্বপ্রকার পাপাচার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এরপর যখন আল্লাহ পাক عدوان এবং السحت শব্দটি সংযোজন করেছেন, এতে একথা প্রমাণিত হয় যে ইহুদী সম্প্রদায় অত্যন্ত জঘন্য পাপ কার্যে লিপ্ত ছিল।[২] মিথ্যা, ধোঁকা, প্রতারণা, অন্যায়-অনাচার, জুলুম-অত্যাচার, ঘুষখোরী, সুদখোরী এক কথায় এমন কোন অপরাধ নেই যা তাদের মধ্যে ছিল না। এমন অপরাধী সম্প্রদায় যদি আল্লাহর মোমেন বন্দাদের প্রতি উপহাস করে তবে তার পরিণাম কত ভয়াবহ হয়, তা সহজেই অনুমেয়।

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-২৬১
২। তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৩৯

لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ
الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۭ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿٦٣﴾
وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ۭ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا
قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاۗءُ ۭ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا
مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۭ وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۗءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۭ كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا
لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا ۭ وَاللّٰهُ
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٤﴾

## তরজমা

(৬৩) তাদের সাধু, দরবেশ এবং ধর্মযাজকরা কেন তাদেরকে পাপাচার এবং হারাম ভক্ষণ থেকে বিরত রাখে না? তারা যা করছে তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত জঘন্য কাজ।

(৬৪) আর ইহুদীরা বলে যে আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে (নাউযুবিল্লাহ), তাদের এ উক্তির কারণে তাদেরই হাত বন্ধ হয়ে গেছে এবং তাদের প্রতি লা'নত হয়েছে। বরং আল্লাহ পাকের দু' হাতই উন্মুক্ত রয়েছে, তিনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করেন এবং (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তা বহু লোকের কুফরী ও নাফরমানী বৃদ্ধি করবে এবং আমি তাদের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও হিংসা নিক্ষেপ করেছি, যখনই তারা যুদ্ধ অগ্নি প্রজ্বলিত করতে চায় তখনই আল্লাহ পাক তা নিষ্প্রভ করে দেন এবং তারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে। আর আল্লাহ পাক অশান্তি সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে সাধারণ ইহুদীদের দৃষ্কৃতি এবং অন্যায় আচরণের কথা এরশাদ হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে ইহুদীদের বিশেষ দল ধর্মযাজকদের গাফলত এবং

অন্যায় আচরণের প্রতি বিশেষভাবে ভর্ৎসনা করা হয়েছে, কেননা তারা ইচ্ছা করলে মানুষকে অন্যায়-অসুন্দর পথ থেকে রক্ষা করতে পারত কিন্তু তারা তা করেনি। অথচ যারা ধর্মযাজক, যারা ধর্মজ্ঞানী, তাদের একান্ত কর্তব্য হল মানুষকে অধর্মীয় কাজ থেকে বিরত রাখা। কিন্তু তারা সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

## ইহুদী ধর্মযাজকরা দায়িত্ব পালন করেনি

তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ কোন জাতির জীবনে যখন অধঃপতন আসে তখন তাদের জাতীয় জীবনের সব দিকই গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সকল মানুষই সর্বপ্রকার পাপাচারে লিপ্ত হয়। অন্যায় অনাচারই তাদের জীবন ধারার স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়। শুধু যে সে জাতির সাধারণ মানুষ আল্লাহর নাফরমানী বা অবাধ্যতা ও পাপাচারে লিপ্ত হয় তাই নয়, বরং তাদের সুধীজন, আলেম, দরবেশ, জ্ঞানী গুণীরাও নির্বাক শয়তানে পরিণত হয় অর্থাৎ সমাজ যখন অন্যায় অবিচারে লিপ্ত, তখন বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট মানুষগুলোকে সঠিক পথে আনা যাদের দায়িত্ব তারাও নিজেদের দায়িত্ব পালন অবহেলা করে।

সত্যের নির্দেশ এবং অসত্য থেকে বারণ করা যাদের দায়িত্ব তারা এ দায়িত্ব পালনে বিরত থাকে। একটা জাতির চরম দুর্দিনের এটিই হলো প্রকৃত রূপ। বনী ইসরাঈলের জীবনে যখন দুর্দিন ঘনিয়ে আসলো, যখন সমগ্র জাতি অন্যায়-অনাচারে নিমজ্জিত হলো তখনও এ অবস্থাই হয়েছিলো। যাদের দ্বারা জাতি সঠিক পথ লাভ করতে পারতো এবং নিশ্চিত ধ্বংস থেকে রক্ষা লাভ করতো তারা নিজেরাই নিজেদের জাগতিক স্বার্থের নেশায় মেতে উঠলো। সাধারণ মানুষের চেয়ে অন্যায়-অনাচারে তারা শতগুণ বেশী এগিয়ে ছিল। লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা, হীনমন্যতা, ক্লীবতা, জড়তা তাদেরকে পেয়ে বসেছিলো।

ফলে সত্যের নির্দেশ এবং অসত্য থেকে বিরত রাখার প্রয়াস তাদের মধ্যে মোটেই ছিল না। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ বনী ইসরাঈলের সাধু, দরবেশ এবং জ্ঞানীরা কেন তাদেরকে পাপাচার থেকে এবং হারামখোরী থেকে বিরত রাখে না? অর্থাৎ বিরত রাখা যাদের দায়িত্ব তারা সে দায়িত্ব কেন পালন করে না?[১]

لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ

অর্থাৎ– নিঃসন্দেহে তাদের এ কাজ অত্যন্ত মন্দ।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ পবিত্র কোরআনের এ আয়াতখানি মর্মের দিক থেকে অত্যন্ত কঠিন। কেননা, যারা অন্যায় অনাচার থেকে বিরত রাখে না তাদের সম্পর্কে এতে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১৫২

ইমাম বয়জাবী (রঃ) লিখেছেন, ভাল কাজ বর্জন করা পাপ কাজ থেকেও মন্দ কেননা, পাপকার্যে কুপ্রবৃত্তি কিছুটা আনন্দ লাভ করে। তাই মানুষের মন সেদিকে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ভাল কাজ বর্জনে কোন আনন্দ নেই এবং মনও সেদিকে আকৃষ্ট হয় না। এজন্যে ভাল কাজ বর্জন অধিকতার মন্দ।[১]

## ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা কর্তব্য

এজন্যেই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বিশেষভাবে তাগিদ করেছেন, মুসলমানদের মধ্যে একটি দল সৎ কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালনে মশগুল থাকে।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"এবং তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হওয়া উচিত যারা মানুষকে কল্যাণকর কাজের দিকে আহবান করবে, ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর তারাই হবে সফলকাম"।

এ সম্পর্কে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিশেষ তাগিদ করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেনঃ

"তোমাদের মধ্যে যে কোন অন্যায় কাজ দেখে, তার কর্তব্য হল শক্তি দ্বারা সে অন্যায়কে রুখে দাড়ানো, যদি এ শক্তি না থাকে তবে কর্তব্য হল মৌখিক প্রতিবাদ করা। যদি এ শক্তিও না থাকে, তবে অন্তরে মন্দকে মন্দ জান। আর মনের মধ্যে এ ধারণা পোষণ করা যে, যখনই সে শক্তি লাভ করবে তখনই এ অন্যায়কে বাঁধা দেবে। আর এটিই হল দুর্বল ঈমানের পরিচয়"।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ

আর ইহুদীরা বলেছে আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে।

## আল্লাহ পাকের শানে ইহুদীদের বেয়াদবী

ইহুদীদের অনাচার, পাপাচার ও দৌরাত্ম এত বেড়ে গিয়েছিলো এবং তাদের মন এত কালিমা লিপ্ত হয়েছিলো যে, তারা স্বয়ং আল্লাহ পাকের শানে বেয়াদবী করতেও

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৩২

দ্বিধাবোধ করত না। আল্লাহ্ পাকের শানে তারা এমন এমন আপত্তিকর মন্তব্য করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত, যা শ্রবণ করলে ভীত-সন্ত্রস্ত হতে হয়। যেমন তারা বলত পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ

"আল্লাহ্ গরীব, আমরা ধনী (নাউযুবিল্লাহ্)"। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে রয়েছে, তারা বলেছে আল্লাহ্র হাত বন্ধ হয়ে গেছে। হয় তাঁর ধন-সম্পদ শেষ হয়ে গেছে অথবা তিনি কার্পণ্য করছেন। এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির কারণেই ইহুদীদেরকে আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হতে হয়েছে, তারা হয়েছে অভিশপ্ত।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), একরামা, যাহ্যাক এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেন, ইহুদীরা ছিল অত্যন্ত ধন-সম্পদশালী, আল্লাহ পাক তাদেরকে অগাধ ধন-সম্পদ দিয়েছিলেন, কিন্তু যখন তারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হল, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপনে অস্বীকৃতি জানালো, তখন আল্লাহ্ পাক তাদের সমৃদ্ধিকে দারিদ্র্যে পরিবর্তন করলেন, এমন অবস্থায় তাদের একান্ত কর্তব্য ছিল আত্মসংশোধনে সচেষ্ট হওয়া, অন্যায় অনাচার, পাপাচার পরিহার করা এবং লজ্জিত, অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তওবা করা এবং আল্লাহ পাকের দান লাভের জন্যে বিনীত ভাবে আরজী পেশ করা।

কিন্তু তারা সঠিক পথ পরিহার করে আরো বাড়াবাড়ি করতে লাগল, ন্যায়-নীতির সকল সীমা লঙ্ঘন করে আল্লাহ পাকের শানে বেয়াদবী করল এবং (আল্লাহ্র হাত বন্ধ) তথা আল্লাহ পাক বখীল (নাউজুবিল্লাহ) বলতে লাগল। তারই শাস্তিস্বরূপ তাদের উপর আল্লাহর গজব পতিত হলো। তাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটল।

## শানে নুযুল

বনী কিনকা গোত্রের সর্দার ফোখাজ এবনে আজুরা বলেছিলো, আল্লাহ্র হাত বন্ধ হয়ে গেছে (নাউজুবিল্লাহ)। এবনে হাব্বান তাঁর তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

তেবরানী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি এভাবে দিয়েছেন যে, এক অভিশপ্ত ইহুদী, যার নাম ছিল নাব্বাস এবনে কায়েস, সে এ কথাটি বলেছে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

তত্ত্বজ্ঞানী আলেমগণ লিখেছেন, এ আপত্তিকর কথাটি ফোখাজ বা নাব্বাস যে-ই বলুক না কেন, যারা একথা থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হয়নি এবং এ কথায় রাজী ছিল, তারা সকলেই এ অন্যায় উক্তিতে শরীক হয়েছে এবং তাদের শাস্তি অবধারিত।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এ অভিশপ্ত লোকটিই একবার বলেছিল আল্লাহ্ দরিদ্র, আমরা ধনী (নাঊজুবিল্লাহ মিন জালেক)। হযরত আবু বকর (রাঃ) তার এ বেয়াদবীপূর্ণ উক্তির জন্যে তাকে প্রহার করেছিলেন।[১]

এখানে উল্লেখ্য, হাত বন্ধ থাকার অর্থ হলো কৃপণতা, আর হাত খোলা রাখার অর্থ হলো বদান্যতা।

غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا

দূরাত্মা ইহুদীদের ঐ ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্যের জবাবে এরশাদ হয়েছে– এমন আপত্তিকর উক্তির কারণে তাদেরই হাত বন্ধ হোক এবং তাদের উপর লা'নত বর্ষিত হোক। এর অর্থ তারা দারিদ্র্যের কষ্ট ভোগ করুক। দুনিয়াতে তারা বন্দী হোক এবং আখেরাতে দোযখের জিঞ্জিরে আবদ্ধ হোক।

বস্তুতঃ হতভাগা ইহুদীরা আল্লাহ্র বিধি-নিষেধ অমান্য করে এবং আল্লাহ্র নবী–রসূলগণের আদর্শ বর্জন করা সত্ত্বেও এ ধারণা করেছিল যে, যেহেতু আমরা পয়গম্বরের বংশধর তাই আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় হবে না কিন্তু বাস্তব বড় কঠোর, আল্লাহ্ পাকের দরবারে ঈমান ও আমলের মর্যাদা, তাকওয়া পরহেযগারীর মর্যাদা। যেহেতু ইহুদীরা ঈমান ও নেক আমল, তাকওয়া পরহেযগারী থেকে ছিল বঞ্চিত, দুষ্কৃতি ও দৌরাত্ম ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য। তাই তারা হয়েছে আল্লাহ্র কোপগ্রস্ত। দারিদ্র্য, ক্ষুধা হলো তাদের ভাগ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই নির্বোধেরা বলে উঠল, আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে, তাঁর নেয়ামত ফুরিয়ে গেছে।

মূলতঃ আল্লাহর হাত বন্ধ হয়নি; বরং তাদের সৌভাগ্যের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। তাদেরকে আল্লাহ পাক অনন্ত অসীম নেয়ামত দান করেছিলেন, কিন্তু তারা এ নেয়ামত লাভ সত্ত্বেও আল্লাহ্র অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছে। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (সূরা বাকারাহ)

"হে বনী ইসরাঈল জাতি! তোমরা স্মরণ কর আমার নেয়ামতকে, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি এবং তোমাদেরকে আমি বিশ্ববাসীর উপর বিশেষ মর্যাদায় আসীন করেছি"। হতভাগা বনী ইসরাঈল জাতি আল্লাহ্ পাকের সে সব নেয়ামতের

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৬ খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১০৯
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৩২
খোলাসাতুত তাফাসীর খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৩১
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭৩

কথা ভুলে গেছে এবং আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহ্বানে সাড়া দেয়নি এমনকি, তাঁর বিরুদ্ধে নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করেছে, তদুপরি স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের শানে বেয়াদবী করেছে, তাই আল্লাহ্র গজব তাদের উপর পতিত হয়েছে। আর এজন্যে তারা নিজেরাই দায়ী।

غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ

এ কথাটি বদদোয়ার আকারে তাদের ব্যাপারে এক ভবিষ্যদ্বাণী। অর্থাৎ তাদের হাত বন্ধ হয়ে যাক। আল্লাহ পাকের এ বাণী সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্যাপারে কার্যকর হয়েছে। তাদের কাপুরুষতা এবং কৃপণতা সর্বজনবিদিত, স্বীকৃত এবং নিন্দিত ঃ

بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ

অর্থাৎ (আল্লাহ্র হাত আদৌ বন্ধ নয়) বরং তাঁর হাত চির উন্মুক্ত, চির প্রশস্ত।

## আল্লাহর হাত

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর হাত বলে যে কথাটি বলা হয়েছে তার প্রকৃত তাৎপর্য আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ জানেনা। আমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাক যা বলেছেন তা মেনে নেয়া এবং ঈমান আনা। কেউ যেন কোন অবস্থাতেই একথা মনে না করে যে, মানুষের হাতের মত হয়ত আল্লাহরও হাত আছে, কেননা আল্লাহ পাক এসব কিছু থেকেই পবিত্র। প্রকৃত অবস্থা এই– যিনি যেমন, তার সব কিছুই তেমন হবে, তাতে এতটুকুও ব্যতিক্রম হবেনা। তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, যেভাবে আল্লাহ পাকের পবিত্র অস্তিত্ব, তাঁর মহান জ্ঞান, তাঁর দেখা-শোনা তথা যাবতীয় গুণাবলীর কোন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা যায়না। এভাবে বুদ্ধি বিবেচনা দ্বারা তাঁর গুণাবলী সম্পর্কেও ধারণা করা যায় না এবং ভাষায় তা প্রকাশও করা যায় না, কেননা তাঁর পবিত্র সত্ত্বা, তাঁর যাবতীয় গুণাবলী, মানুষের বর্ণনা শক্তির অনেক ঊর্ধ্বে।

শাহ আবদুল কাদের (রঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে (দু' হাত) শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, দু' হাত তথা আল্লাহর রহমত এবং গজব, দয়া এবং ক্রোধ। উম্মতে মোহাম্মদীয়ার প্রতি রহমত এবং করুণা প্রসারিত হয়েছে আর গজব এবং ক্রোধ প্রসারিত হয়েছে বনী ইসরাঈলের প্রতি।

তবে তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ পর্যায়ে অনেক আলোচনার পর বলেছেনঃ

ليس كمثله شئ وهو السميع العليم

তাঁর কোন দৃষ্টান্তই নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ

بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ

এ বাক্যটির অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক ভাল, মন্দ উভয়কেই দান করতে থাকেন।[১]

يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ

অর্থাৎ– তিনি তাঁর ইচ্ছা মাফিক ব্যয় করে থাকেন, যেহেতু তিনি হাকীম, মহাজ্ঞানী, তাই কার জন্যে কতটুকু ব্যয় করা উচিত এবং কে কতটুকু যোগ্য- এসব বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই সর্বাধিক।

আমরা পৃথিবীতে অহরহ যা দেখি তা হলো– কখনো নিতান্ত বিশ্বস্ত, একান্ত অনুগত প্রিয় বন্দাকেও পরীক্ষা করার নিমিত্তে অথবা সংশোধনের লক্ষ্যে তিনি চরম দুঃখ–দুর্দশায় নিপতিত করেন। হযরত আইয়ুব (আঃ) কুষ্ঠ রোগ ভোগ করেছেন সুদীর্ঘ ১৮ বছর। হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে অবস্থান করেছেন ৪০ দিন যাবত। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-কে সুদীর্ঘ ৪০ বছর যাবত তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র ইউসুফ (আঃ)-এর বিরহ জ্বালা সইতে হয়েছে। আর হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে সুদীর্ঘ ৭ বছর কারাগারে বন্দী থাকতে হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে নমরুদের অগ্নিকুন্ডে প্রবেশ করতে হয়েছে এবং তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে (আঃ) জবেহ করতে উদ্যত হতে হয়েছে। আর কিশোর ইসমাঈলকে (আঃ) জবেহ হবার জন্যে প্রস্তুত হতে হয়েছে। এমনি অগণিত দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। এসবই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জির ব্যাপার। তাঁর প্রিয়জনদের তিনি পরীক্ষা করেছেন যুগে যুগে।

পক্ষান্তরে, ফেরাউন, নমরুদ, শাদ্দাদ, কারুণ গংকে তিনি দুনিয়ার ক্ষমতা এবং সম্পদ দান করেছেন। তাদের মত দূরাত্মা দুর্বত্তরাও আল্লাহর নেয়ামত, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য লাভ করেছে।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, পার্থিব সুখ-সম্পদ বা বিপদাপদের কারণে কাউকে আল্লাহর প্রিয় বা অপ্রিয় বলে বিচার করা যায় না।

আমরা একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি। পবিত্র কোরআনে চোরের হাত কেটে ফেলার হুকুম রয়েছে। বিচারক চোরের হাত কেটে ফেলার আদেশ দেন, যথারীতি হাত কেটে ফেলা হয়। অন্যদিকে কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক কারো হাতে ক্যান্সার হলে তার

১। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৯৭

হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। একজনের হাত কাটা হয় শাস্তিস্বরূপ, আরেকজনের হাত কাটার মধ্যেই থাকে তার জন্যে রহমত। অতএব, কাজ এক হলেও উদ্দেশ্য এক থাকে না।

এজন্যেই আমরা অনেক ক্ষেত্রে অনেক নেককার লোককেও দারিদ্র্যের কষাঘাতে কাবু হতে দেখি, আর অনেক পাপীষ্ঠকে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে আত্মহারা অবস্থায় দেখি। একজনকে এখানে দারিদ্র্যের কষ্টের বিনিময়ে পরকারের চির শান্তি দানের উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। আর অন্য জনকে সমৃদ্ধি দান করে তার পাপের পাত্র পরিপূর্ণ করে পরকালীন জিন্দেগীর শাস্তির যোগ্য করে তোলা হয়। এসব কাজ আমরা অহরহ দেখি। কিন্তু এর রহস্য বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই।

অতএব, মোমেনের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের মহান দরবারে পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা। তাঁর বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা। তিনি যে অবস্থায় রাখেন, সে অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা। নেয়ামত পেলে শোকর গুজার হওয়া। আর কোন ব্যাপারে কষ্ট হলে সন্তুষ্টচিত্তে সবর অবলম্বন করা।

وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا

অর্থাৎ– (হে রসূল!) আপনার নিকট যে কোরআন নাযিল হয়েছে তা দ্বারা এ হতভাগারা উপকৃত হওয়া তো দূরের কথা, বরং তাদের অবাধ্যতা এবং নাফরমানী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। আল্লাহ পাকের পবিত্র কালাম শ্রবণ করে তারা হেদায়েতের আলো লাভ করার স্থলে তার বিরোধিতা করে। পরিণামে তাদের নাফরমানী বেড়ে যায়। উত্তম সুখাদ্য স্বাস্থ্যবান লোকের স্বাস্থ্যকে আরো বাড়ায় কিন্তু কোন রুগ্ন ব্যক্তি যদি ঐ সুখাদ্য গ্রহণ করে তবে তার রোগ বৃদ্ধি পায়।

বলাবাহুল্য তা খাবারের দোষে নয়; বরং রোগীর হজম শক্তির অভাবেই তা হয়। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ পবিত্র কোরআনের একখানি আয়াত নাযিল হত আর কাফেররা তা অস্বীকার করত, এভাবে তাদের কুফরী ও নাফরমানী বৃদ্ধি পেতে থাকত, কেননা তারা আত্মসংশোধনের পথ সর্বদা পরিহার করে চলত। ফলে তাদের দৌরাত্ম এবং অনাচার বৃদ্ধি পেত।

وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানরা আহলে কিতাব হওয়া সত্ত্বেও এবং তাদের কিতাবে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলীর উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও তারা তার বিরোধিতা করে। তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ইসলাম এবং মুসলমানের বিরুদ্ধে তারা অনেক চক্রান্ত করতে থাকে, তাই

আল্লাহ পাক তাদের শাস্তি স্বরূপ এ আয়াতে ঘোষণা করেছেন ঃ আমি এ ইহুদী এবং খৃষ্টানদের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা এবং কলহ–দ্বন্দ্ব রেখে দিয়েছি। তাদের এ অবস্থা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

হাসান (রঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের কথা বলা হয়েছে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ আয়াতে ইহুদীদের বিভিন্ন ফেরকার দলাদলি ও শত্রুতার কথা বলা হয়েছে।

كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ

(যখনই তারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করে, আল্লাহ পাক তাদের সে প্রজ্বলিত অগ্নিকে নিষ্প্রভ করে দেন।)

হযরত হাসান (রঃ) এ আয়াতের এ অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, ইহুদীরা যখনই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা করত এবং তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত, আল্লাহ পাক তাদের মধ্যে অর্ন্তবিরোধ সৃষ্টি করে তাদের ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে দিতেন। আর এভাবে তিনি তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করতেন।

وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا

এ দূরাত্মা ইহুদীরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করত, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত এবং তাদের গ্রন্থে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে তা গোপন করার চেষ্টা করত। লড়াই, ঝগড়া, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রই ছিল তাদের নিত্য দিনের কাজ। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক অশান্তি সৃষ্টিকারীদের আদৌ পছন্দ করেন না। এজন্যেই তিনি তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। দুনিয়াতে তাদের অবমাননা এবং আখেরাতে তাদের কঠিন শাস্তি অবধারিত।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রঃ) লিখেছেন, এতে একথা প্রমাণিত হয়– মুসলিম জাতি যতদিন ঐক্যবদ্ধ থাকবে, সত্য পথের অনুসারী থাকবে, অন্যায়-অনাচার এবং অশান্তি থেকে আত্মরক্ষা করে চলবে যেমন ইতিপূর্বে সাহাবায়ে কেরামের এ গুণাবলী ছিল, ততদিন পর্যন্ত ইহুদী, খৃষ্টান বা অন্য কোন অপশক্তি মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে সক্ষম হবেনা। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের যাবতীয় অপচেষ্টা ব্যর্থ হবে।[১]

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-১৫৩

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا
عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا
التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ
فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ط وَكَثِيْرٌ
مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٦﴾

তরজমা

(৬৫) এবং যদি এ আহলে কিতাবরা ঈমান আনত এবং আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করত তবে অবশ্যই আমি তাদের গুনাহ মাফ করতাম এবং তাদেরকে শান্তিময় বেহেশ্‌তে প্রবেশাধিকার দান করতাম।

(৬৬) এবং যদি এ আহলে কিতাবরা সঠিকভাবে বজায় রাখত তৌরাত, ইঞ্জিল এবং সেই কিতাব (পবিত্র কোরআন) যা তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে তাদের নিকট অবতীর্ণ হয়েছে, তবে নিশ্চয় তারা সুখাদ্য ভোগ করতে পারত তাদের উপর থেকে এবং পায়ের তলা থেকে। তাদের মধ্যে কিছু লোক সঠিক পথে রয়েছে, আর তাদের অনেক লোকই মন্দ কাজে লিপ্ত রয়েছে।

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টানদের কুকীর্তির বিবরণ এবং তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে তাদেরকে শেষ বারের মত ক্ষমা লাভের সুযোগের সদ্ব্যবহারের আহ্বান জানানো হয়েছে। তারা অতীতে যা করেছে তা সত্ত্বেও যদি এ সুযোগ গ্রহণ করে, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃত অন্যায়ের জন্যে তওবা করে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ মেনে চলে আর নিজেদের নির্বুদ্ধিতার কারণে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতো তা পরিহার করে চলে, তবে আল্লাহ পাক তাদের গুনাহ মাফ করবেন, তাদেরকে ইহজগত ও পরজগতে নেয়ামত দান করবেন। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا

যদি এ আহলে কিতাবরা তাদের কুকীর্তি পরিহার করে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং পবিত্র কোরআনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরহেযগারী অবলম্বন করে, তবে আমি তাদের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেব।

## পবিত্র কোরআনের ঘোষণার বাস্তবায়ন

পবিত্র কোরআনের এ ঘোষণা মোতাবেক বহু বড় বড় অপাধীকে আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাকের করুণা-ধন্য হয়ে ইসলামের অনেক দুশমন পরবর্তীতে ইসলামের অনেক খেদমত করেছেন। তাদের নামের ফিরিস্তি অনেক সুদীর্ঘ। আমরা এ পর্যায়ে দু' একটি নামের উল্লেখ করতে পারি।

হযরত খালেদ এবনে ওয়ালিদ (রাঃ) দ্বারা তৃতীয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত ওহোদের যুদ্ধে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রভূত ক্ষতি সাধন হয়েছিলো। সপ্তম হিজরীতে তিনি ইসলাম কবুল করেন। এরপর ইসলামের যে বিরাট খেদমত করেছেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। ওহোদ এবং খন্দকের যুদ্ধ সহ অন্যান্য যুদ্ধে কাফেরদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আবু সুফিয়ান। অষ্টম হিজরীতে অনুষ্ঠিত মক্কা বিজয়ের দিন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে ক্ষমা করেন এবং তিনি ইসলাম কবুল করেন।

ওহোদের যুদ্ধে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চাচা আমীরে হামজা (রাঃ)-কে যে হত্যা করেছিল, তার নাম ছিল ওয়াহশী। পরবর্তীতে এ ওয়াহশীও কৃত অন্যায় থেকে তওবা করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে পত্র প্রেরণ করলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে ক্ষমা করেন এবং তিনি ইসলাম কবূল করেন। আর হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফতের সময় ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি একটি বিরাট কাজ করেছিলেন, সে কাজটি হলো নবুওয়্যতের মিথ্যা দাবীদার মুসায়লামাতুল কাজ্জাবকে তিনি হত্যা করেন। এভাবে তিনি ইসলামের বিশেষ খেদমত করেন।

## ইসলাম ক্ষমা ও ঔদার্যের ধর্ম

ইসলাম হলো ক্ষমা ও ঔদার্য্যের ধর্ম। উদারতা মহানুভবতা ইসলামের বৈশিষ্ট্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান ক্ষমা-সুন্দর আদর্শের বিশাল ছায়াতলে বহু মহা পাপীকে, এমনকি অনেক প্রাণের শত্রুকেও তিনি স্থান দিয়েছেন। যারা ইসলাম কবুল করে ইসলামের প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় অমর অবদান রেখেছেন, ইতিহাসে এর অনেক প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

তাই আলোচ্য আয়াতে আহলে কিতাবদেরকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়নের আহ্বান জানিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ যদি তারা

ঈমান আনে পবিত্র কোরআনের প্রতি, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, তবে তাদের গুনাহ মাফ করা হবে–

وَلَأَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ

"এবং তাদেরকে চিরশান্তি নিকেতন জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ জান্নাতে প্রবেশের সর্বপ্রথম শর্ত হলো আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ শপথ সেই আল্লাহ পাকের! যাঁর কুদরতী হাতে রয়েছে মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) প্রাণ, "যে ইহুদী এবং খৃষ্টান আমার রেসালতের খবর শ্রবণ করে এবং সে বিষয়ের প্রতি ঈমান না আনে, যা দিয়ে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে আর এ অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয় তবে সে অবশ্যই দোযখী হবে"। এই হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) হযরত আমর এবনুল আস (রাঃ)-এর ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরজ করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! দয়া করে আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, আমি বয়আত করব। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। তখন আমি আমার হাত টেনে নিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমর কি হলো?

আরজ করলামঃ আমি একটি শর্ত পেশ করতে চাই। কি শর্ত পেশ করতে চাও বল? আমি আরজ করলামঃ আমি ইসলাম কবুল করব এ শর্তে যে, আমার পূর্বে কৃত গুনাহ সমূহ মাফ করা হবে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আমর তুমি কি জাননা? ইসলাম কবুল করলে পূর্বে কৃত গুনাহ সমূহ মাফ হয়ে যায়। এমনিভাবে হিজরত করলে হিজরতের পূর্বের, হজ্ব করলে হজ্বের পূর্বের গুনাহ সমূহ মাফ হয়।[১] (মুসলিম শরীফ)

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ

অর্থাৎ– যদি আহলে কিতাবরা তৌরাত এবং ইঞ্জিলের প্রতিষ্ঠায় সত্যিকারভাবে আত্মনিয়োগ করত, তথা তাতে বর্ণিত বিধি-নিষেধ পালন করত এবং তাতে কোন পরিবর্তন না করত এবং তৌরাত ইঞ্জিলের কোন বিধান গোপন না করত, তন্মধ্যে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৩৬-৩৭

একটি হুকুম ছিল সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনা। আর তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে যে কিতাব নাযিল হয়েছে তা-ও যদি তারা মেনে চলত, তবে–

لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ

"তারা উত্তম রিয্ক ভোগ করতে পারত তাদের উপর থেকে এবং তাদের পায়ের নীচ থেকে"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, উপর থেকে তথা আসমান থেকে বৃষ্টিপাত হতো এবং পায়ের নীচ থেকে অর্থাৎ জমিন শস্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ হতো।

এর তাৎপর্য হলো যদি আহলে কিতাবরা আল্লাহ পাক ও তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং পবিত্র কোরআন সহ অন্যান্য সকল আসমানী কিতাব সমূহ মেনে চলত, তবে আল্লাহ পাক তাদের জন্যে আসমান জমীনের বরকত সমূহ উন্মুক্ত করে দিতেন। তাদের অন্যায় আচরণের কারণে তারা বর্তমানে দারিদ্র্যের কষাঘাতে যে কষ্ট পাচ্ছে তা দূর করা হতো।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে আহলে কিতাবরা যদি আত্মসংশোধন করে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং পবিত্র কোরআনের প্রতি বিশ্বাস করে, আর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যদি তারা তৌরাত ও ইঞ্জিল প্রতিষ্ঠা করে, এর তাৎপর্য কি? কেননা, পবিত্র কোরআনে বিশ্বাস করলে তৌরাত, ইঞ্জিল প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ কোথায়?

তফসীরকারগণ এর জবাব দিয়েছেনঃ তৌরাত ইঞ্জিল প্রতিষ্ঠা করার অর্থই হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করা, পবিত্র কোরআনকে মেনে চলা, কেননা তৌরাত, ইঞ্জিলে এ নির্দেশ রয়েছে, যদি তারা তৌরাত, ইঞ্জিলের মর্মবাণীকে প্রতিষ্ঠা করে, তবে তাদেরকে অবশ্যই পবিত্র কোরআন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মেনে চলতে হবে। আর এমনি অবস্থায় আল্লাহর রহমতের দ্বার তাদের জন্যে হবে উন্মুক্ত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যারা আল্লাহ পাকের ক্ষমা ঘোষণার এ সুযোগ গ্রহণ করে, তাদের সংখ্যা অতি সামান্য। যেমন হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) এবং তাঁর কয়েকজন ভাগ্যবান সঙ্গী। তাঁদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক পরবর্তী বাক্যে এরশাদ করেছেনঃ

مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ

তাদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে সঠিক পথে অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে যারা ইসলাম কবুল করেছে, কিন্তু وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُوْنَ তাদের অনেক লোকই

মন্দ এবং নিন্দনীয় কাজে লিপ্ত। সত্য ধর্ম ইসলামের বিরোধিতা করা, আল্লাহর কিতাবে পরিবর্তন করা, আল্লাহর রসূলের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা– এসবই ছিল তাদের অধিকাংশ লোকের বৈশিষ্ট্য।

## যারা নাজাত লাভে ধন্য হবে

এ পর্যায়ে তফসীরকারকগণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বলেছেনঃ মূসা (আঃ)-এর উম্মতের মধ্যে ৭১টি ফেরকা হয়েছে, তন্মধ্যে একটি ফেরকা জান্নাতে যাবে আর অবশিষ্ট ৭০টি ফেরকা দোযখী হবে। ঈসা (আঃ)-এর উম্মতে ৭২টি ফেরকা হয়েছে, তম্মধ্যে একটি ফেরকা বেহেশতে যাবে। আর বাকী ৭১টি ফেরকা দোযখে যাবে আর আমার উম্মত তাদের থেকে বেড়ে যাবে অর্থাৎ ৭৩ ফেরকা হবে। তম্মধ্যে এক ফেরকা জান্নাতে যাবে, আর বাকী ফেরকা সমূহ দোযখে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ কোন্ ফেরকা বেহেশতে যাবে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

ما انا عليه واصحابى

অর্থাৎ– যারা আমার এবং আমার সাহাবাদের অনুসারী হবে। হক্কানী ওলামায়ে কেরাম এ সম্পর্কে একমত যে, তারা হলেন আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত। এজন্যে একটি বর্ণনায় রয়েছে জামায়াত, তথা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত।

এই হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী ইয়াকুব এবনে যায়েদ বলেছেনঃ হযরত আলী (রাঃ) যখন এ হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন তিনি আলোচ্য আয়াত– وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ। থেকে سَاءَ مَا يَعْمَلُوْنَ পর্যন্ত তেলাওয়াত করতেন।

বর্ণনাকারী বলেনঃ আমার মতে নাজাত সে দলই পাবে, যারা আল্লাহ্‌র কিতাব পবিত্র কোরআনকে আঁকড়ে ধরে রাখবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন বলেনঃ এ অবস্থা তখন হবে, যখন এলম বিদায় নেবে তখন যিয়াদ এবনে লবিদ বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! এলম কিভাবে বিদায় নেবে? আমরা কোরআন পাঠ করি এবং আমাদের সন্তানদেরকে কোরআন শিক্ষা দেই, তারা তাদের সন্তানদের শিক্ষা দেবে। এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ হে এবনে লবিদ! আমি তোমাকে মদীনার বুদ্ধিমান লোকদের মধ্যে মনে করতাম। এ ইহুদী

খৃষ্টানরা তৌরাত, ইঞ্জিল পাঠ করেনা? কিন্তু তৌরাত ইঞ্জিলের মধ্যে যে হেদায়েত রয়েছে, তা দ্বারা তারা উপকৃত হয় না।[১]

অর্থাৎ– এমনিভাবে শেষ যমানায় পবিত্র কোরআন পাঠ করা হবে, কিন্তু তার মর্মবাণী উপলব্ধি করে পবিত্র কোরআনের হেদায়েত মোতাবেক জীবন যাপন করা হবে না। এটিই হলো বর্তমান যুগের মুসলিম জাতির দূর্গতির মূল কারণ।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ
مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ
مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٦٧﴾ قُلْ يَٰٓأَهْلَ
ٱلْكِتَٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ
أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ
مِن رَّبِّكَ طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٦٨﴾

তরজমা

(৬৭) হে রসূল! আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা পৌঁছে দিন। আর যদি তা না করেন তবে আপনি আল্লাহ তায়ালার পয়গাম পৌঁছাবার দায়িত্ব পালন করলেন না। এবং আল্লাহ পাকই আপনাকে মানুষের জুলুম অত্যাচার থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কাফের জাতিকে পথ প্রদর্শন করেন না।

(৬৮) (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, তোমরা কোন (সৎ) পথেই নেই, যতক্ষণ তোমরা তৌরাত ইঞ্জিলকে এবং তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে অবতীর্ণ কিতাবকে (পবিত্র কোরআনকে বাস্তব জীবনে) প্রতিষ্ঠা না কর। (হে রসূল!) আপনার নিকট আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা এদের মধ্যে অনেকেরই নাফরমানী এবং কুফরী বৃদ্ধি করবে। অতএব, এ কাফেরদের জন্যে আফসোস করবেন না।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৩৫
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-৬ খন্ড-৭ পৃষ্ঠা-১১০

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের কুকীর্তি এবং তাদের শাস্তির বিবরণ রয়েছে। এরপর তাদেরকে তওবা করে ঈমান আনয়নের আহ্বান জানানো হয়েছে। আর এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দ্বীন ইসলামের তবলীগে অক্লান্ত সাধনার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যেহেতু মক্কার কোরায়শদের নৃশংস অত্যাচার-নির্যাতনের কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রথম তিন বছর গোপনে ইসলাম প্রচার করতেন, তাই এ আয়াতে প্রকাশ্যেই ইসলাম প্রচারের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলাম প্রচারের এটিই প্রথম নির্দেশ। মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যে প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং যে অকথ্য নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল তা সর্বজনবিদিত এবং ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। ঐ কঠিন এবং ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ইসলামের প্রচার স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত কঠিন ছিল, আর কাফেরদের জুলুম অত্যাচারের ভয় তো বাস্তব সত্য ছিল। তাই আল্লাহ পাক পরবর্তী বাক্যে এ নিশ্চয়তা বিধান করেছেন যে, (হে রসূল!) কাফেররা আপনার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, কেননা আল্লাহ পাক আপনার হেফাজত করবেন। আপনার দায়িত্ব হলো মানুষের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া। আপনি এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করুন। কাফেরদের ভয়-ভীতি নিতান্ত অবান্তর, কেননা আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ পাক গ্রহণ করেছেন।

### শানে নুযুল

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ আমাকে তাঁর মহান বাণী দিয়ে প্রেরণ করেছেন। আমি এ আশঙ্কা করেছি হয়ত মানুষ আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করবে। তখন আল্লাহ পাক এ পয়গাম প্রেরণ করেছেন যে, আমার বাণী মানুষের নিকট পৌঁছান, অন্যথায় আপনাকে শাস্তি প্রদান করবো, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ

(হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা মানুষের নিকট পৌঁছে দিন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৩৭

মসরুক (রঃ) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি তোমাদের একথা বলে যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট আল্লাহ পাকের যে বাণী অবতীর্ণ হয়েছে তা থেকে কিছু তিনি গোপন রেখেছেন, তবে সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। আর তার প্রমাণ এ আয়াত।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে রজম এবং কেসাসের কথা প্রচারের আদেশ রয়েছে যা ইহুদীদের ঘটনায় নাযিল হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার একথাও বলেছেন, আলোচ্য আয়াত হযরত জয়নব বিনতে জাহ্যাস (রাঃ) এবং তাঁর বিয়ে সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

অন্য এক দল তফসীরকারের মতে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে জেহাদ সম্পর্কে। কেননা, যখন জেহাদের হুকুম নাযিল হয় তখন মুনাফেকরা তা অপছন্দ করে। এ পর্যায়ে পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

فاذا انزلت سورة محكمة

অর্থাৎ– যখন কোন মজবুত সূরা নাযিল হয় তখন আপনি দেখবেন যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে তারা আপনার দিকে এভাবে তাকায় যেন মৃত্যু ভয়ে তারা অজ্ঞান হয়েছে। এমনকি, কোন কোন মুসলমানও জেহাদের এ আদেশকে কঠিন মনে করেছেন। আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে তখন এরশাদ করেছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ

যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উপলব্ধি করলেন যে, জেহাদের আদেশে কিছু লোকের মন অসন্তুষ্ট, তখন তিনি জেহাদ সম্পর্কে মানুষকে অনুপ্রাণিত করার ব্যাপারে কিছু দিন বিরত রইলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

আরও একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, ইহুদীরা দ্বীন ইসলামের প্রতি উপহাস করতো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে নীরবতা পালন করলে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যখন এ আয়াত নাযিল হয়–

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নীরবতা পালন করলে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, জাতুররেকার যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে এক কাফের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একা পেয়ে হামলায় উদ্দত হয় এবং জিজ্ঞাসা করে আপনাকে এখন কে রক্ষা করবে? তিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে বললেনঃ "আল্লাহ"। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হামলাকারী দুশমনের দেহে কম্পনের সৃষ্টি হয়। তার হাত থেকে তরবারি পড়ে যায়। আল্লাহ পাক কার্যতঃ একথা প্রকাশ করেন যে, তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেফাজত করছেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনে ক্ষণিকের জন্যেও কোন ত্রুটি করেননি; বরং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান পূতঃপবিত্র জীবনে দ্বীন ইসলামের প্রচারে তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষা, তাঁর কৃচ্ছ সাধনা, তাঁর মনের দৃঢ়তা এবং নিষ্ঠা, অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনা শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য।

যখন তিনি মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় আল্লাহর দ্বীন প্রচার শুরু করেন তখন সারা আরব তাঁর দুশমন হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর ভরসা ছিল এক আল্লাহ পাকের প্রতি। তাই সুদীর্ঘ ১৩টি বছর যাবত অত্যাচারিত-উৎপীড়িত থেকেও দ্বীন ইসলামের তবলীগ তিনি অব্যাহত রেখেছেন। অবশেষে আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক তাঁকে মক্কায়ে মোয়াজ্জমা থেকে মদীনা মোনাওয়্যারা হিজরত করতে হয়।

আলোচ্য আয়াত তাঁর মহান দায়িত্ব পালনে তাঁকে অধিকতর সচেষ্ট করেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। এ নির্দেশ লাভের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়েছেন সবার কাছে, সর্বাবস্থায়। তাঁর এন্তেকালের মাত্র ৮০ দিন পূর্বে বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক দিনে তিনি আরফার ময়দানে সমবেত লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ আমি কি তোমাদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়েছি?

উপস্থিত সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম সমবেত কণ্ঠে জবাব দিয়েছেন, হ্যাঁ। অবশ্যই আপনি আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। তখন তিনি বলেছিলেনঃ হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। আমি তোমার আমানত পৌঁছে দিয়েছি।

এবনে আবি হাতেম মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের দরবারে এ আরজী পেশ করলেনঃ ওগো আমার প্রতিপালক! আমি কি ব্যবস্থা করবো?

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৩৭-৩৮
তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৩৯

আমি যে একা, এসব লোক আমার বিরুদ্ধে একত্রিত হবে। তখন আল্লাহ্ পাক নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন ঃ

وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ

(হে রসূল!) যদি আপনার নিকট প্রেরিত সকল বাণী আপনি মানুষের নিকট না পৌঁছান তবে যে আপনি আল্লাহর বাণী পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করেননি, অর্থাৎ– যদি আপনি আল্লাহর সমস্ত হুকুম না পৌঁছান, কিছু হুকুম পৌঁছানোর ব্যাপারে বিরত থাকেন তাতে যেন আপনি আল্লাহর কোন বাণীই পৌঁছাননি। কেননা, কোন বিষয়ের একাংশ গোপন রেখে অন্য অংশ প্রকাশ করলে প্রকাশিত অংশ অকার্যকর। যেমন নামাজের কিছু আরকান আদায় করলে পূর্ণ নামাজই অকার্যকর হয়।

ঠিক এভাবে আল্লাহ্ পাকের বিধানের কোন অংশ যদি গোপন রাখা হয় তবে মানুষ সে অংশের প্রতি আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ বিষয় বলে তা মানবেও না। এভাবে আল্লাহর বাণীর কিছু অংশ মানুষ অস্বীকার করবে। যেমন ইহুদীরা বলতো আমরা কিছু অংশ মানি, আর কিছু অংশ মানি না। আর পবিত্র কোরআনের আলোকে ইহুদীদের এমন ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। এতদ্ব্যতীত, এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ্ পাকের বাণীর কিছু অংশ গোপন রাখা হলে তা আল্লাহর আযাবের কারণ হয়। যেমন আল্লাহর সমস্ত বাণীকে গোপন রাখলে তা আল্লাহর আযাবকে ডেকে আনে।[১]

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

অর্থাৎ– আল্লাহ্ পাক আপনাকে মানুষ থেকে হেফাজত করবেন। অতএব, আপনি নিঃশঙ্ক চিত্তে আল্লাহর দ্বীনের প্রচার করতে থাকুন। আপনি একা থাকলেও কেউ আপনাকে হত্যা করতে পারবেনা।

তিরমিজী শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনা সংকলিত হয়েছে। তিনি বলেছেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তাঁবু প্রহরা দেয়া হতো। কিন্তু যখন এ আয়াত নাযিল হলো তখন তিনি প্রহরার ব্যবস্থা তুলে দেন। তাঁবু থেকে মাথা মোবারক বের করে প্রহরায় রত সাহাবায়ে কেরামকে ডেকে এরশাদ করেনঃ হে লোক সকল! তোমরা চলে যাও, আল্লাহ্ পাক আমার হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন।

বোখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি রয়েছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিরাপত্তার স্বার্থে জাগ্রত থাকতেন, যখন

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৩৮

তিনি মদীনা মোনাওয়্যারা তশরিফ আনলেন তখন বললেন, যদি আমার বন্ধুদের কেউ আজ রাত আমার প্রহরায় রত হতো তবে ভাল হতো। ঠিক এমন সময়, আমরা হাতিয়ারের শব্দ শ্রবণ করি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ কে? অপর প্রান্ত থেকে শব্দ শ্রুত হলো আমি সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস। আমি হুজুরের প্রহরায় রত হওয়ার জন্যে হাযির হয়েছি। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিদ্রিত হলেন।

তেবরানী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেনঃ যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিরাপত্তার ব্যাপারে কর্তব্যরত থাকতেন তাদের মধ্যে তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ)-ও ছিলেন। এরপর যখন এ আয়াত নাযিল হলো (অর্থাৎ (হে রসূল!) আল্লাহ পাক আপনাকে মানুষের হামলা থেকে রক্ষা করবেন) তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রহরার চৌকি তুলে দিলেন।

তেবরানী হযরত আসমা এবনে মালেক হতমীর বর্ণনারও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ আমরা রাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পাহারা দিতাম। কিন্তু যখন এ আয়াত নাযিল হলো তখন তিনি প্রহরার ব্যবস্থা প্রত্যাহার করেন।

এবনে আবি হাতেম এবং এবনে মরদবিয়া হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বনী আনমারের যুদ্ধের সময় জাতুররেকা নামক স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। বনী নাজ্জারের এক ব্যক্তি বলল, আমি মোহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এখনই হত্যা করছি। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল তুমি কিভাবে তাঁকে হত্যা করবে? সে বলল, আমি তাঁর নিকট গিয়ে বলব, আপনার তরবারীটি একটু দেখতে দিন। যখন তরবারি হাতে পাব তখন তা দ্বারাই তাঁকে হত্যা করব। একটু পরেই লোকটি তাঁর দরবারে হাযির হয়ে বলল, আপনার তরবারীটি একটু দিন, আমি দেখব। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিনা দ্বিধায় তাকে তরবারীটি দিয়ে দিলেন। কিন্তু তার হাত কাঁপতে লাগল। তখন তিনি বললেন, তোমার উদ্দেশ্য বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) আরো একটি ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেফাজতের ব্যবস্থা করা হতো। প্রতিদিনই আবু তালেব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বনু হাশেম গোত্রের একজন লোক দিতেন, কিন্তু যখন এ আয়াত নাযিল হলো তখন

তিনি এরশাদ করলেনঃ চাচা, আল্লাহ্ পাক মানুষ এবং জ্বীন থেকে আমার হেফাজত করেছেন।[১]

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ

নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক কাফের সম্প্রদায়কে পথ দেখাবেন না, অর্থাৎ– আল্লাহ্ পাক কাফেরদের তাদের দূরভিসন্ধি কার্যকর করার শক্তি প্রদান করবেন না। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হত্যার অর্থ হলো দ্বীন ইসলামের মূলোৎপাটন, এর অনুমতি আল্লাহ্ পাক কোন অবস্থাতেই দেবেন না।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইহুদীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন তখন তারা উপহাস করে এবং বলে, আমরাতো আপনাদের পূর্বেই ইসলাম কবুল করেছি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের একথা শ্রবণ করে নীরব রইলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ

অর্থাৎ– হে আহলে কিতাব! তোমরা যে পর্যন্ত তৌরাত, ইঞ্জিল এবং তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে যা নাযিল হয়েছে (পবিত্র কোরআন) তার মর্মবাণী বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ না কর সে পর্যন্ত তোমরা যা কিছুই করনা কেন, তোমাদের ধর্ম আল্লাহ্ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না।

উল্লেখ্য, তৌরাত ইঞ্জিলের মর্ম বাস্তবায়নের অর্থ হলো তাতে শরীয়তের যে বিধান রয়েছে, তা মেনে চলা। আর তাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যে সুসংবাদ রয়েছে তা গ্রহণ করে তাঁর প্রতি এবং পবিত্র কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ

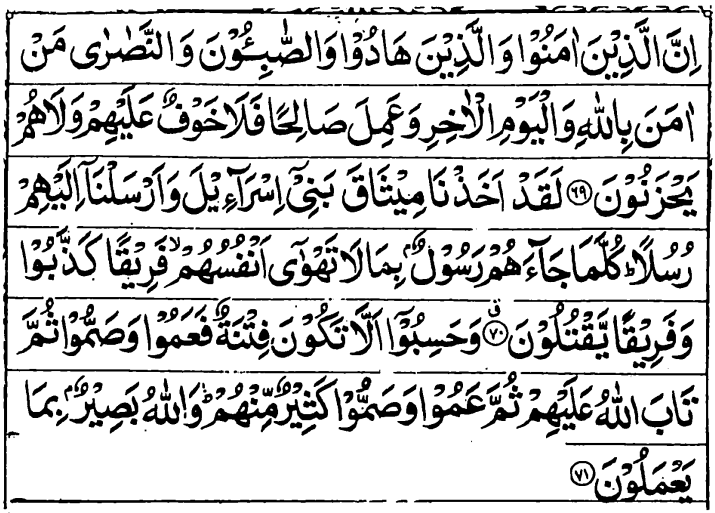
অদৃষ্টের লিখন কে করবে খন্ডন! ইহুদী ও খৃষ্টানরা তাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ হারাল, ইহকাল ও পরকালের চির শান্তি থেকে বঞ্চিত হলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতার কারণে তাদের নাফরমানী এবং পথভ্রষ্টতা আরো বেড়ে গেল। তাই–

فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

তাদের জন্যে কোন আক্ষেপ নেই। (হে রসূল!) আপনি তাদের জন্যে চিন্তিত হবেন না। তাদের জন্যে আক্ষেপও করবেন না, কেননা ঈমান এনে ভাগ্য সুপ্রসন্ন

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৪০
তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭৭-৭৮

করার সুযোগ তারা গ্রহণ করেনি; বরং পথভ্রষ্টতায় তারা সীমালঙ্ঘন করেছে। অতএব, তারা তাদের কুকর্মের শোচনীয় পরিণাম অবশ্যই ভোগ করবে, তাদের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটবে, আর এটিই স্বাভাবিক।


إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ
آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ
رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا
وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ
تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا
يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾

**তরফজমা**

(৬৯) নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইহুদী, সাবেঈন এবং খৃষ্টান (এদের মধ্যে) যে ব্যক্তিই বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ পাকের প্রতি ও শেষ বিচারের দিনের প্রতি এবং সৎ কাজ করে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

(৭০) আমি বনী ইসরাঈলদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছি এবং তাদের নিকট বহু রসূল প্রেরণ করেছি। যখন রসূল এমন কোন নির্দেশ তাদের নিকট নিয়ে এসেছেন যা তাদের মনপূতঃ নয় (তখনই) তারা এক দলকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং অন্য দলকে হত্যা করেছে।

(৭১) এবং আহলে কিতাবরা মনে করেছিল কোন আযাব আসবেনা (তারা এ ধারণায়) আরো অন্ধ এবং আরো বধির হলো। এরপর আল্লাহ পাক তাদের তওবা কবুল করলেন। পুনরায় তাদের অনেকে অন্ধ এবং বধির হলো। আল্লাহ পাক তাদের সমস্ত কার্যকলাপ লক্ষ্য করছেন।

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আহলে কিতাবরা সে পর্যন্ত প্রকৃত মোমেন হবে না যে পর্যন্ত তারা তৌরাত ইঞ্জিলের এবং পবিত্র কোরআনের শিক্ষাকে

সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আত্মনিয়োগ না করে। আর এ আয়াতে সমগ্র বিশ্ববাসীর নাজাতের দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

## সমগ্র বিশ্ববাসীর নাজাতের একমাত্র পথ

যেহেতু ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধারণা ছিল, তারা ব্যতীত কেউ নাজাত পাবেনা এজন্যে এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। সমগ্র বিশ্ববাসীর চির শান্তি, চির নাজাতের একটি মাত্র পথ রয়েছে তা হলো মহান স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতি এবং বিশেষতঃ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা এবং শেষ বিচারের দিন তথা কেয়ামতের দিনের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করা, আর সে বিশ্বাস মোতাবেক নেক কাজ করা।

এক কথায় আল্লাহ্ পাক, তাঁর আম্বিয়া ও রসূল এবং কেয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং সৎ কাজ সম্পাদনই হলো বিশ্ব মানবের নাজাতের একমাত্র পন্থা। যারা মুসলমান বলে দাবী করে অথবা যারা ইহুদী, খৃষ্টান বা সা'বী বলে দাবী করে, তাদের এ দাবী পরকালের নাজাত লাভের জন্যে যথেষ্ট নয়। নবীর বংশধর হওয়াও নাজাতের জন্যে যথেষ্ট নয়। নাজাত লাভ করতে হলে তথা চির শান্তি, চির মুক্তি লাভ করতে হলে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রকৃত ঈমান আনতে হবে এবং আখেরাতের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং সে বিশ্বাস মোতাবেক পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে নেক আমলের সম্বল সংগ্রহ করতে হবে। এতদ্ব্যতীত পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে নাজাতের বিকল্প কোন পথ নেই। অতএব, ঈমান ও নেক আমলের মানদন্ডে নিজেকে যাচাই করতে হবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং পুনরায় এরশাদ হয়েছে ঃ

مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

অর্থাৎ– যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে। দু'বার ঈমান আনার কথা কেন বলা হয়েছে? এর জবাব দিয়েছেন ঈমান রাজী (রঃ) তাঁর তফসীরে। তিনি বলেছেনঃ এর কারণ হলো এ মুনাফেকরাও মনে করতো তারা মোমেন, অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা আদৌ মোমেন নয়।[১] অতএব অর্থ হবে এই, যারা দাবী করে যে, তারা

১। তফসীরে কবীর খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৫৪

মোমেন বা ইহুদী, খৃষ্টান অথবা সা'বী যে কেউ হোক না কেন প্রত্যেকের নাজাতের পথ একটিই আর তা হলো আল্লাহ পাকের প্রতি প্রকৃত ঈমান। আখেরাতের প্রতি ঈমান এবং নেক আমল যাদের কাছে থাকবে তাদের জন্যেই এ আয়াতের শেষে সুসংবাদ রয়েছে যে, তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।

## সা'বীদের পরিচয়

সা'বী কারা?

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, সা'বী হলো খৃষ্টান এবং অগ্নিপূজকদের একটি দল।

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ তারা যবুর পাঠ করতো। কেবলা ছাড়া অন্য দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতো, ফেরেশতাদের পূজা করতো।

ওহাব (রঃ) বর্ণনা করেছেনঃ সা'বীরা আল্লাহকে চিনতো। নিজেদের শরীয়তের উপর আমল করতো, নবীগণকেও মানতো এবং বছরে ৩০দিন রোজা রাখতো এবং ইয়েমেনের দিকে ফিরে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতো। ইরাকের নিকটবর্তী এলাকায় বাস করতো।[১]

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, কোন মানুষ যে পর্যন্ত আল্লাহ পাকের একত্ববাদ বা তৌহিদে বিশ্বাস না করে, তাঁর যাবতীয় গুণাবলী, তাঁর অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের নিদর্শনাবলী, তাঁর সকল বিধি-নিষেধের প্রতি বিশ্বাসী না হয়, তাঁর আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতি তথা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন না করে, এমনিভাবে কেয়ামতের কঠিন দিনের প্রতি বিশ্বাস না করে এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিধান মোতাবেক নেক আমল না করে সে পর্যন্ত সে প্রকৃত মোমেন হবে না তথা চির নাজাত পাবেনা।

কেউ যদি দাবী করে যে, আমি সরকারকে মানি কিন্তু সরকারের দূতকে মানিনা, তাহলে সে সরকারকে মানে না একথা প্রমাণিত হয়। ঠিক এমনিভাবে যারা বলে যে, আমরা আল্লাহকে মানি কিন্তু আল্লাহর রসূলকে মানিনা তাদের এ দাবীও বাতিল প্রমাণিত হয়। যারা আল্লাহকে মানার দাবী করে অথচ আল্লাহর রসূলকে মানেনা তাদের এ দ্বিমুখী নীতি অচল, নির্বুদ্ধিতা এবং নির্লজ্জতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এমনিভাবে যারা একথা বলে যে, আমি সরকারের পূর্ববর্তী আইন সমূহ মানি, অতি সম্প্রতি যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তা মানি না। পৃথিবীর যে কোন বুদ্ধিমান

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৬ খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১১৩

ব্যক্তি তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলতে দ্বিধাবোধ করবেনা। ঠিক এমনিভাবে ইহুদীরা যখন বলে যে, আমরা মূসা (আঃ)-কে মানি, খৃষ্টানরা বলে আমরা ঈসা (আঃ)-কে মানি অথচ তারা আম্বিয়ায়ে কেরামের দলপতি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মানে না তখন মূলতঃ তারা কোন নবীকেই মানে না। এমনকি তারা আল্লাহকেও মানে না। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ

(সূরা আনআম, রুকু–৪)

অর্থাৎ– (হে রসূল!) তারা শুধু যে আপনাকে অস্বীকার করছে তাই নয়; বরং এ জালেমরা আল্লাহর আয়াত সমূহকেই অস্বীকার করছে। অতএব, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতকে অস্বীকার করাই হলো আল্লাহ পাককে অস্বীকার করা।

দ্বিতীয়ত, যারা এ দাবী করে যে, আমরা তৌরাত ইঞ্জিলের শিক্ষাকে কায়েম করেছি তারাও মিথ্যাবাদী। কেননা, তৌরাত ইঞ্জিলকে কায়েম করার তাৎপর্য হলো সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শকে মেনে চলা।

لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ

আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তোমরা তৌহিদের উপর বিশ্বাস রাখবে এবং সর্বশেষ নবীর যুগ পেলে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। তাদের নিকট অনেক আম্বিয়ায়ে কেরাম প্রেরিত হয়েছেন কিন্তু তাদের অবস্থা এই যে, নবীগণের যে কথা তাদের মনপূতঃ হয়েছে তা তারা মেনে নিয়েছে আর যা মনপূতঃ হয়নি তা প্রত্যাখান করেছে। মর্জি মোতাবেক হলে মানব আর মর্জি মোতাবেক না হলে মানব না–এর নাম আনুগত্য নয়। যারা আল্লাহর প্রকৃত গোলাম তাদের বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহর তরফ থেকে যে কোন হুকুম আসুক অকুণ্ঠ চিত্তে তারা তা মেনে নেয়। কিন্তু ইহুদী ও খৃষ্টানদের অবস্থা এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তাই আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে এরশাদ করেছেনঃ

كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُهُمْ

অর্থাৎ– যখনই কোন রসূল তাদের নিকট আগমন করেছেন, যদি তাঁরা এমন কথা বলেছেন যা তাদের মনপূতঃ নয় তবে রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলতে দ্বিধাবোধ

করেনি এমনকি, তাদেরকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয়নি আর আখেরাতের ব্যাপারে তারা কত উদাসীন ছিল তা বুঝতে হলে শুধু একটি কথাই যথেষ্ট যে, এ দূরাত্মা ইহুদীরা কোন নবীকে হত্যা করার মত মহা অপরাধ করেও তারা থাকত নিঃশঙ্ক, নিশ্চিত, কোন কিছুই যেন হয়নি। অবশেষে তাকে মৃত্যু বরণ করতে হবে না এবং তার কোন শাস্তিও হবেনা, এ ছিল তাদের আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপনের নমুনা।

তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ তারা হয়েছে অন্ধ, বধির। অন্ধ কিছু দেখেনা, বধির কিছু শোনেনা। অতএব, যাই কিছু হোক তার কিছু যায় আসেনা। এমনিভাবে দূরাত্মা ইহুদীরাও এভাবেই জীবন অতিবাহিত করেছে। তাদের অন্তর ছিল অত্যন্ত কঠিন। সর্বদা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করাই ছিল তাদের কাজ।

فَرِيْقًا كَذَّبُوْا

ইতিপূর্বে তারা আম্বিয়ায়ে কেরামকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে এবং কোন কোন নবীকে হত্যা করেছে।

وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ

এর অন্য একটি অর্থ হলো– তারা সর্বশেষ নবীর সঙ্গেও যুদ্ধ করে, তাঁর খাবারে বিষ মেশায়, তাঁর বিরুদ্ধে যাদু টোনা করে এভাবে তাঁকে হত্যা করার অপচেষ্টা করে। এরপরও তারা মনে করে যে,

وَحَسِبُوْٓا اَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ

তাদের উপর কোন বিপদ আসবে না, তারা তাদের কুকীর্তির শাস্তি ভোগ করবে না।

فَعَمُوْا وَصَمُّوْا

অর্থাৎ– মূসা (আঃ)-এর পর তারা অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। হক্ব বা সত্যকে তারা দেখতো না। হক্ব কথা শ্রবণও করত না।

## বনি ইসরাঈলের শাস্তি

তাদের এসব অন্যায়ের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ পাক নিষ্ঠুর জালেম রাজা বখ্ত নসরকে তাদের উপর বসিয়ে দেন। সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত বনী ইসলাঈলরা বখ্ত নসরের গোলামীর শাস্তি ভোগ করে। অত্যাচারিত–উৎপীড়িত অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করে।

ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

অতঃপর আল্লাহ পাক তাদের প্রতি দয়া করলেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি তারা ঈমান আনল। আল্লাহ পাক তাদের তওবা কবুল করলেন। কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন রইল না। তারা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই পুনরায় পৌঁছে গেল। পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا

অর্থাৎ ঈসা (আঃ)-এর পর তারা পুনরায় অন্ধ এবং বধির হলো। ইতিপূর্বে তারা হযরত জাকারিয়া (আঃ)-কে হত্যা করেছে। হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে। কিন্তু আল্লাহ পাক তাদের ষড়যন্ত্রকে বাতিল করে দিয়েছেন। আর এখন তারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে।[১] এমনকি আজকের দুনিয়ায়ও এ ইহুদীরাই সবচেয়ে বড় জালেম হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করেছে। ফিলিস্তিনীদের প্রতি তারা যে অন্যায় অত্যাচার করছে তার দৃষ্টান্ত জুলুমের ইতিহাসে খুঁজেও পাওয়া যাবে না। পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেন ঃ

وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ

অর্থাৎ– আল্লাহ পাক তাদের যাবতীয় কার্যকলাপ দেখছেন। অতএব, যথা সময়ে তাদের শাস্তি অবধারিত, আর সে শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠিন, কঠোর।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রঃ) লিখেছেনঃ মানুষ যখন পাপ কার্যে অভ্যস্ত হয়ে যায়, পাপ কার্য তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়ে যায় তখন সে সত্য গ্রহণ করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, সে যেন অন্ধ ও বধির হয়ে যায়।[২]

১। তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৮২
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৪৩
২। বয়ানুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৪৮

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ
وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ
مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَ
مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿۷۲﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ
ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ
لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۷۳﴾ اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى
اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۷۴﴾

## তরজমা

(৭২) নিশ্চয় তারা কাফের হয়ে গেছে যারা বলেছে যে, মসীহ এবনে মরয়মই আল্লাহ তায়ালা, অথচ মসীহ বলেছে যে হে বনী ইসরাঈল! তোমরা এক আল্লাহর বন্দেগী কর যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার স্থির করে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তার উপর বেহেশ্‌ত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা হবে দোযখে। আর এমন অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী হবে না।

(৭৩) নিশ্চয় তারা কাফের হয়েছে যারা বলেছে আল্লাহ তায়ালা তিনের মধ্যে অন্যতম, অথচ তিনি এক মা'বুদ, আল্লাহ পাক ভিন্ন আর কোন মা'বুদ নাই। এবং যদি এ কাফেররা তাদের এ সমস্ত ভুল কথাবার্তা পরিত্যাগ না করে তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরের ব্যাপারে অবিচল থাকবে তারা অত্যন্ত কষ্টদায়ক আযাব ভোগ করবে।

(৭৪) এরপরও তারা আল্লাহ তায়ালার দরবারে তওবা করবে না? এবং (গুনাহর জন্যে, ক্ষমা প্রার্থী হবে না? অথচ আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

## তফসীরুল কোরআন

### পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে ইহুদীদের দুষ্কৃতির বিবরণ ছিল, আর আলোচ্য আয়াতে খৃষ্টানদের বাতিল আকীদা এবং আল্লাহ পাকের শানে তাদের ভ্রান্ত ধারণার কথা

উল্লেখিত হয়েছে। পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার সময় বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট খৃষ্টানদের কয়েকটি ফেরকার অস্তিত্ব ছিল। একটি ফেরকার আকীদা ছিল মসীহ এবনে মরয়ম তথা হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ (নাঊজুবিল্লাহ)। কোন সুস্থ প্রকৃতির লোক, বিচার বিবেচনা সম্পন্ন মানুষ এমন অযৌক্তিক, অসুন্দর, অসত্য কথা বলতে পারেনা কিন্তু খৃষ্টানদের মালকানিয়া এবং ইয়াকুবিয়া কেরফা এ ভ্রান্ত মতই পোষণ করত।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় একথাটি ঘোষণা করেছেন এভাবে–

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ

অর্থাৎ নিশ্চয় তারা কাফের যারা বলেছে মসীহ এবনে মরয়ম আল্লাহ। অথচ মসীহ এবনে মরয়ম দ্বার্থহীন ভাষায় একথা অস্বীকার করেছেন এবং আল্লাহ পাকের একত্ববাদের কথা ঘোষণা করেছেন। তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ

আর মসীহ বলেছে, "হে বনী ইসরাঈল! তোমরা এক আল্লাহর বন্দেগী কর, যিনি আমার এবং তোমাদের সবার প্রতিপালক"।

اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ

যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে, আল্লাহ পাক তার প্রতি জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। জান্নাত নেককার এবং পরহেযগার লোকদের জন্যে তৈরী করা হয়েছে, যারা আল্লাহর সাথে শেরক করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করবেন না– একথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ

নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করাকে আল্লাহ পাক মাফ করবেন না। তাই তারা বেহেশতে প্রবেশাধিকার পাবেনা। অতএব, তাদের ঠিকানা হলো দোযখ, তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَاْوٰهُ النَّارُ

অর্থাৎ– আল্লাহর সাথে যারা শেরক করে, তাদের ঠিকানা হলো দোযখ, আর তা কাফেরদের জন্যেই তৈরী করা হয়েছে। অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

"আর যারা কাফের হবে এবং আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করবে, তারাই হবে দোযখবাসী। তারা দোযখে চিরদিন থাকবে"।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহর সাথে শেরক করাকে সবচেয়ে বড় জুলুম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

নিশ্চয় শেরক হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জুলুম তথা অত্যাচার, যে শেরক করে সে প্রকৃত অবস্থায় নিজের প্রতিই জুলুম করে, কেননা শেরকের শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ তাকে চিরকাল দোযখের শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর এ পরিণাম নিজের জন্যে সে নিজেই ডেকে এনেছে। তাকে তৌহিদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানানো হয়েছে।

কিন্তু এ আহ্বানে সে সাড়া দেয়নি। তাকে বিবেক-বিবেচনা দেয়া হয়েছে কিন্তু সে সত্য সন্ধানে স্বীয় বিবেক বুদ্ধি ব্যয় করেনি। তার নিজের অস্তিত্বের মধ্যে, দিন রাতের পরিবর্তনে, বিশাল বিস্তৃত আসমান জমীনের সৃজণে আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের এবং একত্ববাদের অনন্ত অসীম জীবন্ত নিদর্শন রয়েছে। সে ঐ নিদর্শন সমূহের প্রতি ক্ষণিকের তরেও দৃষ্টিপাত করেনি। কে তাকে তার অস্তিত্ব দান করেছেন? কে তাকে লালন-পালন করেছেন? কে তাকে দান করেছেন এ জীবন ও জীবনের যথাসর্বস্ব? কে তার শৈশবকে কৈশোরে, কৈশোরকে যৌবনে আর যৌবনকে বৃদ্ধাবস্থায় পরিবর্তন করেছেন?

এ পৃথিবীতে মানুষ আসে এবং কিছুদিন পর চলে যায়, কার আদেশে আসে? কার আদেশে যায়? কেন আসে? কেন যায়? আর কোথায় যায়? এসব বিষয়ে সে কোনদিন চিন্তা করেনি, তাই যখন কাল কেয়ামতের কঠিন দিনে তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে তখন কেউ তাকে সাহায্য করবেনা। তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ

আর জালেমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী থাকবেনা। কেননা, সে নিজেই নিজের প্রতি জুলুম করেছে।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا إِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ

নিশ্চয় তারা কাফের হয়েছে যারা ত্রিত্ববাদের কথা বলেছে, অর্থাৎ এ বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট লোকেরা বলেছে, এক তিন এবং এক। হযরত ঈসা (আঃ) রুহুল কুদ্দুস এবং আল্লাহ, অথবা ঈসা (আঃ) তাঁর মাতা মরয়ম এবং আল্লাহ। তাই তিনজনই আল্লাহ

ভিন্ন ভিন্ন ভাবেও আর একত্রিত হয়েও (নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক।) এ বাতিল আকীদা পোষণ করে খৃষ্টানদের মার্কুসিয়া এবং নাস্তুরীয়া ফেরকা। এরা সকলেই যে কাফের, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

ত্রিত্ববাদের এ ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায় পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন হযরত ঈসা (আঃ)-কে সম্বোধন করে বলবেন ঃ

ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

হে ঈসা এবনে মরয়ম! তুমি কি মানুষকে একথা বলেছিল, আল্লাহ পাক ব্যতীত আমাকে এবং আমার মাকে তোমরা উপাস্য হিসেবে গ্রহণ কর। হযরত ঈসা (আঃ) তার জবাবে আরজ করবেনঃ হে আল্লাহ! তুমি সবই জান, আমি যা কিছু বলেছি তথা আমি কোনদিনই এমন কথা বলিনি, এরপর আল্লাহ পাক তৌহিদ বা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের কথা ঘোষণা করেছেন।

وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

অথচ এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ বা উপাস্য নাই। তিনি এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নাই। তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিয্কদাতা, তিনিই সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান, তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতা সর্বক্ষেত্রে বিদ্যমান। তাঁর এক আদেশে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করেছে আর তাঁর আরেক আদেশে সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির লয় হবে। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের কোন লয় নাই, তাঁর কোন ক্ষয় নাই।

পরবর্তী বাক্যে বিভ্রান্ত খৃষ্টানদের ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছেঃ এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ

অর্থাৎ যদি তারা এ সমস্ত আপত্তিকর কথাবার্তা থেকে বিরত না হয়, তথা শেরক বা অংশীবাদ পরিত্যাগ করে সত্যিকার তৌহিদ বা একত্ববাদে বিশ্বাস না করে, তবে তাদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এ শাস্তি সাময়িক হবেনা; বরং চিরস্থায়ী হবে। আর তা হবে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। পবিত্র কোরআনে যখনই শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয় তখনই তার পাশাপাশি আল্লাহর রহমতের আশায় আশান্বিত করা হয়। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ– তারা কি শেরকের মত অন্যায় বর্জন করে আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করেনা? তাঁর হুজুরে ক্ষমাপ্রার্থী হয় না? যদি তারা আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা এস্তেগফার করত, তবে তাদের পূর্বকৃত অন্যায় আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করতেন, কেননা তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান। কি আশ্চর্য! আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করতে রাযী কিন্তু তবুও তারা ক্ষমাপ্রার্থী হয়না এবং শেরকের মত মন্দ, ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয় কাজ থেকে তারা তওবা করেনা।[১]

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا
رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۭ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ۭ كَانَا يَاْكُلٰنِ
الطَّعَامَ ۭ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝۷۵
قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا
نَفْعًا ۭ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝۷۶ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا
تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْٓا اَهْوَاۗءَ قَوْمٍ قَدْ
ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَاۗءِ السَّبِيْلِ ۝۷۷ ع ۱۰

## তরজমা

(৭৫) মসীহ এবনে মরয়ম তো শুধু একজন রসূলই ছিলেন, তাঁর পূর্বে বহু রসূল গত হয়েছেন, তাঁর মাতাও একজন সত্যবাদিনী নারী, তারা উভয়েই আহার করতেন, (হে রসূল!) আপনি দেখুন, আমি কিভাবে তাদের জন্যে নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করছি। আবার এ বিষয়েও লক্ষ্য করুন যে, কিভাবে তারা ফিরে যায়।

(৭৬) (হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন, তোমরা কি আল্লাহ্ পাক ব্যতীত এমন বস্তু সমূহের বন্দেগী কর যারা তোমাদের ক্ষতি বা উপকার কিছুই করতে পারেনা, আর আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

(৭৭) (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, হে আহলে কিতাব! তোমরা স্বীয় ধর্মে অন্যায়ভাবে সীমা লঙ্ঘন করোনা এবং সে সব সম্প্রদায়ের খামখেয়ালীর অনুসরণ করোনা যারা ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে তারা পথভ্রষ্ট করেছে এবং তারা সরল সঠিক পথ থেকে বহু দূরে সরে পড়েছিলে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৪৫-৪৬

## তফসীরুল কোরআন

মসীহ এবনে মরয়ম অন্য নবী রসূলগণের ন্যায় একজন রসূলই, আর মানুষের জন্যে রেসালত লাভের চেয়ে উচ্চতর কোন মর্যাদা নেই। তবে খৃষ্টানরা তাঁর সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ পাক তাঁকে পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করেছেন, এটি তাঁর বৈশিষ্ট্য এবং আল্লাহ পাকের কুদরতে কামেলার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যেমন হযরত আদম (আঃ)-কে আল্লাহ পাক পিতা-মাতা ব্যতীতই সৃষ্টি করেছেন। অতএব, পিতা ব্যতীত সৃষ্টি হওয়ার কারণে ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র বন্দা এবং রসূল ব্যতীত অন্য কোন বিশেষণে আখ্যায়িত করার কোন যুক্তি নেই।

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ الاية

ইতিপূর্বে বহু রসূল পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন, ঠিক সেভাবেই মসীহ এবনে মরয়মও বিদায় গ্রহণ করবেন, কেননা সৃষ্টি মাত্রেরই লয় হতে হবে। অতএব, যা ক্ষণস্থায়ী, যা লয় প্রাপ্ত হবে তাকে কোন অবস্থাতেই স্রষ্টার মর্যাদা দেয়া যাবেনা।

হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক কিছু বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন, যেমন কুষ্ঠ এবং শ্বেত রোগগ্রস্ত মানুষকে সুস্থ করা এমনকি, মৃত মানুষকে (আল্লাহর হুকুমে দাঁড়াও) বলে জীবিত করতে পারতেন। এমনি মোযেজা আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কেও দান করেছেন। মূসা (আঃ)-এর হাতের লাঠিটি জীবন্ত, চলন্ত অজগর সর্পে পরিণত হয়েছিলো। মৃত মানুষকে জীবন্ত করার চেয়ে একটি লাঠিকে জীবন্ত সর্পে পরিণত করা অধিকতর আশ্চর্যজনক, কেননা মৃত ব্যক্তি তো ইতোপূর্বে জীবিত ছিল, লাঠি তো কোন জীবন্ত বস্তুই ছিলনা। অতএব, মূসা (আঃ)-কে যে মোযেজা প্রদান করা হয়েছে তা অধিকতর বিস্ময়কর, আর ঈসা (আঃ)-এর পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। কিন্তু আদম (আঃ)-এর পিতা-মাতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ আরো বিস্ময়কর। অতএব, ঈসা (আঃ)-কে তাঁর মোজেযার কারণে আল্লাহর আসনে আসীন করার দাবী খৃষ্টানদের নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ

আর ঈসা (আঃ)-এর মাতা অন্য নারীদের ন্যায় একজন নারীই, তবে তাঁর সত্যবাদিতার কারণে অন্য নারীদের উপর তাঁর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, কেননা মরয়ম (আঃ) আল্লাহর বিধান সমূহকে মেনে চলতেন এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের সত্যতায় বিশ্বাসী ছিলেন।

এতদ্ব্যতীত, আরো একটি বিষয় এ পর্যায়ে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, মরয়ম তাঁর পুত্র ঈসা উভয়ে পানাহার করতেন। অন্য মানুষের মত তাঁদেরও অনেক প্রয়োজন ছিল যার আয়োজন করা হতো। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

كَانَا يَأْكُلٰنِ الطَّعَامَ

## তারা উভয়ে পানাহার করতো

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য, যারা পানাহারের মুখাপেক্ষী, আলো-বাতাস, আগুন-পানি, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, নক্ষত্রপুঞ্জ এক কথায় সব কিছুরই তারা মোহতাজ। শুধু ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটানোর প্রয়োজনে মানুষ পানাহার করে। এ পানাহার করার মধ্যেই তার প্রয়োজন শেষ হয়না; বরং এ পানাহার পরিপাক হওয়া এবং তার কিছু অংশ গোস্তে পরিণত হওয়া আর নিষ্প্রয়োজনীয় অংশ যথানিয়মে বের হওয়া– এ সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ায় মানুষ আষ্ঠে-পৃষ্ঠে বাঁধা রয়েছে। জীবনের সকল প্রয়োজনের আয়োজনে মানুষ মাত্রকে পরমুখাপেক্ষী হতে হয়।

হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁকে এবং তাঁর মাকে পৃথিবীর অনেক সৃষ্টির মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে এমন অবস্থায় ঈসা (আঃ) বা তাঁর মাতা কিভাবে উপাস্য বা মা'বুদ হতে পারেন? একথা যদি খৃষ্টান জগৎ ক্ষণিকের জন্যেও চিন্তা করত তবে এ বিভ্রান্ত জাতির সুপথ লাভের সম্ভাবনা দেখা দিত। আর তারা ঈসা এবনে মরয়মকে বা তাঁর মাতাকে অথবা জীব্রাঈলকে মা'বুদ বা উপাস্য বলার ধৃষ্টতা দেখাত না।

আলোচ্য আয়াতে ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মাতার মানবীয় দুর্বলতা সমূহ বর্ণনার মাধ্যমে একথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, তারাও অন্য মানুষের মত মানুষ, আল্লাহর বন্দা, তবে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী বন্দা। ঈসা (আঃ) আল্লাহর নবী ও রসূল, আর মরয়ম তাঁর মাতা।

اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ

(হে রসূল!) আপনি দেখুন, কিভাবে আমি তাদের জন্যে দলিল প্রমাণ বর্ণনা করছি, আরো লক্ষ্য করুন, কোথায় তারা ফিরে চলেছে অর্থাৎ সত্যকে শ্রবণ ও গ্রহণ থেকে তারা দূরে সরে যাচ্ছে। লক্ষ্যনীয়– আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক শব্দটি দু' বার ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ (হে রসূল!) দেখুন কত বিস্ময়করভাবে আল্লাহ পাক তাদেরকে সত্য গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছেন কিন্তু তার চেয়ে বেশী বিস্ময়কর হলো, তারা সত্য গ্রহণে বিমুখ হচ্ছে। অথচ তারা ভালভাবেই জানে যে, ঈসা এবনে মরয়ম মানবীয় দুর্বলতা থেকে, পরমুখাপেক্ষীতা থেকে পবিত্র ছিলেন না, নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করার শক্তিও তাঁর ছিলনা, এ বিভ্রান্ত খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ)-এর মধ্যে আল্লাহ

প্রদত্ত কিছু গুণাবলী দেখতে পেয়ে তাকে উপাস্য রূপে মেনে নিয়েছে। কিন্তু তারা সৃষ্টি এবং স্রষ্টার মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনি।

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

(হে রসূল!) আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর বন্দেগী করছো, যা তোমাদের কোন ক্ষতি বা উপকার কিছুই করতে সক্ষম নয়। অর্থাৎ তোমরা ঈসার উপাসনা কর এবং ঈসার সমস্ত কর্ম তৎপরতা অন্য মানুষের মত আল্লাহ পাকেরই সৃষ্টি, এতে তাঁর নিজস্ব কিছুই নেই, সবই আল্লাহর প্রদত্ত ছিল, যেভাবে পৃথিবীতে আল্লাহ পাক বালা-মুসিবতে পতিত করতে পারেন এবং আখেরাতে শাস্তি দিতে পারেন, এমনিভাবে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য দান করতে পারেন এবং আখেরাতে জান্নাত প্রদানের শক্তি রাখেন। ঈসা এবনে মরয়ম এর কোনটিই করতে পারেন না। অতএব, ঈসাকে আল্লাহ্‌র আসনে আসীন করার মত মূর্খতা আর কিছুই নেই।

وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

এবং আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত। তিনি মানুষের সমস্ত কথা এবং সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। প্রত্যেককে তার কথা ও কাজ অনুসারে পুরস্কার অথবা শাস্তি দেয়া হবে। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ পর্যায়ে লিখেছেন, কথাটির তাৎপর্য হলো ঈসা (আঃ)-এর শ্রবণ শক্তিও ছিল না, দর্শন শক্তিও ছিলনা। কোন কিছুর জ্ঞান অর্জনের শক্তিও ছিলনা, এ সমস্ত গুণাবলী আল্লাহ পাকই তাঁকে দান করেছেন। অতএব, তাকে উপাস্য বা মা'বুদ মনে করার কোন যুক্তি নেই।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ

## পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে খৃষ্টানদের ভ্রান্ত আকীদা ও বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে, আর এ আয়াতে আহলে কিতাবদের পথভ্রষ্টতা এবং ধ্বংসের কারণ বর্ণিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ হে আহলে কিতাব! তোমরা ধর্ম বিষয়ে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করোনা আর তাদের অনুসরণ করোনা যারা ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

আহলে কিতাবদের মধ্যে ইহুদীদের সীমা লঙ্ঘন হলো এভাবে যে, তারা ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়্যত ও রেসালতকে অস্বীকার করেছে, তাঁকে যাদুকর এবং মিথ্যাবাদী বলেছে এমনকি, এ দুরাত্মা জালেমরা তাঁর মাননীয়া মাতার প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ

দিয়েছে। এর চেয়ে বড় অন্যায় আর কি হতে পারে? আর খৃষ্টানদের পথভ্রষ্টতা হলো এই, তারা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ এবং আল্লাহর পুত্র বলে দাবী করেছে (নাঊজুবিল্লাহ)।

তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করোনা তথা সীমা লঙ্ঘন করোনা। ঈসা (আঃ) আল্লাহর নৈকট্য-ধন্য বন্দা এবং রসূল ছিলেন, তাঁকে আল্লাহ পাক "কুন" (হও) আদেশ দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তিনি খোদাও নন, খোদার পুত্রও নন যেমন খৃষ্টানরা মনে করে, আর তিনি মিথ্যাবাদী ও প্রতারকও নন, যেমন ইহুদীরা ধারণা করে।

وَلَا تَتَّبِعُوٓا أَهْوَآءَ قَوْمٍ

হে আহলে কিতাব! ইতিপূর্বে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তোমরা কোন অবস্থাতেই তাদের অনুসারী হয়োনা, কেননা তারা অন্যায়-অনাচার এবং পথভ্রষ্টতায় বহুদূর চলে গেছে। ইহুদীরা আল্লাহর নবীগণকে অপমান করেছে এমনকি তাদেরকে হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করেনি পক্ষান্তরে, খৃষ্টানরা পরয়গম্বর–ভক্তিতে এত চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আল্লাহর রসূলকে স্বয়ং আল্লাহর মর্যাদায় বরণ করে নিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হয়নি, এর চেয়ে বড় বাড়াবাড়ি বা সীমা লঙ্ঘন আর কি হতে পারে? বিবেক বর্জিত এমন অন্ধ ভক্তদের নাজাতের আদৌ কোন পথ নেই। কেননা, তারা সীমা লঙ্ঘনে, সরল সঠিক পথ বর্জনে অনেক দূরে সরে গেছে। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল নবীয়ে করীম হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর তার বিরোধিতা করার মাধ্যমেই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে প্রথম ضلالت শব্দটির ব্যাখ্যা হলো– তারা কাফের হয়েছে, আর দ্বিতীয়বার ব্যবহৃত ضلالت শব্দটির ব্যাখ্যা হলো তারা শরীয়তের পথ বর্জন করেছে।[১]

অর্থাৎ– পবিত্র কোরআন অবতরণে এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের মাধ্যমে বিশ্বমানবের জন্যে সরল সঠিক পথ প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টানরা শুধু যে সে পথ গ্রহণ করেনি তাই নয়; বরং তার বিরোধিতা করেছে। পবিত্র কোরআনের শিক্ষাকে উপহাস করেছে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে শত্রুতা করেছে। অথচ তৌরাত ও ইঞ্জিলে তাঁর গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে আর সে সম্পর্কে তারা অবগত ছিল, তাই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৪৭-৪৮
তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৯৩

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَ
عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿۷۸﴾
كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا
يَفْعَلُوْنَ ﴿۷۹﴾ تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ
مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ فِى
الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿۸۰﴾ وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ
وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا
مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۸۱﴾ لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ
اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً
لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّ
مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَ رُهْبَانًا وَّ اَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۸۲﴾

**তরজমা**

(৭৮) বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের তারা হযরত দাউদ (আঃ) হযরত ঈসা এবনে মরয়ম (আঃ) কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছে। এর একমাত্র কারণ এই যে, তারা নাফরমানী করেছিল এবং সীমা লঙ্ঘন করেছিল।

(৭৯) তারা যে মন্দ কাজ করত, সে বিষয়ে একে অন্যকে বারণ করত না, কত জঘন্য কাজই না তারা করত!

(৮০) (হে রসূল!) আপনি তাদের মধ্যে অনেককেই দেখবেন যে, তারা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করছে, তারা তাদের পরকালের জন্যে যা করে পাঠাচ্ছে তা অত্যন্ত মন্দ, কেননা আল্লাহ পাক তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা চিরদিন শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

(৮১) এবং যদি তারা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং নবীর প্রতি ঈমান আনত এবং যে কিতাব আমার নবীর নিকট নাযিল হয়েছে তার উপরও বিশ্বাস করত, তবে তারা কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করত না। এদের অনেকেই ফাসেক, ঈমানের সম্পদ থেকে বঞ্চিত।

(৮২) (হে রসূল!) আপনি ইহুদী ও মুশরেকদেরকে মুসলমানদের শত্রুতার ব্যাপারে সব মানুষের চেয়ে অধিক কঠিন পাবেন। আর যারা নিজেদেরকে নাসারা

বলে পরিচয় দেয়, তাদেরকে আপনি মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে অধিকতর নিকটে পাবেন। এর কারণ এই, এদের মধ্যে রয়েছে বিদ্যোৎশাহী লোক, সংসারত্যাগী লোক এবং এজন্যে যে তারা অহংকার করেনা।

## তফসীরুল কোরআন

বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের তাদের পাপাচার, দৌরাত্ম, সীমা লঙ্ঘন যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল, অন্যায় অনাচারের বন্যায় যখন সকলেই ভেসে গেল, কিছু লোক অন্যায় করলে অন্যরা এসে যে তোদেরকে বাধা দেবে, সমাজে এমন লোকেরও যখন অভাব হয়ে গেল তখন তাদের প্রতি আল্লাহর লা'নত পতিত হলো, তাদের নিকট প্রেরিত আম্বিয়ায়ে কেরাম তাদের পাপাচারে অতীষ্ঠ হয়ে তাদের প্রতি লা'নত দিলেন, আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের ব্যাপারে বদদোয়া করলেন। আলোচ্য আয়াতে এমন দু'জন নবীর উল্লেখ রয়েছে, তন্মধ্যে একজন হলেন হযরত দাউদ (আঃ) যিনি আইলা নামক স্থানের অধিবাসীদের জন্যে বদদোয়া করেছিলেন, আর হযরত ঈসা (আঃ) বদদোয়া করেছিলেন আসহাবে মায়েদার ব্যাপারে।

তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ আইলা নামক স্থানে বনী ইসরাঈলের একদল বাস করত। তাদেরকে শনিবারের সম্মান রক্ষার আদেশ দেয়া হয়েছিল, তথা ঐদিন মৎস্য শিকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা সে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেছে এজন্যে হযরত দাউদ (আঃ) তাদের ব্যাপারে বদদোয়া করেছিলেন। পরিণামে আইলাবাসীকে আল্লাহ পাক বানরে পরিণত করে দিয়েছিলেন।[১]

এমনিভাবে হযরত ঈসা (আঃ) আসহাবে মায়েদার জন্যে বদদোয়া করেছিলেন, পরিণামে তারা শুকরে পরিণত হয়েছিল, এভাবে নেমে এসেছিল তাদের উপর আল্লাহর গজব।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, তাদের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। তাদের এ শোচনীয় বিপর্যয়ের কারণ সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۞ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ

অর্থাৎ– তারা যেহেতু– (১) আল্লাহর বিধি-নিষেধ অমান্য করেছে (২) তারা সীমা লঙ্ঘন করেছে (৩) তারা মন্দ কাজ বারে বারে করত অথবা এ আয়াতের অর্থ হলো– কেউ যখন মন্দ কাজ করত তখন অন্যরা তাদেরকে বাধা দিতনা। পরিণামে সবাই শাস্তির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতো। হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে

১। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-(১), পৃষ্ঠা-৩৪১-৪২

বর্ণিত একখানি হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেনঃ আমি স্বয়ং শুনেছি, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছিলেনঃ মানুষ যখন কোন লোককে জুলুম করতে দেখে এবং তাকে বাঁধা না দেয়, তখন সকলের ওপর আযাব আসার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

আবু দাউদ শরীফে এই হাদীসখানি এভাবে রয়েছে, যাদের মাঝে গুনাহ করা হতো তারা গুনাহর কাজে বাঁধা দেয়ার শক্তি থাকা সত্ত্বেও বাঁধা দিতনা। তখন সকলের ওপর আযাব আসার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এ আয়াতের অন্য একটি অর্থ হলো তারা মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকত না; বরং মন্দ কাজে সর্বদা লিপ্ত থাকত।

لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ

কত মন্দ ছিল তাদের এ আচরণ, এ বাক্যটিতে একদিকে তাদের অন্যায় অনাচারের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে, অন্যদিকে তাদের অপকর্মের সমালোচনা করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের পূর্বে বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে কেউ যদি কোন পাপকার্যে লিপ্ত হতো তবে অন্য লোক তাকে বাধা দিত, কিন্তু পর দিন সকালে ঐ বাধাদানকারী ব্যক্তি পাপী লোকের সঙ্গে ওঠা-বসা করত, পানাহার করত, এভাবে যেন সে গতকাল তাকে পাপকার্যে লিপ্ত দেখেনি, যখন আল্লাহ পাক তাদের এ পাপকার্য প্রত্যক্ষ করলেন তখন তিনি সকলের মনকে এক প্রকার করে দিলেন, তাদের মধ্যে কাউকে বানর এবং কাউকে শুকরে পরিণত করলেন। আর দাউদ (আঃ) এবং ঈসা (আঃ)-এর দ্বারা তাদেরকে লা'নত দিলেন। তার কারণ ছিল তাদের নাফরমানী এবং সীমালঙ্ঘন। শপথ সেই পবিত্র সত্তার, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ। তোমরা অবশ্যই নেক কাজের হেদায়েত করবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। অন্যথায় তোমাদের অন্তর সমূহকে আল্লাহ পাক একই প্রকার করে দেবেন, অর্থাৎ সকলের অন্তরকে মোহরাঙ্কিত করে দেবেন, যেভাবে তাদের প্রতি লা'নত করেছেন, এভাবে তোমাদের প্রতিও লা'নত করবেন।[১] (তিরমিজী, আবু দাউদ)

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ

ইতিপূর্বে আলোচিত আয়াত সমূহে পূর্বকালের ইহুদীদের অবস্থার বিবরণ ছিল, আর এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা রয়েছে, তখন

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৪৮-৪৯
তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৯৩

আর তা এজন্যে যে তাদের মধ্যে কিছু বিদ্যোৎশাহী, ধর্মপ্রাণ লোক ছিল, যারা মুসলমানদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখতে প্রয়াসী ছিল, আর তারা অহংকারী ছিলনা। তাদেরকে যখন সত্যের দাওয়াত দেয়া হতো তখন তারা ইহুদীদের মত অহংকারী হয়ে প্রত্যাখ্যান করত না।

ইমাম কাতাদা (রঃ) লিখেছেনঃ খৃষ্টানদের কিছু লোক হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঠিক অনুসারী ছিল, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয় তখন তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে, আলোচ্য আয়াতে তাদেরই প্রশংসা করা হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তিন ব্যক্তি দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি সেই আহলে কিতাব, যে নিজের নবীর প্রতি ঈমান আনবে, পরে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতিও ঈমান আনে।

## আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে আরো কিছু কথা

তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ মক্কার কোরায়শরা পরস্পর পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত নেয় যে, মুসলমানদেরকে চরমভাবে কষ্ট দেবে, যাতে করে তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে যায়। এ কর্মসূচী অনুযায়ী মুসলমানদের উপর নির্যাতন-উৎপীড়ন শুরু করা হয়। যার তকদীরে নির্যাতন ছিল, তাকে নির্যাতীত হতে হয়, আর আল্লাহ পাক যাকে রক্ষা করেন, সে রক্ষা পায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক রক্ষা করেন, কিন্তু তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি এমন জুলুম অত্যাচার হয়, যা বর্ণনাতীত। তখন তিনি সাহাবাযে কেরামকে আবিসিনিয়ায় হিজরতের নির্দেশ দান করেন। কেননা, তখনও জেহাদের অনুমতি প্রদান করা হয়নি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আবিসিনিয়ার বাদশাহ অত্যন্ত ভাল লোক, সে নিজে জুলুম করেনা এবং কেউ তার নিকট পৌঁছলে তার প্রতিও জুলুম করতে দেয়না। এ আদেশ মোতাবেক সর্ব প্রথম মক্কা থেকে এগারজন পুরুষ, চারজন স্ত্রীলোক প্রিয় মাতৃ-ভূমি ছেড়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তাঁরা ছিলেনঃ

(১) হযরত ওসমান এবনে আফ্যান (রাঃ) (২) তাঁর স্ত্রী হযরত রোকাইয়া (রাঃ) (প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কন্যা) (৩) হযরত যোবায়ের এবনুল আওয়াম (৪) হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) (৫) হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ) (৬) হযরত আবু হোযায়ফা এবনে ওৎবা (রাঃ) (৭) হযরত আবু হোজায়ফা (রাঃ)-এর স্ত্রী হযরত সাহল বিনতে সোহায়েল (রাঃ) (৮) হযরত মাসআব এবনে উমায়ের (রাঃ) (৯) হযরত আবু সালমা এবনে আবদুল আসাদ এবং তাঁর স্ত্রী (১০) উম্মে সালমা (রাঃ) বিনতে উমাইয়া (১১) ওসমান এবনে মাজউন এবং (১২) হযরত আমের এবনে রবীয়া এবং (১৩) তাঁর স্ত্রী হযরত লায়লা বিনতে হাইসামা

(১৪) হযরত হাতেব এবনে আমর (১৫) হযরত সোহায়েল এবনে বায়জা (রাঃ)। নবুওয়্যতের পঞ্চম বছরের রজব মাসে তাঁরা মক্কা শরীফ থেকে রওয়ানা হন এবং অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে সমুদ্র পার হয়ে আবিসিনিয়া গমন করেন। এটিই ছিল ইসলামের ইতিহাসে প্রথম হিজরত।

কিছু দিন পর হযরত জাফর এবনে আবি তালেবও (রাঃ) গমন করেন। এভাবে একে একে নীরবে এবং গোপনে নির্যাতীত-উৎপীড়িত মুসলমানগণ জীবন বাজি রেখে হিজরত করতে থাকেন, স্ত্রীলোক এবং শিশুদের বাদ দিয়ে শুধু পুরুষদের সংখ্যা তখন ৮২-তে পৌঁছায়। মক্কার কাফেররা যখন জানতে পরে যে, মুসলমানগণ তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সমুদ্র পার হয়ে আবিসিনিয়ায় আশ্রয় নিয়েছেন তখন তারা শান্তিতে বসতে পারল না; বরং আমর এবনুল আসের নেতৃত্বে অনেক উপঢৌকনসহ আবিসিনিয়ার বাদশাহর নিকট এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করলো।

এ উদ্দেশ্যে যে, বাদশাহ নাজ্জাশী যেন মুসলমানদের আবিসিনিয়া থেকে বহিস্কার করে মক্কার কাফেরদের হাতে সোপর্দ করেন। কিন্তু কাফেরদের এ অপচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। নাজ্জাশী মুসলমানদের সাথে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা মোনাওয়্যারায় হিজরত করেন এবং ষষ্ঠ হিজরীতে হযরত আমর এবনে উমাইয়া জমরীর মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নাজ্জাশীর নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন, তাতে তিনি লিখেছিলেন, যদি উম্মে হাবীবা রাজী হন তবে আমার সঙ্গে তার বিবাহের ব্যবস্থা কর এবং সমস্ত মুসলমানকে আমার নিকট ফেরত পাঠাও (হযরত উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান তাঁর স্বামীসহ হিজরত করে আবিসিনিয়ায় গমন করেছিলেন। সেখানে তাঁর স্বামীর এন্তেকাল হয়, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নাজ্জাশীকে এ পত্র প্রেরণ করেন)।

নির্দেশ মোতাবেক নাজ্জাশী তাঁর বাঁদী আবরাহাকে চারশত দিনার সঙ্গে দিয়ে হযরত উম্মে হাবীবার নিকট প্রেরণ করেন। হযরত উম্মে হাবীবা এ পয়গাম শ্রবণ করে অত্যন্ত খুশী হন। এ খুশীতে তাঁর হাতের চুড়িগুলো তিনি আবরাহাকে দান করেন এবং খালেদ এবনে সায়েদ এবনুল আসকে বিবাহের উকিল মনোনীত করেন। তিনি চারশত স্বর্ণমুদ্রার মোহরানা ঠিক করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঁঙ্গে তার বিবাহের ব্যবস্থা করেন।

নাজ্জাশী মোহরানার টাকা হযরত উম্মে হাবীবার নিকট আবরাহার মাধ্যমে প্ররণ করেন। হযরত উম্মে হাবীবা তম্মধ্যে ৫০টি স্বর্ণ মুদ্রা আবরাহাকে দান করেন। তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেনঃ আমাকে বাদশাহ হাদীয়া গ্রহণ না করার আদেশ দিয়েছেন। আমি বাদশাহর ধন-সম্পদের হেফাজতের দায়িত্বে আছি। আমি হযরত মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সত্য নবী জানি, তাঁর প্রতি আমি ঈমান এনেছি। আপনি দয়া করে তাঁর নিকট আমার সালাম পৌঁছে

দেবেন। বাদশাহ স্ত্রীলোকদেরকে আদেশ দিলেন যেন হযরত উম্মে হাবীবার নিকট সুগন্ধি জিনিষপত্র পৌঁছে দেয়া হয়।

হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমরা যখন আবিসিনিয়া থেকে মদীনা শরীফ রওয়ানা হই তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খায়বরে ছিলেন। যারা তাঁর নিকট যেতে চাইল তারা চলে গেল, আমি মদীনা শরীফ রয়ে গেলাম, তিনি খায়বর থেকে যখন মদীনা শরীফ প্রত্যাবর্তন করলেন, আমি তখন তাঁর মহান দরবারে হাযির হলাম। তিনি আমার নিকট নাজ্জাশীর অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি তাঁর নিকট আবরাহার সালাম পৌঁছে দিলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জবাব দান করলেন। তখন পবিত্র কোরআনের এ আয়াত নাযিল হয়–

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً

(সূরা মুমতাহেনাহ)

অর্থাৎ (উম্মে হাবীবার সাথে বিবাহের কারণে) আশা করা যায় আল্লাহ পাক তোমাদের দুশমনদের দুশমনীকে বন্ধুত্বে পরিবর্তন করে দেবেন। অবশেষে বাস্তবেও তাই হয়েছিলো। আবু সুফিয়ান যখন জানতে পারল যে, তার কন্যা উম্মে হাবীবার সঙ্গে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, তখন সে বলেছিলোঃ মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) শরীফ, বীর, তাঁর মধ্যে কোন দোষ নেই।

বর্ণিত আছে যে, হযরত জাফর (রাঃ)-এর সঙ্গে নাজ্জাশী তাঁর পুত্র আরহাকে ৭০ জন লোকের একটি দল নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে একটি আরজীনামা সহ প্রেরণ করেন। এতে লিপিবদ্ধ ছিল– হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহ পাকের সত্য রসূল, পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে আপনার সত্যতার কথা ঘোষিত হয়েছে। আমি আপনার এবং আপনার পিতৃব্য-পুত্রের (হযরত জাফর (রাঃ) বয়আত করেছি। আমি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের অনুগত হয়েছি। আমি আপনার দরবরে আমার পুত্র আরহাকে প্রেরণ করছি। যদি আপনার হুকুম হয় তবে আমি নিজেও হাযির হব। ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি আমার সালাম।

এ কাফেলা হযরত জাফর (রাঃ) এবং তাঁর সাথীদের নিয়ে নৌকায় আরোহন করল। কিন্তু নৌকা যখন সমুদ্র মাঝে পৌঁছে, তখন আরহা নিমজ্জিত হয়। হযরত জাফর (রাঃ) এবং তাঁর ৭০ জন সাথী গরম পোষাক পরিধান করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলেন। তাঁদের মধ্যে ৬২ জন ছিলেন

আবিসিনিয়ার অধিবাসী, আটজন ছিলেন সিরিয়ার অধিবাসী। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের সূরা ইয়াছীন পাঠ করে শোনালেন। তাঁরা এ সূরা শ্রবণ করে ক্রন্দন করতে লাগলেন, সকলেই ঈমান আনলেন এবং আরজ করলেন, এ বাণী সেই বাণীরই ন্যায় যা হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً

আলোচ্য আয়াতে যে খৃষ্টানদের প্রশংসা করা হয়েছে তারা সে সব লোক যাদেরকে হযরত নাজ্জাশী হযরত জাফর (রাঃ)-এর সঙ্গে প্রেরণ করেছিলেন। তাদের সংখ্যা ছিল ৭০ জন, তারা ছিলেন জ্ঞানী গুণী ধর্মপ্রাণ।

মোকাতেল এবং কালবী (রঃ) বলেছেনঃ তাদের সংখ্যা ছিল ৪০ জন। ৩২ জন ছিলেন আবিসিনিয়ার আর আটজন ছিলেন সিরিয়ার।

আর আতা (রঃ) বলেছেনঃ তাদের সংখ্যা ছিল ৮০ জন, তন্মধ্যে ৪০ জন ছিলেন নাজরানী আর ৩২ জন আবিসিনিয়ার আর ৮ জন সিরিয়ার।

এবনে আবি শায়বা, এবনে আবি হাতেম এবং ওয়াহেদী হযরত ওরওয়া এবনে যোবায়েরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমর এবনে উমাইয়াকে একখানি পত্র দিয়ে নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করলেন, তিনি তা পৌঁছানোর পর নাজ্জাশী তার দেশের বিখ্যাত ওলামায়ে কেরামকে একত্রিত করেন। হযরত জাফর (রাঃ)-কেও ডাকেন। হযরত জাফর (রাঃ) ঐ মজলিসে পবিত্র কোরআনের সূরা মরয়ম পাঠ করেন। এ সূরা শ্রবণ করে সকলেই ঈমান আনে এবং প্রত্যেকের নয়ন যুগল অশ্রুসিক্ত হয়। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

এবনে জরীর এবং এবনে আবি হাতেম সাঈদ এবনে যোবায়েরের (রাঃ) সূত্রে লিখেছেনঃ আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী তাঁর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে প্রেরণ করেন। তার নাম ছিল ফলাছ। তাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরা ইয়াছীন পাঠ করে শোনান। তখন সে এবং তার সাথীগণ ক্রন্দন করতে থাকে। এ সময় আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

ইমাম নেসায়ী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে যোবাযের (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে নাজ্জাশী এবং তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে।[১]

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ৮-৮-৮৯ইং তারিখে তফসীরে নূরুল কোরআনের ৬ষ্ঠ খন্ডের রচনা সমাপ্ত হলো।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫২-৫৫

# প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রঃ)-এর

## অন্যান্য বই

১। পবিত্র কোরআনের মর্মকথা
২। বিশ্ব-সভ্যতায় পবিত্র কোরআনের অবদান
৩। পবিত্র কোরআনের দর্পণে মানব-জীবন
৪। হযরত গওসুল আযমের (রঃ) অমরবাণী
৫। ইসলামী আদর্শ ও বাস্তবায়ন
৬। দালায়েলুল খায়রাত (বাংলা)
৭। দরূদ শরীফের ফজিলত ও মাহাত্ম
৮। সাহাবা-চরিত
৯। হাজীদের সাথী
১০। বিশ্ব-সভ্যতায় মহানবীর (সঃ) অবদান
১১। এনায়েতুল কোরআন
১২। যুগ-সমস্যার সমাধানে পবিত্র কোরআন
১৩। মানব-মর্যাদায় মহানবী (সঃ)
১৪। ইসলামী মাহ্ফিলের তাৎপর্য
১৫। তারীখে ইসলাম (উর্দু)
১৬। শরহে বয়যাবী
১৭। ইসলামী অর্থনীতির রূপ-রেখা
১৮। মুসলমানের কর্তব্য
১৯। দুই ঈদ
২০। পবিত্র কোরআনের অনুবাদ (প্রথম খণ্ড)
২১। ইমাম মাহদীর (আঃ) আগমনের পূর্বে ও পরে
২২। তফসীরে নূরুল কোরআন (৩০ খণ্ডে সমাপ্ত)
২৩। নূরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম

## প্রাপ্তিস্থান ঃ

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

